সৌরভ

সচিত্র মাসিক পত্র ও সমালোচন।

—সম্পাদক—

শ্রীকেদারনাথ মজুমদার।

রবীন্দ্র-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

—একাদশ বর্ষ—

মাঘ ১৩২৯ হইতে পৌষ ১৩৩০

ময়মনসিংহ।

বার্ষিক মূল্য—দুই টাকা।

PUBLISHED FROM
RESEARCH HOUSE—MYMENSINGH.

বিষয় সূচী।

অদৃষ্ট (কবিতা)	শ্রীযুক্ত হরিপ্রসন্ন দাস গুপ্ত	১১৮
অপরাধীর দায়িত্ব	শ্রীযুক্ত গৌরচন্দ্র নাথ বি, এ, বি, টি,	৯৩
অপূর্ব্ব গণিতজ্ঞ	শ্রীযুক্ত শিশির কুমার সোম	২৩০
অভিমান (কবিতা)	শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র কবিভূষণ	১৫১
আমাদের বর্ণ মালার সংস্কার চেষ্টা	... ...	৫৫
আর এক দিনের কথা (গল্প)	শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মজুমদার	২৮৬
আত্মহত্যা	শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র কাব্যতীর্থ জ্যোতিঃসিদ্ধান্ত	১৩৯
আরতি (কবিতা)	শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র রায়	২২৫
উপন্যাস ও আর্ট	শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মজুমদার বি, এল,	২৩১
উপন্যাস ও লোক শিক্ষা	ঐ	২৫৫
একটী আত্ম প্রচেষ্ট জাতির কথা (সচিত্র)	শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দত্ত	১১৯
একটী আত্ম প্রতিষ্ঠ জাতির কথা (সচিত্র)	ঐ	১৪৩
একটী ধ্বংসোন্মুখ জাতির কথা (সচিত্র)	ঐ	৩৯
এডিসনের সাক্ষ্য	শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার সোম	২৩৭
কবি কালিদাস	শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত	৫০
কবির লড়াই	শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র কবিভূষণ	৬৮
কর্ম্মফল (কবিতা)	শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য	৮০
কালির আঁচর (কবিতা)	ঐ	৮
কালের ভেরী (কবিতা)	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন কাব্যতীর্থ	১৯৯
কে (কবিতা)	শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র রায়গুপ্ত	১১৪
কেন এ বিদায় গান ? (কবিতা)	স্বর্গীয় মনোমোহন সেন	২৫৬
কেরাণী ও মদ্যাধার (কবিতা)	শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য	৮৪
গবর্ণমেণ্টের ঋণ ও ভারতের অর্থ নৈতিক সমস্যা	শ্রীযুক্ত কুমুদচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম, এ ; বি, এল	১১১
গ্রহে প্রাণীর অস্তিত্ব	শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র নাগ বি, এ	৯৩
গ্রন্থ সমালোচনা	৭৭, ১২৬, ১৭০, ২৩০	
ঘোড়া রোগ (গল্প)	সম্পাদক	৯৫
চণ্ডীর দেবতা	শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ মজুমদার	১৭৫
চাষা (কবিতা)	শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র কবিভূষণ	১৯০
চিত্রপরিচয়	... .	১৬
চন্দ্রোদয়ে সিন্ধুবারি (কবিতা)	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন কাব্যতীর্থ	৫৭
জাপানী শিক্ষা	শ্রীযুক্ত গৌরচন্দ্র নাথ বি, এ, বি, টি	১২৫
জীবন ও বিবর্ত্তন বাদ	শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ দাসগুপ্ত বি, এ, বি, টি,	২১৯
জোনাকী (কবিতা)	শ্রীযুক্ত হরিপ্রসন্ন দাশগুপ্ত	৫৯
জ্যোতিষে অয়ণ সিদ্ধান্ত	শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এসসি ; বি, টি	১১৯
ঐ প্রতিবাদ	শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র কাব্যতীর্থ জ্যোতিঃসিদ্ধান্ত	২২২
ডেলটা শিক্ষা প্রণালী	শ্রীযুক্ত গৌরচন্দ্র নাথ বি, এ, বি টি	১৯২
তোমারি (কবিতা)	শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র রায়গুপ্ত	৩৯

২৮৩

ময়মনসিংহের মেয়েলী সঙ্গীত	শ্রীযুক্ত বিজয়নারায়ণ আচার্য্য	২
যবদ্বীপের মহাভারতীয়-কথা।	শ্রীযুক্ত গৌরচন্দ্র নাথ বি, এ, বি, টি	২
যোগীজাতি	শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ মজুমদার	১
রথ যাত্রা (কবিতা)	শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র নিয়োগী	২
রণছোড়জী দর্শনে (সচিত্র)	শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী বিদ্যাভূষণ	
রমণী (কবিতা)	শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ	২
রবীন্দ্রনাথের কবি জীবনের অভিব্যক্তি	শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার ভাদুড়ী এম, এ,	১৩৫, ১৫৯, ১
রামগতির টপ্পা	শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র কবিভূষণ	১
রামায়ণী যুগের কৃষি সম্পদ	সম্পাদক	১
" " চিত্র শিল্প	"	১৭
" " তক্ষণ শিল্প	"	১২
" " ধাতু ও ধাতব শিল্প	"	২২
" " বয়ন শিল্প	"	১৩
" " বাণিজ্য ব্যবসায়	"	৪
" " ভাস্কর শিল্প	"	৫
" " যন্ত্র-বিজ্ঞান	"	২৩
রামায়ণে রত্নের ব্যবহার	"	২৭
রামায়ণে চিকিৎসা সম্বন্ধীয় জ্ঞান	"	২৯
লোকমত	মহারাজা শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ বি, এ,	৭
শাসন নীতির মূল ভিত্তি	শ্রীযুক্ত কুমুদচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম, এ, বি, এল,	৫
শাসনের পুরস্কার (গল্প)	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য	৭
শিব তাণ্ডব (কবিতা)	শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য	২১
শিক্ষা	রাজা শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র সিংহ বি, এ	
শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রেমধর্ম্ম ও তাহার অভিব্যক্তি	শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র কাব্যতীর্থ	
শুভদৃষ্টি (চিত্র)	শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	২৭
সাগর তরঙ্গ	শ্রীহরিচরণ গুপ্ত	২৫১
সাহিত্যে স্বাধীনতা বা উচ্ছৃঙ্খলতা	শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র কাব্যতীর্থ	২
সাহিত্য সংবাদ		৩০, ৪৫, ৭৮, ১১০, ১৩৪, ১৮২, ২০৬, ২৯
সুরসন্ধান (কবিতা)	শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য	
সুসং পাহাড় (কবিতা)	ঐ	২৯৫
স্বপন লোকে (কবিতা)	শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ	৩
স্নেহের দান (উপন্যাস)	সম্পাদক	৪, ৩৫, ৭০, ৮৬, ১২৭, ১৫১, ১৭২, ১৮৭, ২১১, ২৪৩, ২৬৮, ২৮২
স্মৃতির আবৃত্তি	শ্রী—	১১৪, ১৬৭, ২৩০, ২৫৩
স্মৃতিশক্তি	শ্রীযুক্ত হরিচরণ গুপ্ত	২৭
স্বর্গীয় সুকুমার রায় চৌধুরী (সচিত্র)		২২৯

রঙ্গিন চিত্র।

মানস-কমল (ত্রিবর্ণ)	শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার অঙ্কিত	মাঘ
আশা-পথে (ত্রিবর্ণ চিত্র)	ঐ	বৈশাখ
আনন্দ (দ্বিবর্ণ চিত্র)	বিলাতি চিত্র।	জ্যৈষ্ঠ
অহল্যা উদ্ধার (ত্রিবর্ণ চিত্র)	আশুতোষ লাইব্রেরী।	কার্ত্তিক

দর্পচূর্ণ (গল্প)	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য	১২৮
দিবা ও রজনী (কবিতা)	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য	১৬৪
দূরে (কবিতা)	শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র রায়গুপ্ত	১০৭
ধর্ম্ম মহারাজা	শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র চন্দ্র সিংহ বি, এ,	১
নববর্ষ সংবাদ – বৈকুণ্ঠের বেতার-বার্ত্তা (সচিত্র)	.. ..	৮৪
নাগা রাজ্যে কয়েক বৎসর (সচিত্র)	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার এল, এম, এস,	১২
নারীর অধিকার	শ্রীযুক্ত গৌরচন্দ্র নাথ বি, এ, বি, টি	২২৬
নানা মুনির নানা মত (কবিতা)	শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	১২৮
নূতন অর্ঘ্য (কবিতা)	শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কবিভূষণ	১৮
নিউ গিনির কথা (সচিত্র)	শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মজুমদার	২২৪
পতঙ্গ ও মশক (কবিতা)	শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য	১৬৬
পরিণাম (গল্প)	সম্পাদক	২০২
পল্লিচিত্র (গল্প)	শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	২১৮
পানের গান্ (কবিতা)	শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য	৬৩
পাষাণ দেবতা (কবিতা)	শ্রীযুক্ত অক্রূরচন্দ্র ধর	১৫৩
প্রতিবাদের প্রতিবাদ	শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এসসি, বি, টি	২০২
প্রতিবাদের প্রতিবাদের উত্তর	শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র কাব্যতীর্থ জ্যোতিঃসিদ্ধান্ত	২০৪
ফিজির আদিম অধিবাসী (সচিত্র)	শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মজুমদার	১৯৯
বউ কথা কও (কবিতা)	শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য	১৮৬
বঙ্গবাণী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন	ভাগবতশাস্ত্রী কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণ-সাঙ্খ্যতীর্থ	২৫৯
বধূ (কবিতা)	শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র রায়গুপ্ত	২৫৯
বান্ধব (সচিত্র)	শ্রীযুক্ত গৌরচন্দ্র নাথ বি, এ, বি, টি	১৪৬
বালিদ্বীপে হিন্দু উপনিবেশ (সচিত্র)	শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দত্ত	৮১
বিবাহ	শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র কবিভূষণ	১৬৫
বিনময় প্রথা ও জার্ম্মেণীর অর্থ সঙ্কট	শ্রীযুক্ত কুমুদচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম, এ, বি, এল,	২৮
বিধির বিধান (গল্প)	সম্পাদক	১৫৫
বীজ ও তরু (কবিতা)	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য	১৪২
বেগুার দান (গল্প) কুমার	শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সিংহ বি, এ, (রায় বাহাদুর)	১৯, ৪৮
বৃন্দাবনের কথা (সচিত্র)	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন কাব্যতীর্থ	৯
ভাই ভাই (গল্প)	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন কাব্যতীর্থ	১৭৬
ভাওয়ালের সন্ন্যাসী কুমার (সচিত্র)	শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকুমার মজুমদার শাস্ত্রী-বিদ্যাভূষণ	১৫৫
ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যের অবস্থা	শ্রীযুক্ত কুমুদচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম, এ, বি, এল	২০৭
মৎস্য হইতে কৃত্রিম মুক্তা প্রস্তুত	শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষ	২৩৩
মনুসিংহের প্রাচীন কাহিনী	শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র কবিরত্ন	১০২

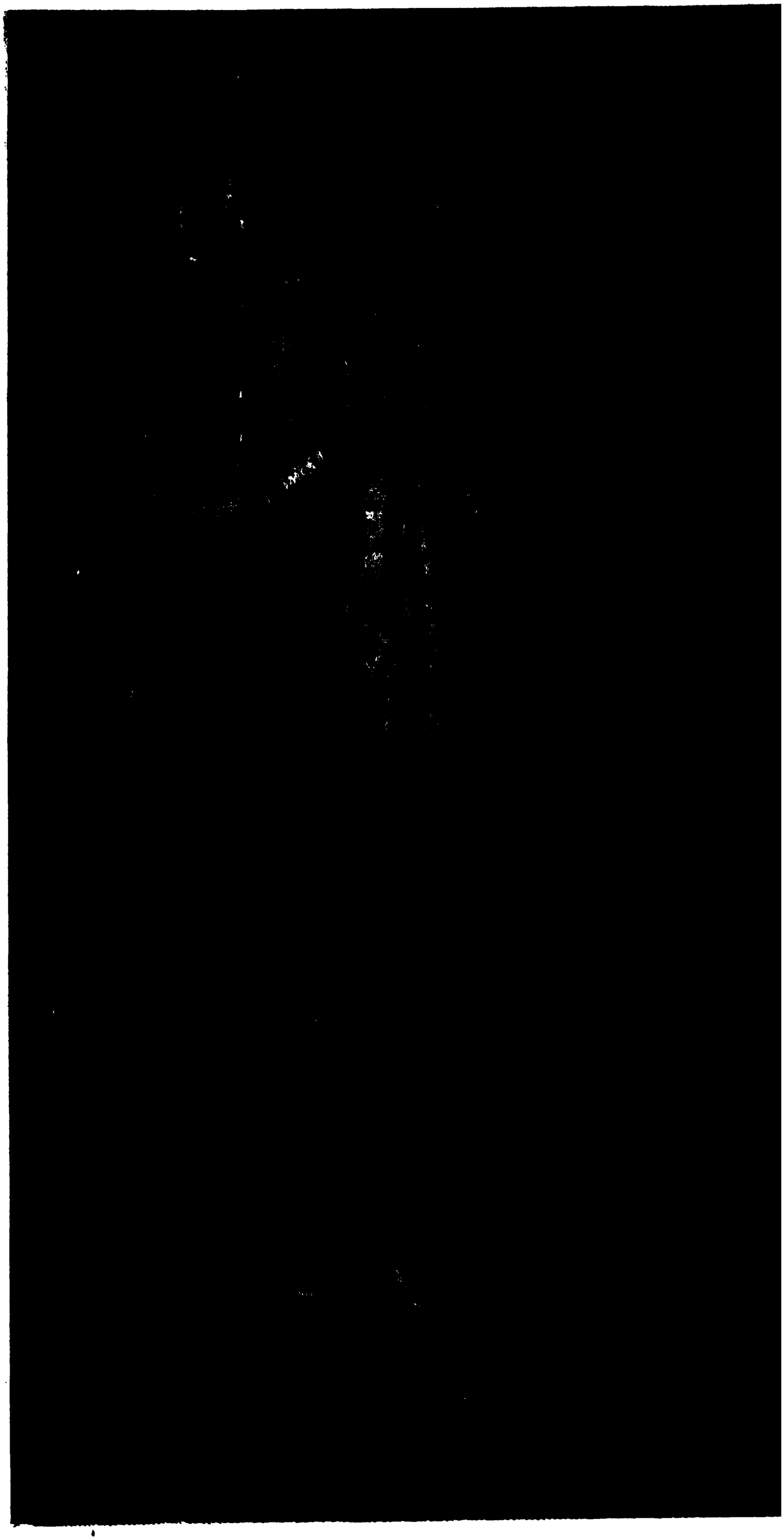

মানস-কমল

চিত্রশিল্পী
শ্রীমান হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার

চিত্র-স্বত্বাধিকারী
শ্রীযুক্ত কুমারেশ সিকদারের সৌজন্যে

যখন হিন্দু সমাজে এইরূপ অন্যায় সঙ্কীর্ণতা আসিয়া প্রবেশ করিয়াছিল তখনই বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিকাশের সুযোগ হইয়াছিল। আবার বৌদ্ধ ধর্ম্মের পতনের কারণও এই। পুনরপি হিন্দু ধর্ম্ম যখন গণ্ডিটাকে ভয়ানক বড় করিয়া সঙ্কীর্ণতাকে বিসর্জ্জন দিয়াছিল তখন চৈতন্যদেবের আবির্ভাব এবং হৃদয় গ্রাহী বৈষ্ণব ধর্ম্মের বহুল প্রচার। রামকৃষ্ণ প্রভৃতি মহাপুরুষগণের আবির্ভাবও এইরূপ একটা বিশেষ সময়ে হইয়াছে যখন ধর্ম্মের নামে মনুষ্যের সত্য ধর্ম্মটার ব্যভিচার হইতেছিল অর্থাৎ স্রষ্টার অভিপ্রায়ই বিনষ্ট হইতেছিল।

যেখানেই মানুষ দেবতার আহ্বানের আভাষ পাইয়াছে, সেইখানেই অন্যায় বন্ধনের শৃঙ্খল সজোরে উপেক্ষা করিয়া মানুষ সেই করুণাময় ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহারই অনুসরণ করিয়াছে। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এই দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। নতুবা যীশুখৃষ্টের করুণ আহ্বানে এত লোক অনুপ্রাণিত হইত না।

অনেক সময় আবার মানুষ পাপের পতাকা উড্ডীন করিয়া পৈশাচিক নৃত্য করিতে করিতেও বলিতে থাকে, আমি ধর্ম্মের কার্য্যই করিতেছি। কিন্তু, ধর্ম্মের মূর্ত্তি এমন তাণ্ডব হইলে সে ধর্ম্ম যেন মানুষের না হয়, সে ধর্ম্মের প্রভাব পৃথিবীর উপর যেন কখনও না আইসে।

মানুষ, যখন ধর্ম্ম লইয়া যুদ্ধবিগ্রহ করিতে থাকে, তখন সে ধর্ম্মের অর্থই ভুলিয়া গিয়া ধর্ম্মের প্রাণহীন দেহটাকে লইয়া ভৌতিক নৃত্য করিতে থাকে। তাই মনে হয়, যত কলহ বিবাদ সমস্তের মূল কারণই ধর্ম্মের প্রকৃত অর্থ ভুলিয়া যাওয়া।

ধর্ম্মের অর্থ উপলব্ধি করার পূর্ব্বে ধর্ম্মের উদ্দেশ্য কি? ইহা জানা প্রয়োজন। মানব হৃদয়ে ভাব জগতে কতকগুলি বিরাট অনুভূতি আছে, যাহার পূর্ণ বিকাশ হইলে সমস্ত বিশ্বই মানবের পরিচিত এবং প্রিয় হইয়া উঠে; তখন বিচ্ছেদ ভুলিতে হয়, বিরোধ থাকে না—ক্ষুদ্রতা দূরে যায়। ধর্ম্মের কার্য্যই এই প্রশারতাকে জাগাইয়া তোলা—সমস্ত ক্ষুদ্রতাকে, সঙ্কোচকে দূর করা। এই প্রসারণ ক্রিয়াটা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য এবং অনেক সময়ই অসাধ্য প্রায়; কতকগুলি চিত্তশোধক ক্রিয়ার মধ্যে দিয়া না গেলে কখনও চত্তের এতাদৃশ সম্প্রসারণ হইতে পারে না সত্য, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে চিত্তশোধনের ক্রিয়াগুলির মর্ম্ম উপলব্ধি না করিয়া কার্য্য করার ফলে এই ক্রিয়া গুলিই ভগবানের সমুদয় অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ ফল প্রসূ হইয়া উঠে। যাহাতে এরূপ না হয়, তৎপ্রতি মানব হিতৈষী ব্যক্তি মাত্রেরই চেষ্টা থাকা প্রয়োজন।

নিরর্থক অনুষ্ঠানগুলি, অনুষ্ঠানের অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর। স্পর্শদোষের বায়ুটা এ ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবেই উল্লেখ যোগ্য। হয় ত কোনও সাধনার সোপান হিসাবে কোনও লোককে বিশেষ ভাবে শুদ্ধাচারী হইয়া থাকা প্রয়োজন; সেই ক্ষেত্রে স্পর্শদোষ বিচার অত্যাবশ্যক হইয়া দাঁড়াইতে পারে, কিন্তু যখন বাহ্য আড়ম্বর সম্বল ব্যক্তি নিসিদ্ধ, হেয় এবং জঘন্য কার্য্য করিয়াও—নিকৃষ্ট জাতিয় ব্যক্তি ঘরের চালে উঠিলেই ধর্ম্ম যায়—ভাবিয়া শুচিতার ভান করেন এবং গৃহমধ্যস্থ আহার্য্য ও পানিয় দ্রব্য ফেলাইয়া দেন, তখন এ কপটাচারের প্রশ্রয় দেওয়া সমাজের পক্ষে উচিত কিনা তাহা ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য। প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের সমাজ এখন এইরূপ কপটাচারের প্রশ্রয় দিয়া ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচারী হইয়া ঘোরতর অন্যায় এবং অধর্ম্মাচরণ করিতেছে। সুতরাং জগৎহিতৈষী ব্যক্তি মাত্রেরই এই অনুষ্ঠানগুলি যাহাতে সার্থক হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান হওয়া প্রয়োজন; কারণ ইহাতে পৃথিবীর মঙ্গল নির্ভর করিতেছে। আমাদের শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট অনুষ্ঠানগুলি এক দিকে যেমন হৃদয়গ্রাহী, অন্যদিকে তেমনি চিত্তশোধক এবং চিত্তের বিকার দূরকারক - ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। সঙ্কীর্ণতা ধর্ম্মভাবের সম্পূর্ণ বিরোধী। ধর্ম্মের ন্যায় উদার জ্ঞাপক জিনিসকে ভাতের হাঁড়ির ভিতর পুরিয়া যে কেবল অন্যায় কার্য্য করা হইতেছে তাহা নহে, পক্ষান্তরে ইহা দ্বারা একটা গুরুতর অধর্ম্মাচরণেরও সমর্থন করা হইতেছে। স্বামী বিবাকানন্দের এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে! ফলতঃ যেখানে সঙ্কীর্ণতা প্রবেশ লাভ করিয়াছে, সেখানে ধর্ম্ম নাই।

সময়ে সময়ে অশিক্ষিত, অর্দ্ধ শিক্ষিত এবং অসভ্য জাতির কোনও কোনও লোককে দেবদুর্লভ চরিত্রের অধিকারী হইতে দেখিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। তখন সত্যই মনে হয়, ধর্ম্মলাভের জন্য প্রণালীর মধ্য দিয়া যাওয়ার কোনই আবশ্যকতা নাই। সভ্যতা ও শিক্ষাভিমানী

একদিন অপরাহ্নে ভ্রমণের ছলে সে সন্ন্যাসী দর্শন উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িল

বৃদ্ধ নরহরি মুনিব জমিদারকে নিজ গৃহে দেখিয়া সন্ন্যাসী দর্শন অপেক্ষা অধিক বিস্মিত হইয়া গেল। এবং ভয়, বিস্ময় ও কৃতজ্ঞতায় সে মণিমোহনের পদে লুটাইয়া পড়িল। সন্ন্যাসী মণিমোহনের পরিচয় পাইয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন।

নরহরি তাড়াতাড়ি তাহার গৃহকোণে রক্ষিত একখানা জীর্ণ পুরাতন বেতের আসন আনিয়া তাহা সযত্নে নিজ পরিধান বস্ত্রদ্বারা ঝাঁটিয়া-মুছিয়া তাহার উপর নিজ উত্তরিয় খানা বিছাইয়া মণিমোহনকে বসিতে অনুরোধ করিয়া কৃতাঞ্জলা পুটে দাঁড়াইয়া রহিল।

মণিমোহন, নত মস্তকে সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকটে গিয়া মৃত্তিকায় উপবেশন করিল; সন্ন্যাসীর সম্মুখে অপেক্ষাকৃত উচ্চাসন গ্রহণ করিল না।

সেদিন সন্ন্যাসীর আচরণে ও তাঁহার কথাবার্ত্তায় মণিমোহন মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। সন্ন্যাসীর উপদেশগুলি সারা রাত তাহার মস্তিষ্কে কার্য্য করিয়াছিল।

পরদিন হইতে জমিদার বাড়ীর ঘুড়িগাড়ী মণিমোহনকে লইয়া দিনে দুইবার করিয়া সাধুর আশ্রমে যাতায়াত করিতে লাগিল।

মণি প্রাতে সাধুর নিকট যাইত, দ্বিপ্রহরে আসিত; আবার দুটায় যাইত, সন্ধ্যার পর ফিরিয়া আসিত।

সারাদিন আশ্রমে নামগান হইত। সে কীর্ত্তন এমনি প্রাণোন্মাদক ছিল যে দেখিতে দেখিতে সে অঞ্চলে সাধুর শিষ্যের সংখ্যা অগণিত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল

ক্রমে এ কথা মণির পিতার কর্ণে পঁহুছিল। পিতা পুত্রকে ডাকাইয়া আনিয়া ভর্ৎসনা করিলেন। প্রজার গৃহে জমিদারের পদার্পনে যে সম্মানের হানি হয়—তাহা বুঝাইলেন; তারপর নরহরির স্পর্দ্ধার কথা, বেয়াদপির কথা বুঝাইয়া মণিকে তথায় যাইতে নিষেধ করিলেন।

সন্ন্যাসীর সহবাসে মণির চরিত্রে যে এক ধারার পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছিল, তাহার ফলে সে পিতার কথার প্রতিবাদ করা সঙ্গত মনে করিল না।

সে মায়ের নিকট সন্ন্যাসীর স্থানান্তরে আশ্রম নির্ম্মাণের টাকা চাহিয়া জেদ করিয়া বসিল।

একমাত্র ছেলের জেদ মা উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। স্বামীর নিকট সে কথা উত্থাপন করিয়া নিজেও যথেষ্ট ওকালতি করিলেন। অনেক বাক বিতণ্ডা, মান-অভিমান অভিনয়ের পর জমিদার একঢিলে দুই পাখী মারিবার এক ফন্দি স্থির করিলেন।

ছোট হিস্যার সহিত যে পতিত ভূখণ্ড লইয়া কিছুদিন পূর্ব্বে বিবাদের সূত্রপাত হইয়াছিল, সেই ভূখণ্ডে তিনি মণিকে তাহার সন্ন্যাসী দেবতার আশ্রম নির্ম্মাণ করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন।

গুপ্ত পরামর্শে স্থির হইল, মনিমোহন যদি ঐ ভূমিতে যাইয়া সন্ন্যাসীকে লইয়া আপাততঃ বসে, তবে ছোট হিস্যার কর্ত্রী মণির বিরুদ্ধে নিশ্চয় কোন প্রতিবাদ করিবেন না। ক্রমে মণি তাহাতে বড় হিস্যার ব্যয়ে ঘর তুলিবে এবং এইরূপে সেই বিস্তৃত ভূমি বড় হিস্যার দখলে আনিবার সহজ পন্থা হইবে।

মন্ত্রণা গুপ্ত রহিল। পরদিন জমিদারের আদেশে মণি মোহনকে লইয়া বড় হিস্যার এক কর্ম্মচারী আশ্রমের স্থান নির্ণয় জন্য গেলেন এবং সেই স্থানই মনোনীত করিয়া আসিলেন।

অল্প কাল মধ্যেই সেই নূতন ভূমিতে আশ্রমের জন্য বিশাল আটচালা গৃহ নির্ম্মিত হইল; শিষ্য ও শিষ্যাদিগের বাস গৃহ, উৎসব গৃহ, অন্তঃপুর, রান্নাঘর, পুষ্করিণী বাগান—একে একে সব নির্ম্মিত হইয়া আশ্রমের শ্রী ও পুলক জাগাইয়া তুলিল।

এইবার সন্ন্যাসীর নাম দূরে সহরে বাজারে প্রচারিত হইতে লাগিল লোকে বলিতে লাগিল, জীবানন্দ স্বামী স্বয়ং কল্কি অবতার।

আশ্রমে কীর্ত্তন ও উৎসবের বিরাম নাই বহু দূর দেশ হইতেও অনেকে স্ত্রী পুত্র, কন্যা, লইয়া আসিয়া সপরিবারে জীবানন্দের নাম-গান কীর্ত্তনের শিষ্য হইয়াছেন ও হইতেছেন।

মণিমোহনের মন সন্ন্যাসীর আচরণে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছে। সে এখন সন্ন্যাসী ব্যতীত আর কিছুই জানে না, আর কিছুই বলে না মা পুত্রকে এক দণ্ড গৃহে বসাইয়া

বৃন্দাবন গমনাভিলাষী তাদৃশ ব্যক্তিগণের পক্ষে বর্ত্তমানেই ইহা কথঞ্চিৎ প্রয়োজনে আসিবে।

শ্রীশ্রীচরণেষু—

অসংখ্য প্রণাম পূর্ব্বক নিবেদন এই বাস্তবিকই আপনার পত্রখানি পেয়ে আমার মন গরবে ভ'রে উঠছে যে আমি আপনার কত প্রিয়। আপনার আশীর্ব্বাদ শিরোধার্য্য। আমার এখানে আসার কারণ——

১। এখানে বাঙ্গালা দেশ হইতে খরচ পত্র কম। Messing charge আট টাকা। আমি যে কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছি তাহা free institution.

২। এটা জাতীয় বিদ্যালয় বা National college নন্-কো-অপারেশনের উপর অনেকটা ঝোঁক আছে।

৩। বেড়াবার সখও একটু আছে। পড়াশুনা ও বেড়ান দুই যদি হয় মন্দ কি?

যখন এখানে এসেছি, তখন আর শুধুই ফিরে যাবনা। আমাদের পড়াশুনা বেশ হচ্ছে। পূজোর ছুটি এখানে মাত্র তিন দিন (বাঙ্গালা দেশের মত লম্বা নহে) সুতরাং সে সময় বাড়ী যাওয়া হবেনা। আপনার সঙ্গে দেখা হবেনা বলে—বিশেষ দুঃখিত। গ্রীষ্মের ছুটিতে দেখা করতে চেষ্টা করব। সে সময় কোথায় থাক্‌বেন সংবাদ দিবেন। যে-যে বিষয় জান্‌বার দরকার হয় আমায় লিখ্‌লে যথা সাধ্য জানাতে ত্রুটি কর্‌বনা।

আমি থাক্‌তে থাক্‌তে যদি দয়া করে এখানে একবার আসেন তবে বিশেষ কৃতার্থ হই। এখানে—প্লেগ—হয়না। বাড়ীভাড়ার দরকার নাই। সহরের বাহিরে ষ্টেশনের নিকটে একটী বেশ বড় ও সুন্দর ধর্ম্মশালা আছে, সেখানেই অনেক ভদ্রলোক বাসা নিয়া থাকেন। ওখানে আপনার ও থাকিবার ব্যবস্থা করিতে চেষ্টা করব। তা না-হয় বাড়ীভাড়া নেওয়া যাবে। এখানে আসিতে দুইটী বিষয়ে বিশেষ সাবধান হ'তে হয়। প্রথম পাণ্ডাদের কবল; দ্বিতীয়তঃ বানরের অত্যাচার। অপর যাহা যাহা জান্‌বার দরকার হয় দয়া করে লিখ্‌বেন।

বৃন্দাবনে অনেক মন্দির আছে, তার মাঝে কয়েকটী বেশ সুন্দর। প্রাচীন মন্দির গুলির মধ্যে গোবিন্দজীর প্রাচীন মন্দির ছিল সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর, সবটা রক্ত প্রস্তরে গঠিত; আওরেজজেব তাহার ধ্বংশ সাধন করিয়াছিলেন। এখন ও তাহার ধ্বংশাবশেষ বিরাট আকারে অবস্থিত আছে। তাহার এক খানা চিত্র পাঠাইলাম। মদনমোহন এবং গোপীনাথ জীর মন্দিরের ও এই অবস্থা। তাহাদের দেবতার স্থানে চাম চিকার বাস। আসল দেবতা জয়পুরে আছেন নকল দেবতা নূতন মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। ইহাও অতি প্রাচীন। ঝুলনের উৎসব এখানকার শ্রেষ্ঠ উৎসব। সে সময় নূতন মন্দির গুলি নানা রূপে সাজান হয়। তবে বৃন্দাবনের সে সৌন্দর্য্য আর নাই। প্রাচীন মন্দির গুলি ক্রমেই ধ্বংস স্তূপে পরিণত হচ্ছে। যমুনা ক্রমেই বৃন্দাবন ছাড়িয়া দূরে যাচ্ছে। ঘাট গুলি সমস্তই ভগ্ন। কেবল কেশী ঘাটে * সামান্য জল আছে, তাও আবার পচা দুর্গন্ধ, ব্যবহারে অযোগ্য; গ্রীষ্মকালে (নাকি) একেবারেই শুকিয়ে যাবে। নদীতে ও বর্ষাছাড়া অন্য সময় অল্পই জল থাকে। এই জন্য এখান কার স্বাস্থ্য ভাল নয়। বাঙ্গালার মতই এখানে ম্যালেরিয়া হয়। এখানে গ্রীষ্মকাল যেমন প্রচণ্ড গরম শীতকালে তেমনই প্রবল শীত। দিনে মাছির অত্যাচার, রাত্রে মশা। জলে কাদায় স্থলে বানরে। আর বৈরাগীকুলের অত্যাচারও কম নহে। বৃন্দাবনে ঢুক্‌তেই সর্ব্বাঙ্গে ছাপ কাটা গলায় কুড়ে-মালি- তুলসীর, ঐ সকল জীবের সহিত প্রথম আলাপ হয়। সর্ব্বদাই তাহাদের গলায় হরিনামের ঝোলা; অথচ কি আশ্চর্য্য, সে হাতে থাচ্ছে মালা ঠক ঠক্ করছে। এটো জ্ঞান একেবারে নাই। ইহাদের চেহারা দেখলেই বুঝাযায় যে এদের চরিত্র খুব খারাপ, অথচ ধর্ম্মের ভাণক'রে কেবলি শীকার খুঁজে বেড়াচ্ছে। লোকের আর্থিক অবস্থা সাধারণতঃ গরীব। চরিত্র খারাপ। ঘি টাকায় ছয় ছটাক, দুধ চারসের।

সহরের মধ্যে আমি কোথাও মাধুরী দেখতে পেলেম না। সমস্তই ভণ্ডামী ব'লে বোধ হয়। বৃন্দাবনের প্রাণ সেই প্রেমরস আর নাই; আছে শুধু শুষ্ক কঙ্কাল পড়িয়া। এখন বনের বদলে যে দিকে তাকানো যায় সেই দিকেই শুধু দালান আর দালান। তবে সহরের বাহিরে জঙ্গলের মধ্যে যমুনার ধারে ধারে এবং নদীর পর পারের ক্ষুদ্র গ্রাম গুলিতে

* কেশী নামক দৈত্য বিশেষের নাম অনুসারে কেশীঘাট নাম। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ—কেশী নিসূদন।

সেই সূত্রেই দোলায়মান একটী শঙ্খ। কনুই দেশের উপর বাহুতে উহাদের অলঙ্কার বাহু বলয় হস্তী দন্ত বা লাল পীত-

চুল কাটিতেছে।

বর্ণ বেত্র জাল দ্বারা নির্ম্মিত। হনু ও জঙ্ঘা দেশের মধ্য ভাগে বেত্র নির্ম্মিত বলয়। সম্মুখ ভাগস্থ মাথার কেশ রাশি সাধারণতঃ সমচুতষ্কোণাকারে ছাটান। পশ্চাৎভাগস্থ কেশরাশি উহারা ঈগল পক্ষীর পালক দ্বারা গাইটাকারে বাঁধিয়া রাখে।

নাগা নারীগণ—আকৃতিতে খাট। উহাদের মুখভাব সাতিসয় সরলতাপূর্ণ। ইঁহারা উল্কী পরিতে ভাল বাসে। কিন্তু আউ নাগা স্ত্রীলোকেরা উল্কি শরীরে বেশী পরে উল্কির ও প্রণালী আছে। উহা আউ নাগাদের ইতি বৃত্তে বিস্তারিত বলিতে চেষ্টা করিব। পরিবারস্থ সকলের আবশ্যকীয় বস্ত্রাদি নির্ম্মাণ করা, গৃহের মধ্যে অন্যান্য কাজ করা, কাষ্ঠ কাটা এবং জলটানা চাউল প্রস্তুত করা নাগা নারীগণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। স্ত্রীলোকেরা বাশের চোঙ্গায় করিয়া জল বহন করিয়া আনে।

বর্ষা ঢাল এবং দাও নাগাদের জাতীয় অস্ত্র। কৃষি কার্য্যের জন্য দাওই উহাদের একমাত্র যন্ত্র। গার্হস্থ্য সকল কার্য্যেই দাও ব্যবহৃত হয়। বর্ষার বাঁটটী বেত্রতন্তু এবং রঞ্জিত কেশ দ্বারা আবৃত থাকে। ঢালটী ৫ ফিট লম্বা ১৮ ইঞ্চি প্রশস্ত। ঢালখানা বংশ খণ্ড দ্বারা বেষ্টিত, সম্মুখ ভাগ বাঘ অথবা ভল্লুকের চর্ম্মদ্বারা আবৃত এবং পশ্চাৎ ভাগ একটী কাষ্ট ফলাদ্বারা রক্ষিত। যখনই তাহারা কোন যুদ্ধে যাত্রা করে তখনই তাহারা কয়েক ইঞ্চি লম্বা সূক্ষ্মাগ্র বিশিষ্ট অংসংখ্য বংশ খণ্ড সঙ্গে লইয়া যায়। ঐ বংশ খণ্ড সমূহের অর্দ্ধাংশ মাটীতে পুতিয়া রাখে যেন তাহাদের অনুসরণ করিতে শত্রু-গণের বিলম্ব হয়।

অল্প কয়েক বৎসর যাবৎ বন্দুক প্রভৃতি লাভ করিতে তাহারা সমর্থ হইয়াছে। সকল নাগারই শ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষা—আগ্নেয়াস্ত্র লাভ করা। অস্ত্র

বাঁশের চোঙ্গায় করিয়া জল আনিতেছে।

শস্ত্র ও গোলা বারুদের আমদানী নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও

নাগাগণ মণিপুর হইতে তত্রত্য প্রস্তুত বন্দুক লাভের যোগাড় করিতে নিরস্ত হয় না।

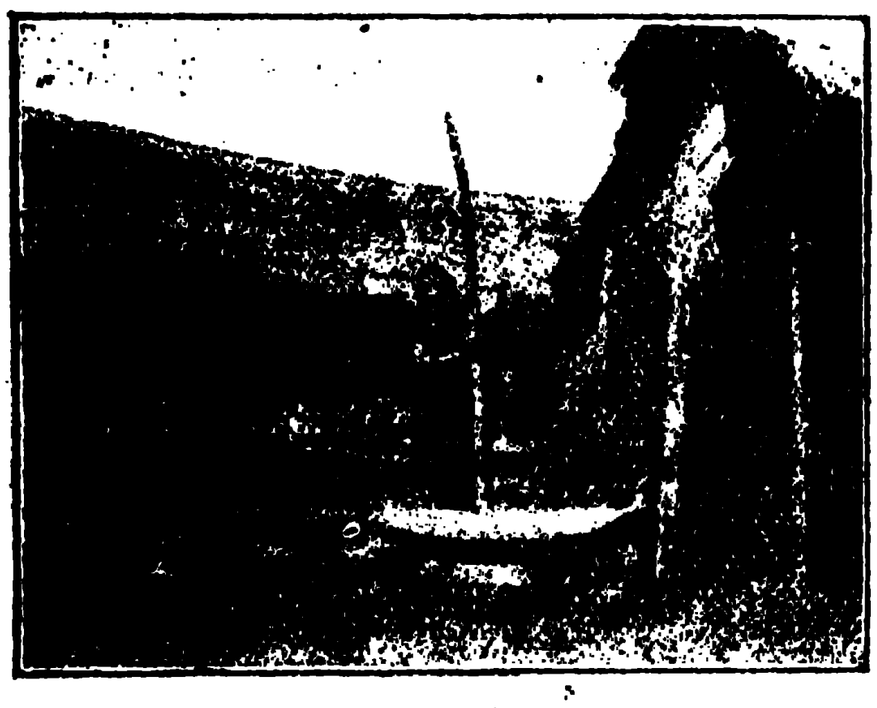

একটী নাগিণী ধান বাঁধিতেছে।

আংগমি দের সমস্ত গ্রাম গুলি পাহাড়ের শিখর দেশে অবস্থিত এবং চতুর্দ্দিকে প্রস্তরময় প্রাচীর পরিখা দ্বারা সুরক্ষিত। এবং দূর হইতে সুরক্ষিত দুর্গের ন্যায় দেখায়। তাহাদের গ্রামে প্রবেশ করিবার সমস্ত পথই গুপ্ত। পথগুলি এভাবে নির্ম্মিত যে এক সঙ্গে দুই জন প্রবেশ

খড়ি বহন করিয়া নিতেছে।

করিতে পারে না। দ্বার দেশে প্রহরী নিযুক্ত আছে। তাহাদের বাসগৃহগুলির ছাদ প্রায় ভূমিস্পর্শী। গৃহে সাধারণতঃ দুটী করিয়া প্রকোষ্ট আছে। আকারে সাধারণতঃ ৫০ ফিট লম্বা ৩০ ফিট প্রশস্ত। মরং গৃহ যেখানে অবিবাহিত যুবারা রাত্রি বাস করে। মরং গৃহ নির্ম্মাণ প্রণালী কৌতুহলোদ্দীপক। নাগাদের বিবাহ পদ্ধতিও স্বতন্ত্র।

নাগা গৃহ।

নাগা যুবকদের ২০।২২ বৎসরে ও বালিকাদের ১৬।১৭ বৎসর বয়সে বিবাহ ঘটিয়া থাকে। বিবাহের পূর্ব্বে যুবক যুবতীর প্রণয় সঞ্চার হয় এবং তাহারা স্বচ্ছন্দ বিহার করে। পরস্পর পরস্পরের মনোনীত হইলে আপন আপন পিতামাতাকে বিবাহের ইচ্ছা জ্ঞাপন করে। একাধিক বিবাহের রীতি নাই। কাহারও দুইটী স্ত্রী থাকিতে পারে কিন্তু দুই ভগিনীকে এক সঙ্গে বিবাহ করা যায় না। অবিবাহিত যুবক যুবতীরা পৃথক পৃথক গৃহে শয়ন করে। ছোট ছেলে মেয়েরা পিতামাতার সঙ্গে থাকে। কোন কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির গৃহে যুবক যুবতীর একত্র থাকিবার নিয়ম আছে।

যুবতির সম্মতি ঘটিলে যুবকের পিতা এবং পিতৃহীন হইলে, যুবক নিজে তাহার খেলবাসী কোন বৃদ্ধা স্ত্রীলোককে বিবাহের প্রস্তাব করিয়া যুবতীর পিতার নিকট পাঠায়। যুবতীর পিতার অভিপ্রায় থাকিলে, যুবক যুবতী উভয়ে স্বপ্ন চিন্তা করিয়া থাকে। স্বপ্নে ব্যাঘ্র, ধান্য ও জল দর্শন কল্যাণকর এবং মৃত দেহ ও শূকর দৃষ্ট হইলে অমঙ্গল ঘটে। উভয়ের স্বপ্ন শুভজনক হইলে বিবাহের পণ ধার্য্য হয়। মিথুন, গরু, শূকর, ধান মালা এবং শস্য ক্ষেত্র প্রভৃতি যৌতুক সামগ্রী। যুবতীর পিতা যাহা পাইবে, যুবকের পিতাকেও তাহার অর্দ্ধেক অন্তত যৌতুক স্বরূপ দিতে হইবে। যৌতুক ধার্য্যের পর বিবাহের দিন স্থিরীকৃত হয়।

পঁহুছিবা মাত্র তাহার আপাদ মস্তক জ্বলিয়া উঠিল। কাণের সঙ্গে আটকাণো সোণার শিকলটা শুদ্ধ নাকের গোলাকার নথটায় একটা প্রলয়ঙ্করী নাড়া দিয়া হেমন্ত বেশ্যা চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল।

"ঘরের স্ত্রীর খবরদারির জন্য যাদের পরের খোসামুদি করে মরতে হয়, তাদের মুখে আগুণ! বলি ও মুক্তা! খবরদারির দরকার হয়তো হেমন্ত বেশ্যাকে ডাকিস্। ভদ্দর ঘরের কলজে অতপুরু হয় না যে পরের দরদে ঘর ফেলে আসবে।"

কারো প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়া কথাগুলি পিসিমাকে বেশ শুনাইয়া শুনাইয়া হেমন্ত বেশ্যা সদর্পে চলিয়া গেল। হেমন্ত বেশ্যা চলিয়া গেলেও কথাগুলির ঝাঁজে পিশিমার বুক জলিয়া যাইতে লাগিল। তিনি মুক্তার পানে একটা বিশ্রী রকম ভ্রূকুটি করিয়া কহিলেন—

"বেশ্যার মুখ কিনা, মুখে যা এলো তাই বলে চলে গেল। তুই পোড়ার মুখীকে দুকথা শুনিয়ে দিলিনে কেন বৌ?"

মুক্তা চুপ করিয়া থাকিল। পিসিমার কথা শুনিয়া তার বারবার মনে হইতে লাগিল, আজ বেশ্যার মুখ দিয়া যে ঠাকুর কথা কহিলেন, পিসিমার ঠাকুরঘরে তো সে দেবতার আসন পড়ে নাই!

পিসিমা চলিয়া যাওয়ার পর মুক্তা ম্লানমুখে শূন্য কলসী লইয়া স্নানের জন্য বাহির হইল। তখন ভরা দুপুর অনেকক্ষণ গড়াইয়া গিয়াছে। স্মরণাতীত কাল হইতেই এই সময়টা রতনপুরের ভদ্র ইতর স্ত্রীপুরুষদের দিবানিদ্রার নির্দ্দিষ্ট সময় জানিয়াই মুক্তা প্রত্যহ এই সময় পালচৌধুরীদের বড়োবাড়ীর বড় দীঘির ভাঙ্গাঘাটে স্নানের জন্য হাজির হইত। মুক্তা অসময়ে স্নান করিতে ঘাটে আসার ভিতরে ছোট্ট একটা কথা আছে খুবই ছোট, এক ফোঁটা অশ্রুর মত! সে আর কিছুই নয়, মুক্তার পরণের কাপড় খানা এতই ছোট আর এতই ছেঁড়া, যে তা পরিয়া বাহিরের লোকের সমুখে আসা চলে না? সময় বুঝিয়াই লজ্জা নিবারণ হরি মুক্তার সৌন্দর্য্যের প্রাচুর্য্য লোক লোচনের সমক্ষে আরো অরক্ষনীয় করিয়া তুলিলেন। লজ্জাশীলার লজ্জা লইয়া লজ্জা নিবারণ হরির চিরকাল একি নিষ্ঠুর খেলা আর সে নারী ধর্ম্মের মাথায় পদাঘাত করিয়া বিশ্বের হাটে লজ্জা বিক্রয় করিয়াছেন তার বসন ভূষণের বোঝা জরির পাহাড়ের মত দিন দিন উঁচুই হইয়া উঠিতেছে?

তিল ফুলের লালচে হাসির ঢেউ খেলানো মাঠের ভিতর দিয়া আঁকা বাঁকা সবুজ আল ধরিয়া মুক্তা ভাবিতে ভাবিতে স্নানের ঘাটে পঁহুছিল? এককালে পাল চৌধুরীদের দীঘির ঘাট পাকা ছিল এখন পাকা ঘাটের চাঁদিনা কাটিয়া গিয়া সিঁড়ির পাকা ধাপগুলি কালস্রোতে অদৃশ্য হইয়া গেছে। মরা ছাতিম গাছের একটা জীর্ণ গোড়া সেঁওলা ধরা বাঁশের খুঁটীর সঙ্গে বাধিয়া তৈরী করা ঘাটটাই এখন পড়ো দীঘির সৌভাগ্যের দিনের একমাত্র স্মৃতিচিহ্ন! ঘাটের দুপাশের ঝাঁপ ঝোড় ও মাথার উপর হেলিয়া পড়া বুনোগাছের একখানা পাতাভরা ডালই স্নানের ঘাটের চারিদিকে একখানা সবুজ পর্দ্দা বুনিয়া রাখিয়াছে।

সেই ঘাটটীর উপর ধীরে ধীরে পা ফেলিয়া মুক্তা আসিয়া বসিল? চারিদিক নিস্তব্ধ, কোথাও মানুষের সাড়া শব্দ নাই। বনফুলের আশে পাশে কেবল নানা রঙ্গ বেরঙ্গের প্রজাপতি ম্লান রৌদ্রে পাখা দুলাইয়া নৃত্য করিতেছিল? শ্যামল তরুলতায় লীলায়িত হইতেছিল নব বসন্তের একটু কোমল উচ্ছাস অদৃশ্য পাখীর অস্ফুট গানে কোন সুদূর অলকা হইতে ভাসিয়া আসিতেছিল, এক অশ্রুত মধুর অভিনব বিরহ ব্যথা। শ্যামল প্রকৃতির পত্র পুষ্প রঞ্জিত শীতল স্নেহমাখা কোনটীর ভিতর বসিয়া মুক্তা আজ অনেকদিন পরে নিজের মনের লাগাল পাইয়াছে। তাই আজ সে স্নান করিতে আসিয়া স্নানের কথাই ভুলিয়া গিয়া আপনার ভাবনা হিল্লোলে দুলিতে দুলিতে ভাসিয়া চলিল—

সব চিন্তার মধ্যে একটা কথাই তার মনে খুব বড় হইয়া উঠিল। সেটা এই যে সহরের খোসরোজে রূপ যাচাই করিয়া ফিরাই কি মানুষের চিত্তের সব চেয়ে বড় নেশা! গৃহছায়ায় বিকশিত সরস হৃদয় নিকুঞ্জে মানুষের মনমুগ্ধকর কি কোন সৌরভ নাই! তা না থাক,—বিনোদলাল যেখানে খুসী পালাইয়া যাক না কেন, মুক্তার হৃদয় ছাড়িয়া তো সে কোথাও পালাইয়া যাইতে পারিবে না! এমনি করিয়াই মনকে বুঝদিয়া মুক্তা তার গৃহবিমুখ পলাতক স্বামীটীর জন্য হৃদয়ের

একজন আধুনিক শিক্ষিত উচ্চরাজ কর্ম্মচারী একজন প্রাচীন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের সহিত আলাপ প্রসঙ্গে বলিলেন "সংস্কৃত অপাঠ্য কেননা তাহাতে এত অশ্লীল কথা রহিয়াছে যাহা পিতাপুত্রে, অধ্যাপক ও ছাত্রে পঠন পাঠন চলে না চলিতে পারেনা ইহার উত্তরে উক্ত বৃদ্ধ পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন "মহাশয়! আমরা যে পিতামাতার সন্তান, ইহা অপেক্ষা অশ্লীল বিষয় আর কি আছে? সুতরাং পিতাপুত্রে একত্র অবস্থান ও বিষম অশ্লীলতা প্রকাশক ব্যাপার

সংস্কৃত সাহিত্যের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে "সাহিত্য দর্পণকার" বলিতেছেন "যেহেতু মূর্খ লোকেরও একমাত্র কাব্য হইতেই অনায়াসে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ সাধিত হয় সুতরাং কাব্যের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিব। একটী মাত্র শব্দ সম্যকরূপে প্রযুক্ত হইলে, সম্যকরূপে জ্ঞাত হইলে স্বর্গে ও ইহলোকে কামধেনু তুল্য ফলপ্রদ হয়"*

এই চতুর্ব্বর্গ সাধন হিন্দুর প্রত্যেক বিষয়ের মূলকথা। তাহারা যে কোন গ্রন্থই রচনা করুন না কেন সেই গ্রন্থের ভাল মন্দের মানদণ্ড ছিল এই চতুর্ব্বর্গ সাধনতা। শুধু অর্থ ও কাম, সুপ্রচলিত কথায় শুধু আর্ট বস্তু তন্ত্রতা তাহাদের নিকট আদরণীয় হয় নাই। তাহাদের লিখিত বিষয়ে যে কম আর্ট ও বস্তু তন্ত্রতা আছে বা কম মনোবিজ্ঞান আছে তাহা যিনি শকুন্তলার বঙ্গানুবাদ ও অন্ততঃ পাঠ করিয়াছেন তিনিও অস্বীকার করিবেন না।

কিন্তু এই আর্টের সহিত তাহাদের প্রধান প্রচারের বিষয় ছিল ধর্ম্ম ও মোক্ষ! সাহিত্যে ধর্ম্মের বক্তৃতা নাই, মোক্ষের কথাও প্রতিছত্রে প্রকাশ পায় নাই, কিন্তু ধর্ম্ম মোক্ষের কথা আছে। সাহিত্য দর্পনকার বলিতেছেন—সাহিত্য হইতে এই ভাবটী পাওয়া চাই "রামাদিবৎ প্রবর্ত্তিতব্যং ন রাবনাদিবৎ" অর্থাৎ অধীত গ্রন্থ হইতে এই ভাবটী হৃদয়ঙ্গম হওয়া চাই যে "আমরা রামাদির মত চলিব রাবনাদির মত নহে।" ইহাই সাহিত্যে ধর্ম্ম ও মোক্ষের কথা। প্রত্যেক প্রাচীন সৎসাহিত্যে এই ভাবটী পাওয়া যাইবে।

অবশ্য তথা কথিত আর্টের দোহাই দাতারা বলিতে পারেন "আমার গ্রন্থ হইতেও ঐ ভাবই পাওয়া যাইবে, পাঠকের মূর্খতা হেতু তাহারা অন্যরূপ দোষারোপ করেন।" একথার উত্তর দেওয়া কঠিন—তবে একটা সাধারণ কথা এই বলা যাইতে পারে যে যখন পৌনে ষোলআনা পাঠক একরকম বোঝেন তখন লেখকের বেশী জানেন বাহাদুরীটা কতদূর বিচার-সহ তাহার বিচারক সর্ব্ব-সাধারণ!

(৪)

এস্থলে সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে আর একটী কথা বলা প্রয়োজন। সাহিত্য দর্পনকার বলিতেছেন "তীক্ষ্ণধী ব্যক্তিগণ বেদ দর্শনাদি শাস্ত্র হইতেই চতুর্ব্বর্গ সাধন করিতে পারেন; মাত্র অল্পবুদ্ধি ব্যক্তি তাহ'লে কাব্য পাঠ করিবে—এরূপ আশঙ্কা অমূলক কেননা বেদ দর্শনাদি শাস্ত্র হইতে চতুর্ব্বর্গ প্রাপ্তি হয়, সন্দেহ নাই কিন্তু সরস কাব্য হইতে সহজেই হইয়া থাকে। যে রোগ কটুতিক্ত ঔষধ খাইলেও আরাম হয় সেই রোগ যদি বাতাসা খাইলেও সারে তবে কোন্ রোগী শর্করা ফেলিয়া তিক্ত ঔষধ খাইয়া থাকে? এই ভবরোগের তিক্ত ঔষধ স্বরূপ দর্শনাদি শাস্ত্রের পরিবর্ত্তে রসপূর্ণ সাহিত্যরূপ শর্করা সৃষ্টি। এজন্য সংস্কৃতে কাব্যের লক্ষণ—"বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং।" এই রসাত্মক বাক্য যদি চতুর্ব্বর্গ সাধনোপযোগী হয় তবেই সৎকাব্য হয়—নচেৎ "রসাভাস" হয়। সাহিত্য দর্পন লিখিয়াছেন "অনৌচিত-প্রবৃত্ত্বে-আভাসো-রসভাবয়োঃ" অর্থাৎ অনুচিত ভাবে বর্ত্তমান হইলে "রসাভাস" হয়। বিজ্ঞ সমালোচক মাত্রেরই কর্ত্তব্য যে বর্ত্তমান বঙ্গ সাহিত্যে কতখানি রসাভাস প্রবেশ করিয়াছে তাহা বিশেষণ করিয়া দেখান। রসই সাহিত্যের প্রাণ—বিকৃত রুচির অনুচিত প্রবৃত্ত রসভাস সাহিত্যের আততায়ী। এই আততায়ী সম্বন্ধে ধর্ম্ম শাস্ত্রের উপদেশ "আততায়ীকে তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট করিবে, আততায়ী বিনাশে পাপনাই" তাহাতে আর্ট, বস্তু তান্ত্রিকতা, ও মনোবিজ্ঞান ষোলকলায় থাকিলেও সে বধার্হ।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র কাব্যতীর্থ জ্যোতিঃ সিদ্ধান্ত।

---

*"চতুর্ব্বর্গ ফল প্রাপ্তিঃ সুখাদল্প ধিয়ামপি,
কাব্যাদেব যতস্তেন তৎস্বরূপং নিরূপ্যতে"
"একশব্দঃ সুপ্রযুক্তঃ সম্যাগ জ্ঞাতঃ স্বর্গে
লোকেচ কামধুগ্ ভবতি।"

স্মৃতি-শক্তি।

প্রত্যেক মানবের মধ্যে স্মৃতি শক্তির নানারূপ পার্থক্য দেখিতে পাই। কেহবা একবার শুনা মাত্রই কথাটী মনে রাখিতে পারেন কেহবা বহু চেষ্টা করিয়াও উহা পারেন না। এরূপ লোকও দেখা যায় যে মস্তকে কোন গুরুতর আঘাত কিম্বা মন কষ্টের পরে অতীত জীবনের সমস্ত ঘটনা বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন। যদিও একেবারে ভুলিয়া যাওয়া বিরল দেখা যায় তথাপি আমরা প্রায় সকলেই অল্লাধিক পরিমাণ অতীত জীবন বিস্মৃত হইয়া থাকি অথবা কাহারও নাম, কোন তারিখ কিম্বা ঘটনা স্মরণ করিতে অনেক কষ্ট হয়। সেই জন্যই এইরূপ স্মৃতি ভ্রমের কারণ অনুসন্ধান করা কৌতুকাবহ সন্দেহ নাই। এখন দেখা যাক্ ঘটনা আমাদের স্মরণ থাকে কি প্রকারে। ইহা বলা বাহুল্য যে মস্তিষ্কই আমাদের স্মৃতিশক্তির আধার। মস্তিষ্কের উপরিভাগে অসংখ্য আনুবিক্ষণীক কোষ আছে যাহাদের মধ্যে আমাদের জীবনের ঘটনাবলী মুদ্রিত হইয়া থাকে। কাজেই অতীত জীবনের সমস্তই আমাদের স্মরণ থাকিবার কথা; কেবল আমরা উহা মনে করিতে না পারাকেই বিস্মৃত হওয়া বলিয়া থাকি। এই সকল স্মৃতি কোষ গুলি চতুর্দ্দিকে সূক্ষ্ম শিকর বা মূল সমূহ বিস্তার করিয়া থাকে ফলে এক কোষের মূলের সহিত অন্য কোষের মূল ঘন সন্নিবিষ্ট বনানীর মূলের মত বিজরিত হইয়া পড়ে। এই মূলে মূলে যোগাযোগের দ্বারা সুস্থাবস্থায় আমরা ইচ্ছাশক্তি বলে যে কোন ঘটনা স্মৃতি পথে আনিতে পারি। যখন আমরা ভ্রান্তি কিম্বা মনঃকষ্টে কাতর হই অথবা রোগ-শোকের দ্বারা মস্তিষ্ক রক্তহীন হইয়া পরে; কিম্বা ঐরূপ কোন কারণে স্মৃতি কোষ সমূহ কিম্বা উহাদের মূল শীর্ণ কিম্বা কুঞ্চিত হইয়া নিকটস্থ কোষের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করে তখনই আমরা চেষ্টা করিয়াও অনেক বিষয় স্মৃতিপথে আনিতে পারি না। যেরূপ দেশব্যাপী টেলীগ্রামের তারের জাল মাঝে মাঝে কাটিয়া দিলে সমস্ত দেশের খবরাখবর বন্ধ হইয়া যায়, সেইরূপ মস্তিষ্কের স্মৃতিরাজ্যে ও স্মৃতিকোষ বিশুষ্ক হইয়া স্মৃতি ভ্রম জন্মাইয়া থাকে

আমারা দৈনন্দিন জীবনে দেখিতে পাই কখন একটী নাম স্মরণ করিতে বহু চেষ্টা করিয়াও উহা স্মৃতি পথে আনা যায় না। এ বিষয়ের আলোচনা ও চিন্তা ত্যাগ করিয়া বিষয়ান্তরে মন স্থাপন করিয়া একটু বিশ্রাম নিলেই হঠাৎ এক সময়ে সেই নামটা আপনা হইতেই যেন মনে হইয়া পড়ে। উহার স্থূল কারণ মস্তিষ্কের স্মৃতি কোষ সকল রক্ত সঞ্চালন দ্বারা স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া কার্য্যকরী হওয়ার সুযোগের অভাব।

কখন কখন সাক্ষাৎ ভাবে বিষয়টী স্মৃতি-পথে না আনিতে পারায় অন্য বিষয় অবলম্বনে উহা মনে আনিতে হয়। কারণ কোষ সমূহের সাক্ষাৎ যোগাযোগের ব্যাঘাত হওয়াতে অপর রাস্তায় শক্তি চালনা হইয়া থাকে।

মস্তিষ্কের গুরুতর আঘাত ইত্যাদির দ্বারা কখন কখন ঘটনাবলীর একটা শৃঙ্খল বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতে দেখা যায় এই শৃঙ্খল কতিপয় দিবস, মাস, কিম্বা বৎসর ব্যাপী ঘটনাবলী লইয়া হইতে পারি। এই আঘাতের দ্বারা মস্তিষ্কের উপরে অল্লাধিক রক্তস্রাব হইতে পারে, রক্তের চাপ অল্প হইলে অনেক সময়ে উহা সারিয়া যায় কিন্তু চাপ গুরুতর হইলে তাহাদ্বারা স্মৃতি কোষ অনেক বিনষ্ট হইয়া যাইতে পারে; সে সময় চিকিৎসাদ্বারা রোগীর কোন ফল হয় না। আঘাত না হইলে অন্য কারণেও স্মৃতি ভ্রম হইতে পারে। নানারূপ মানসিক কারণ দ্বারা এই স্মৃতি কোষ সমূহের কতিপয় অংশ অপর সকল হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে; তাহা হইলেও লোক জীবনের খানিক অংশ ভুলিয়া যাইবে। বাল্যাবস্থায় এইস্মৃতি কোষ সমূহ সতেজ থাকে, বলিয়া বাল্যের ঘটনাবলি স্মৃতি-কোষে যেরূপ বদ্ধ মূল হইয়া থাকে, বৃদ্ধ বয়সে ঐ কোষ সমূহ দুর্ব্বল হওয়াতে স্মৃতি-শক্তি তত থাকে না। চিকিৎসা শাস্ত্রমতে দুই উপায়ে অতীত ঘটনাবলি-স্মৃতি পথে আনা যাইতে পারে। প্রথম উপায় Hypnotic Suggestion দ্বারা অতীত ঘটনা বিভ্রাটের মনে আনিয়া দেওয়া যায়; কিন্তু এই উপায় যান্ত্রিক কোন ব্যতিক্রম হইলে কার্য্যকরি হইবে না। দ্বিতীয় উপায় তাড়িৎ প্রবাহ দ্বারা স্মৃতি কোষের শক্তি বৃদ্ধি করিয়া উহাদিগকে কার্য্যকরী করা যায়। আমরা অদ্য স্মৃতিশক্তি সম্বন্ধে যতটুকু আলোচনা করিলাম ইহা কেবল মাত্র স্থূল শরীর নিয়া করা হইল মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়া নহে।

শ্রীহরিচরণ গুপ্ত

ভিক্ষা করিবেনা। গুরুর আশ্রমের দূরবর্ত্তী স্থান হইতে যজ্ঞীয় কাষ্ঠ আহরণ করিয়া শূন্য স্থানে রক্ষা করিবে, প্রতিদিন সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে ঐ কাষ্ঠ দ্বারা হোম করিবে। এই ভিক্ষা-চরণ ও অগ্নিকার্য্য ব্রহ্মচারীর পক্ষে অত্যাবশ্যক। যে ব্রহ্মচারী সুস্থাবস্থায় ইহার অন্যথাচরণ করিবেন তিনি প্রায়শ্চিত্তার্হ। ব্রহ্মচারী ভিক্ষালব্ধ সমস্ত বস্তু প্রসন্নচিত্তে গুরুর নিকট অর্পণ করিবেন। গুরুর প্রয়োজনোপযোগী উদকুম্ভ, পুষ্প, গোময়, মৃত্তিকা ও কুশ আহরণ করিবে। মধু, মাংস, গন্ধদ্রব্য, মাল্য উদ্রিক্ত-রসযুক্ত বস্তু (গুড়াদি), স্ত্রী, শুক্ত (যাহা স্বভাবতঃ মধুর, কালে অম্লতা প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাকে শুক্ত কহে), প্রাণিহিংসা, অভ্যঙ্গ (তৈলাদিদ্বারা শির সহিত দেহ মর্দ্দনকে অভ্যঙ্গ কহে), চক্ষুতে অঞ্জন প্রদান, উপানহ (চর্ম্মপাদুকা) ও ছত্রধারণ ভোগবিষয়ে অতিশয় অভিলাষ, ক্রোধ, লোভ, নৃত্য, গীত, বীণাদিবাদ্য, দ্যূতক্রীড়া, লোকের সহিত অনর্থক বাক্‌কলহ, মিথ্যাবাক্য, অষ্টাঙ্গমৈথুন, পরের অপকার ইত্যাদি বর্জ্জন করিবে। এতদ্ব্যতীত আরও বহু নিয়ম পালন-পূর্ব্বক ব্রহ্মচারীকে গুরুগৃহে বাস করিয়া শিক্ষালাভ ও জ্ঞানার্জ্জন করিতে হইত। এমন কি শিষ্য ভোজন পর্য্যন্ত গুরুর অনুমতি ব্যতীত করিতে পারিত না। এই সমস্ত নিয়ম পালনদ্বারা শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক যে প্রকার উন্নতি সাধিত হইত, তাহার চিত্র প্রাচীন ভারতেতিহাসের প্রতি পত্রে অতি উজ্জ্বল রেখায় চিত্রিত রহিয়াছে। এইরূপভাবে দৈনিক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহদ্বারা দৈনন্দিন কার্য্যপ্রণালীর মধ্যদিয়া আর্য্যসন্তানগণ ঔপদেশিক ও দৃষ্টান্তগত যে শিক্ষালাভ করিতেন, তাহারই ফলে তাঁহারা বীর নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। এই প্রকার শিক্ষাপ্রণালীর ফলেই—কি জ্ঞানলাভের নিমিত্ত কঠোর তপশ্চর্য্যা সাধনে, কি দৈহিক উন্নতিতে, কি ত্যাগশীলতায় সর্ব্বাংশেই মনুষ্য সমাজের আদর্শ স্বরূপ বহু বীরপুরুষ ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই শিক্ষার প্রভাবেই দেখিতে পাই রামচন্দ্র পিতৃসত্যপালনার্থ অনায়াসে রাজমুকুট ও রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ জটাবল্কল ধারণপূর্ব্বক বনবাসের ভীষণ ক্লেশ স্বীকার করিতে কিঞ্চিন্মাত্রও দ্বিধাবোধ করেন নাই; ঐ পঞ্চভ্রাতাও এইপ্রকারে অতুল ধনসম্পত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক বনগমন করিয়াছিলেন। ভীমার্জ্জুন প্রভৃতি অমিত পরাক্রমশালী হইয়াছিলেন; মহাবীর ভীষ্ম অদ্ভুত ত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন; এইরূপ শত শত দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে, যাঁহাদের অত্যাশ্চর্য্য চরিত্রবলের কাহিনী পাঠ করিলে বিস্ময়ে ও পুলকে শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠে। কিন্তু "তেহি নো দিবসাঃ গতাঃ।"

যে শিক্ষা ও সভ্যতা একদিন ভারতকে জ্ঞানের গৌরবময়-উজ্জ্বলচ্ছটায় দীপ্তিমতী করিয়া তুলিয়াছিল! কালস্রোতের আবর্ত্তনে সে শিক্ষা, সে সভ্যতা ও সে সাধনার বিলোপ হওয়ায় ভারত দিন দিন সর্ব্ববিষয়ে দীনহীন ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে—আজ ভারত পরপদানত, ঘৃণিত, লাঞ্ছিত।

যে সময় ইউরোপ অজ্ঞানতার ও অসভ্যতার ঘোর ঘনান্ধকারে আবৃত ছিল সেই সময় যে ভারতের জ্ঞানালোক রশ্মি তথায় পতিত হইয়া জ্ঞান ও সভ্যতালোকে আলোকিত করিয়া তুলিয়াছিল আজ ভাগ্যবিপর্য্যয়ে সেই ভারতবাসীই ইউরোপের অধিবাসী-বৃন্দের নিকট অসভ্য বর্ব্বর নামে অভিহিত হইতেছে, এ দুঃখ রাখিবার স্থান কোথায়? যেদিন হইতে ভারত পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইল, সেইদিন হইতেই ভারতবাসী ক্রমে ক্রমে হীনদশা প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে; বর্ত্তমান সময় ভারতবাসীরমত পরমুখাপেক্ষী বোধ হয় আর এ জগতে কেহ নাই

ইউরোপের অন্যান্য দেশে ও ইংলণ্ডে বর্ত্তমান সময় যেরূপ শিক্ষা প্রচলিত আছে দেহাত্মবাদই তাহার মূল ভিত্তি। ঘোর নাস্তিকতা ও জড়বাদ সমগ্র পাশ্চাত্যভূখণ্ডকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। তাহারই ফলে তথায় জড়বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইতেছে এবং নিত্য নূতন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আবিষ্ক্রিয়া দ্বারা সমগ্র জগৎ স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইতেছে; দয়া, ত্যাগ ও সহিষ্ণুতার অবতার মহাত্মা যিশুর অতি পবিত্র মধুর উপদেশাবলীর প্রতি আর তথায় কেহ বড় বেশী কর্ণপাত করে না। আমাদের দেশে বর্ত্তমান সময় ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণের কল্যাণকর উপদেশ সমূহ যেরূপে কার্য্যে সংক্রামিত না হইয়া গ্রন্থেই আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে ও বক্তৃতাদ্বারা পাণ্ডিত্য প্রকাশের সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে,

প্রয়োজনীয় দ্রব্য যোগাইতেছিল। আরোও কত দিক হইতে যে কত দ্রব্য আসিতেছিল সে অজস্র ভক্তি-উপঢৌকনের ইয়ত্তাই ছিল না!

কীর্ত্তন আজ এগার মাস অবিশ্রান্ত চলিয়াছে। দিন-রাত্রি, গ্রীষ্ম-বর্ষা-বিরাম হীন। একদল গাইতেছে, আর একদল খাইতেছে; একদল বিশ্রাম করিতেছে, আর একদল উঠিতেছে---এইরূপ অবিশ্রান্ত দিবা রজনী কীর্ত্তন চলিয়াছে। ইহারই নাম অহোরাত্র কীর্ত্তন। আজ এগার মাস এইরূপে রাত্রদিবা চলিয়াছে—সময়সময় দুটী মাত্র লোকেও কীর্ত্তনের তাল ও সুর রাখিয়া অহোরাত্র ঠিক রাখিয়াছে। আগামী সংক্রান্তিতে সাম্বৎসরিক অহোরাত্র-কীর্ত্তন শেষ হইবে।

দূর হইতে শোভা যাত্রার হস্তীর গল-ঘণ্টার ধ্বনি শোনা যাইতে লাগিল। মণিমোহন, জীবানন্দ স্বামী, পরমানন্দ স্বামী, দীনানন্দ স্বামী প্রভৃতিকে লইয়া আসিয়া আশ্রমের দ্বারে দাঁড়াইলেন। ম্যানেজার বাবু রাত্রিতে আশ্রমেই ছিলেন; তাহার নিকট ব্যাপারটা বেশ লাগিতেছিল। ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়া তিনি একটু অগ্রসর হইয়া গেলেন।

একটু দূরে যাইয়া তিনি ফিরিয়া দাঁড়াইয়া আশ্রমের দৃশ্যটা কিরূপ হইয়াছে, দেখিলেন।

সারি সারি কদলি বৃক্ষ, পত্রপুষ্পে সজ্জিত বিচিত্র গেইট, নানা বর্ণের পতাকা, দ্বারের সম্মুখে যুগ্ম কদলী বৃক্ষ মূলে আম্র পল্লব সমন্বিত সিন্দুর লিপ্ত যুগ্ম পূর্ণ-কুম্ভ উর্দ্ধে নহবৎ—এই সকল উপসর্গ জুটিয়া এক রাত্রিতেই এই সাত্ত্বিক আশ্রমটীকে পূর্ণ মাত্রায় রাজসিক ব্যাপারে পরিণত করিয়া তুলিয়াছিল। ম্যানেজার বাবু তাঁহার রাজোসিক দৃষ্টিতে তাহা পুনঃ পুনঃ নিরীক্ষণ করিয়া ধীরে ধীরে শোভা যাত্রার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন; দীর্ঘ দণ্ড ধারী দারোয়ান তাঁহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে ছিল।

শোভা যাত্রা আসিয়া আশ্রম দ্বারে পঁহুছিল। প্রথমে সুসজ্জিত হস্তীর মিছিল, তারপর ঘোটক আরোহী কতিপয় সৈনিক পুরুষ; তাহার পশ্চাতে আসা সোটা ধারী পদাতিক শ্রেণী। এই পদাতিক শ্রেণীর মধ্য স্থলে সুসজ্জিত পাল্কীতে পুর মহিলাগণ, তৎ পশ্চাতে ঘোড়ার গাড়ীতে দাসী-চাকরাণী ও সেই—শ্রেণীর স্ত্রীলোকগণ; সর্ব্বশেষে ইংরেজী বাদ্য। মহা সমারোহে শোভা যাত্রা আসিয় এক দিকে অগ্রসর হইয়া দাঁড়াইল। মণিমোহন পরম আগ্রহে পাল্কীগুলি অন্তঃপুরের দিকে লইয়া গেল এবং তাহার মা, খুড়ীমা. পিসীমা প্রভৃতিকে সাদরে গ্রহণ করিল।

সে দিন কীর্ত্তনের বিশেষ বন্দোবস্ত ছিল। পুর মহিল'রা স্নান আহার ভুলিয়া কৃষ্ণ কথার মনোহর পদাবলী-কীর্ত্তন শুনিতে লাগিলেন জীবানন্দ, প্রেমানন্দ, পরমানন্দ, সত্যানন্দ, দীনানন্দ প্রভৃতি অমৃতানন্দে ভাসিয়া কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

মণিমোহন আজ কীর্ত্তনে যোগদান করে নাই। সে আজ বাড়ীর মেয়েদের সুখ সুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ব্যস্ত ভাবে ঘুরিতেছিল।

দ্বিপ্রহরের ভোজন মহোৎস আরম্ভ হইয়াছে। এক দিকের এক বৃহৎ টীনের চালায় রান্না হইতেছিল এবং চারিদিকে বেরাও করা বিস্তৃত আঙ্গিনায় বসিয়া লোক ভোজন করিতেছিল।

লোক স্নান করিয়া আসিতেছে, আর নিজ হস্তে পাতা সংগ্রহ করিয়া বসিতেছে, সুপাকৃত অন্নরাশী. বৃহৎ বৃহৎ মৃৎ-ভাণ্ড সমূহে ডাল ও লাবড়া-পাঁচন। আয়োজন আর বিশেষ কিছুই নহে। ইহাই পরিবেশন-কারিগণ অম্লান বদনে পরিবেশন করিতেছে, আর ভোজন কারী তৃপ্তির সহিত ভোজন করিয়া যাইতেছে।

মণিমোহন তাঁহার মা, খুড়ীমা প্রভৃতিকে লইয়া গিয়া তাহা দেখাইল। ভাণ্ডার গৃহ দেখাইয়া বলিল "এই দেখ মা. প্রতিদিন দ্বিপ্রহরে ভাণ্ডার নিঃশেষ হইয়া যাইতেছে; আবার পর দিন প্রাতঃকালের মধ্যেই তাহা পূর্ণ হইবে। কোথা হইতে যে কে কি দেয়, তার কোন নিয়ত নাই। ভগবান যেন দুহাতে যোগান দেন, আবার দুহাতে নিঃশেষ করিয়া নেন। লোক প্রতিদিন দশজন বিশজন হইতে—চার পাচ শত হয়। গড়ে শত লোক রোজ অন্ন পাইতেছে। বল মা, এই জনসেবায়ই আনন্দ, না তোমার ঘরে গিয়া বসিয়া দরিদ্র প্রজার শোণিত সম অর্থ নিজের খেয়ালে অপব্যয় করিলে মনে আনন্দ হইবে? আজ যে অর্থগুলি অনাবশ্যক ভরং রক্ষার জন্য শোভা

মাউরীরা এক সময় নরমাংস খাদক ছিল। তাহাদের মধ্যে বিশ্বাস ছিল যে, যে মানুষের মাংস ভক্ষণ করা যায়, তাহার সমস্ত গুণ গুলিও খাদকের আয়ত্ব হয়। এই ভ্রম বিশ্বাসই তাহাদিগকে একটী ভয়ানক নরখাদক জাতিতে পরিণত করিয়াছিল

দলের প্রধান ব্যক্তির পক্ষে কেবল শত্রুর বামচক্ষুটী ভক্ষণ করা বিধেয় ছিল; তাহার কারণ তাহাদের বিশ্বাস বাম চক্ষেই

মাউরী জননী।

আত্মার বাস। শরীরের রক্ত, তেজ ও বীর্য্যের প্রতিক; সুতরাং তাহাছিল শ্রেষ্ঠ পাণিয়া। শত্রুর মস্তকে গৃহ সজ্জিত রাখা ছিল একটী সম্মানের পরিচায়ক। যাহার গৃহে যত শির-কঙ্কাল বেশী দেখা যাইত, সে তত সম্মানী ও বীর বলিয়া পরিচিত হইত।

বিলাতের নৃত-ত্ব পরিষদের (Anthropologica Institute) এক অধিবেশনে নরমুণ্ড সংগ্রহ করিয়া এক প্রদর্শনি খোলা হইয়াছিল। ইয়ুরোপীয় নৃতত্ত্ববিদেরা ইহা হইতে প্রচুরতত্ত্ব সংগ্রহ করিতে সমর্থন হইয়াছিলেন। ইহার ফলে উচ্চশ্রেণীর নরমুণ্ডের চাহিদা এত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল যে উল্কিওয়ালা লোক দেখিলেই সে দেশে হত্যা চলিত। দাস জাতীয় মাউরীদিগকেই অধিক সংখ্যায় হত্যা করা হইত এবং তাহাদের মৃত-মুণ্ড সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের ন্যায় উল্কিদিয়া সেইগুলিকে সম্ভ্রান্ত লোকের মুণ্ড বলিয়া মুণ্ড ক্রেতাদিগের নিকট, বিক্রয় হইত।

শুনিলে শরীর শিহরিয়া উঠে যে জীবিত লোকের মুণ্ড ও একদিন মুণ্ডক্রেতারা বায়না করিতে পারিত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ জনৈক ইংরেজ লেখকের লেখা হইতে একটী স্থান উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি।

A Chief once said to an English purchaser of heads :—"Choose which of these heads you like best"—pointing to some of his own people—"and when you come back I will have it dried & ready for your acceptance."

ঠিক আমাদের দেশের পাঁঠার মাংস ক্রয় বিক্রয়ের মত ব্যবস্থা। ইহাও জনসংখ্যা হ্রাসের একটী কারণ কিনা চিন্তার বিষয়! এই স্থানে দুটী কথা বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে (১) দলপতি (The chief) দের মুণ্ড এত পবিত্র যে তাহার নামও কাহার মুখে নেওয়া পাপ। (২) মাউরী দিগের মধ্যে সম্ভ্রান্ত পুরুষেরাই সর্ব্বাঙ্গে উল্কা কাটিয়া থাকে; মেয়েরা কেবল চিবুকেই উল্কী কাটে।

মাউরীরা তাহাদের নিজ দেশের সুতায় প্রস্তুত মোটাবস্ত্র সযত্নে জড়াইয়া ব্যবহার করে। ঐ বস্ত্র বৃক্ষ বল্কলের ও মূলের রংদ্বারা ইচ্ছামত নানা বর্ণে চিত্রিত করিয়া লয়। পাখীর পালক স্ত্রী পুরুষ সকলেই সাজ সজ্জার উপকরণরূপে ব্যবহার করিয়া থাকে। কুকুরের চামড়ার কুর্ত্তা অঙ্গরক্ষা রূপে তাহারা ব্যবহার করিয়া থাকে।

মাউরীরা এখন সভ্য হইতেছে। তাহাদের স্ত্রীলোকেরা হাট বাজার করে, সহরে বন্দরে ঘুরে বটে; কিন্তু উন্মুক্ত দেহে নহে; সম্ভ্রান্ত মেয়েরা চোখ মুখ ফ্রানেল কাপড়ে আবৃত করিয়া বেড়ায়।

সুর-সন্ধান।

(ঘুঘু-ডাক ছন্দ)

নিঝুম পল্লীর মাঝে মাঝে মাঝে,
কি সুর আট্‌পা'র বাজে বাজে বাজে!
নানান্ ঝঙ্কার দিশি দিশি শুনি!
সুরের জালটাই দুখে সুখে বুনি! (১)

ঘুঘুই হায়, হায়, থেকে থেকে কা'কে,
অমন উন্মন্ কেঁদে কেঁদে ডাকে!
"ঘুঘুর্ ঘুঘ্‌ঘুর ঘুরু ঘুরু ঘুরু"—
কাঁদন শুনছিই, হিয়া উরু উরু। (২)

সুরের মন্থন চলে সারা বুকে!
হৃদয় খা'ল্‌বা'ল্ করে বড় দুখে!
কি—এক ক্রন্দন প্রাণে প্রাণে বাজে।
জগৎ সংসার কাঁদে ভাঁজে ভাঁজে! (৩)

যেথায় যা'র যা'র ব্যথা ছিল চাপা,
জাগায় ওই সুর প্রাণে 'সা-নি ধা-পা'।
প্রিয়ার প্রাণ আজ কাঁদে কারো লাগি'
প্রিয়ের মন আজ কারো অনু-রাগী! (৪)

দুপুর ভোর সাঁজ একা কেঁদে মরে!
তেঁতুল বাঁশ-ঝাড় সুরে সুরে ভরে।
নে' যায় কোন্-এক ভুলে-যাওয়া ভবে!
জীবন যৌবন কাঁদে ঘুঘু রবে! (৫)

হাজার সুখ থাক্ সারা মনে প্রাণে,
উদাস ওই সুর কেন কেন টানে।
প্রিয়ার চুম্‌খাই, রাখি কাছে কাছে!
আবার চম্‌খাই! কি যে হবে পাছে! (৬)

নারীর বোল-চাল্ প্রাণে সুধা ঢালে!
সুরের রোশ্‌নাই দিকে দিকে জ্বালে।
স্বপন্— ঢুল-ঢুল যত আঁখি-পাখী,
নীরব ঝঙ্কার তোলে প্রাণে থাকি'। (৭)

সুরের স্পন্দন শিশু যুবা নারী,
জাগায় বিল্‌কুল্ বা'ী বাড়ী বাড়ী।
প্রাণের পর্দায় বাজে ধীরে ধীরে!
মধুর শিউরাই, ভাসি আঁখি নীরে! (৮)

ও-সুর কোন সুর? কেন বুকে বিঁধে।
যুবক হাৎড়ায় কা'কে গাঢ় নিদে।
ফাটুক্ বুক, মুখ কবে খোলে ছুঁড়ী?
ফোটায় প্রাণ্‌টায় সেও দুটো কুঁড়ি। (৯)

যে যার ভরপূর দুখে খালি কাঁদে।
কথায় বল্‌তেই লাজে কথা বাধে।
দুখের উচ্ছাস ধনী মানী বোঝে।
দুখের মূলটুক্ আঁতি পাঁতি খোঁজে। (১০)

মিছাই উট্‌কাই। ইতি উতি মধু।
মধুর মৌচাক সে যে নব বধূ।
সে' মৌ দাও বৌ। সুধু খুঁজি সুধা!
প্রেমের হায়, হায়, কোথা মেটে ক্ষুধা। (১১)

প্রেমের তৃষ্ণায় সুরে সুরে ভাসি!
সবার মুখ চাই, দেখি, শুনি হাসি।
ভবের আখড়ায় তালে মানে খুঁজি।
সে' সুর পাই-পাই! পুনঃ গেল বুঝি। (১২)

এরূপ দিনরাত খুঁজে খুঁজে মরি।
ধরার খুব সাধ, ধরি ধরি করি।
কোথায়। পাই কই! সে যে বড় দূরে।
সুরের যশ্‌গাই ভাঙা ভাঙা সুরে! (১৩)

সুরের হিল্লোল বুঝি মাঝে মাঝে,
ব্যাকুল প্রাণটায় বাজে, বাজে, বাজে।
ঘুঘুই তাই আজ থেকে থেকে ডাকে,
"ঘুঘুর্ ঘুঘ্‌ঘুর্" একা একা ডাকে। (১৪)

আমার প্রাণ্ মন ঘুঘু সাথে সাথে,
সে সুর ঢুঢ়ছেই সারা দিনে রাতে।
সে'সুর-সন্ধান চলে অহ-রহঃ।
যাতাও একবার! পাখী! কহ, কহ। (১৫)*

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

*কিছুদিন হইল পৌষ মাসের কলিকাতার কোনও এক বিখ্যাত প্রাচীন মাসিক পত্রিকায় এই কবিতাটির ভাবানুসরণে কবিতা লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। অথচ এই কবিতাটি ফেরত দেওয়া হইয়াছে।

সম্পদ। রামায়ণী যুগে ভারতে প্রচুর ইক্ষুর চাষ হইত এবং তাহার রস হইতে সর্করা প্রস্তুত হইত। হেমিল্টন সাহেব বলেন সর্করা ভারতবর্ষ হইতে প্রথম আরবে যায়; আরব হইতে মিশর দেশে যায়; মিশর হইতে যাইয়া গ্রীসে পরিচিত হয়।

গ্রীস দেশে যখন প্রথম চিনির ব্যবহার আরম্ভ হয়, তখন তাহা গ্রীক চিকিৎসকগণের নিকট ভারতীয় লবন (Indian salt) নামে পরিচিত হইয়াছিল; ক্রমে তাহা সক্কর (Sakkhar) নাম গ্রহণ করে। (৩)

ভারতীয় বাণিজ্য বিস্তারের এই গৌরব ময় যুগের অবসানে অথবা সমসাময়িক যুগে রামায়ণ রচিত হইয়া থাকিলে আমরা মহর্ষি বাল্মীকির ন্যায় মহা কবির কল্পনার মুখে ভারতীয় সামুদ্র-বাণিজ্যের যে একটা অত্যুজ্জল বর্ণনা প্রাপ্ত হইতে পারিতাম, তাহা অনুমান করা অসমীচীন নহে। সেকালের ভৌগোলিক জ্ঞানের যে পরিচয় তিনি সীতা অন্বেষণে প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহার সেই সুদুর্লভ অভিজ্ঞতার সহিত বর্ত্তমান বিষয়ের সঙ্গতি রাখিয়া বিচার করিতে গিয়া আমাদের মনে হইতেছে—টায়ারের ফিনিসিয় সভ্যতা বিস্তারের পূর্ব্বে রামায়ণ রচিত হইয়াছিল। এবং রামায়ণী যুগে ভারতীয় বাণিজ্য সাগর পথে বৈদেশিক সম্বন্ধ স্থাপনের মত উন্নত ছিল না। সে বাণিজ্য কেবল দেশের অভ্যন্তরে চলিয়াছিল এবং স্থল পথে, পূর্ব্ব দিকে—কোশাকার দেশ (মহাচীন) ও পশ্চিমে বনায়ু (পারস্য) পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল।

সে কালে স্বর্ণমুদ্রায় ক্রয় বিক্রয় পরিচালিত হইত। ঐ স্বর্ণ মুদ্রার নাম ছিল নিষ্ক। নিষ্কের ওজন কি পরিমাণের ছিল অথবা তাহাতে কোনরূপ চিহ্ন বা লেখা ছিল কি না, রামায়ণে কোথাও তাহার কোন উল্লেখ নাই।

রামায়ণী যুগে লেখনি সম্ভবা লিপির আবিষ্কার হইয়াছিল না। রামায়ণী যুগের শিক্ষার বিষয়—প্রসঙ্গে * এসম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডের ৪৪ সর্গে রামের নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়কের উল্লেখ আছে। এই "নাম অঙ্কিত চিহ্ন" রামের নামের সহিত পরিচয় সূচক একটা চিহ্ন বা চিত্রলিপি ব্যতীত আর কিছু বলিয়া আমাদের মনে হয় না! সম্ভবতঃ নিষ্ক মুদ্রাতেও এইরূপ একটা বিশেষ চিহ্নকাটা থাকিত।

খ্রীষ্ট পূর্ব্ব ৭ম শতাব্দীতে ভারতীয় বণিকেরা যে সকল মুদ্রা ব্যবহার করিতেন তাহার কয়েকটীর নমুনা আমরা নানা স্থানের যাদুঘরে দেখিয়াছি; সেই সকল মুদ্রায় কোন অক্ষর সূচক চিহ্ন নাই, শুধু একটা গোল চিহ্ন আছে। James Kennedy এই সকল মুদ্রাকে "Punch marked coin" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। (১) রামায়ণী যুগে বোধ হয় এইরূপ কোন চিহ্ন রাম নামের সূচক বলিয়া প্রচলিত ছিল এবং তাহাই অঙ্গুরীয়কে ও মুদ্রায় ব্যবহৃত হইত।

তখন মুদ্রার বিনিময় ব্যতীত দ্রব্যের বিনিময়েও দ্রব্য পাওয়া যাইত। গরুদান স্বরূপে ব্যবহৃত হইত। প্রাচীনকালে ইয়ুরোপে গৃহপালিত পশুগুলি (cattle) যেমন মুদ্রা বিনিময়ের কার্য্য সাধন করিত, ভারতে গরু-বাছুর, ... মহিষ সেরূপ কার্য্য সাধনে ব্যবহৃত হইত কি না তাহার কোন প্রমাণ রামায়ণে নাই। তখন আর্য্য ভারতে গরু বিক্রয় হইত না; এই চিন্তাও তখন কাহারও মনে [illegible] না; কারণ ধনী দরিদ্র সকলেরই তখন গোধন প্রচুর পরিমাণে ছিল।

তখন পরিমাপের জন্য 'অরত্নি'র হিসাব গৃহীত হইত। (২)

মিথ্যা ও সত্য।

মিথ্যা বলে—সত্য, তব শুধু একরূপ—
অনন্ত আমার ভাষা, অপূর্ব্ব স্বরূপ।
আমার প্রভাবে দেখ অসম্ভব ঘটে,
তুমি সত্য অপদার্থ সবে নাহি ভেটে।
সত্য বলে,—মিথ্যা তুমি বহুরূপী বট,
মম দরশনে থাক ভীত অপ্রকট!
নির্ভীক হৃদয় আমি ঘুরি এ সংসার,
সাধু সুধী হে'রে মোরে করে নমস্কার।

শ্রীমহেশচন্দ্র কবিভূষণ তত্ত্বরত্ন বিদ্যানিধি।

(৩) ভারতের সর্করা আরবে 'সক্কর' গ্রীসে 'সক্কর' (Sakkhar) ও লাটিনে সক্কারম (Saccharum) নামে পরিচিত।

* আর্য্যাবর্ত্ত ১৩১৮।

(১) I. R. A. S. 1897, Page 287.

(২) বালকাণ্ড ১৪ সর্গ ২৫ শ্লোক।

স্ত্রী মুক্তার সঙ্গে পরিচয় হইলে পর আমি টের পাইলাম, ঘরের স্ত্রীকে ফেলিয়া রাখিয়া বিনোদের পক্ষে আমাকে লইয়া সমাজের বাহিরে চলিয়া যাওয়াটা একটা প্রকাণ্ড মোহের ছলনা মাত্র। কিন্তু আমি যে তখন ঘর ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছি, তাকে হৃদয়ের স্বামী বলিয়া হৃদয় কুঞ্জেতে বরণ করিয়া লইয়াছি। যে ফুলের মালা সাধ করিয়া গলায় পড়িয়াছিলাম তার ভিতর হইতে ঘুমন্ত সর্প আমার হৃদয় দংশন করিল,—সমস্ত হৃদয়টা বিষাক্ত হইয়া নীল হইয়া গেল, বাঁচিবার আর কোন পথ রহিল না। হৃদয়ের জ্বালায় অস্থির হইয়া বিনোদকে রাগ করিয়া বলিলাম,—

"ভালবাসাকে বিশ্বাস করার অপরাধে আজ সমস্ত হৃদয় ছলনায় ভরে নিয়ে আমাকে রাস্তার দাঁড়াতে হলো! কিন্তু ঈশ্বর নিকট সেজন্য তুমি চিরদিন দায়ী থাকবে।"

বিনোদ আমার কথা শুনিয়া অত্যন্ত কাতর হইয়া বলিল "হেমন্ত তুমি আমার ভালবাসার বিশ্বাস হারিয়ো না। তুমিই আমার মুক্তা, তুমিই আমার স্ত্রী! আমার আর সব স্মৃতি আমার মন থেকে মুছে গেছে।"

এই পর্যন্ত বলিয়া স্ত্রীলোকটী একবার সকৌতুকে বিনোদের পানে তাকাইয়া বলিল —"হাকিমের কাছে আমি তোমার স্ত্রী মুক্তা বলে যে পরিচয় দিয়েছিলাম সেকি সব মিছে কথা?"

বিনোদলাল মাথা নীচু করিয়া চুপ করিয়া থাকিল? দুঃখে ও লজ্জায় তখন তার সারা মুখ রক্তজবার মত রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে!

সে স্ত্রীলোক তার অসমাপ্ত কাহিনী পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিল।

"বিনোদ তো আমাকে মুক্তার আসনে বসাইয়া মুক্তার সঙ্গে তার নিজের নাম খোদাই করা আংটী আমার হাতে হাতে পরাইয়া দিল। আংটী পরিতে আপত্তি করিলাম না। কারণ স্বামীর জন্য আমিও যে একদিন হৃদয় দান করিতে পারিয়াছিলাম—এই আংটীই আজ তার একমাত্র নির্বাক সাক্ষী! আমার অন্ধকার জীবনে তো এই টুকু স্মৃতি লইয়াই বাঁচিয়া আছি, কিন্তু সহধর্ম্মিনীর পুণ্যময় আসন তো কেবল আবেগপূর্ণ প্রণয় দিয়া নির্ম্মিত নয়। মুক্তার আসনে বসিবার মত মনের বল যে আমি জন্মের মত হারাইয়াছি। তাই আর কোনো উপায় নাই দেখিয়া আমি আমার স্বামীর হাত মুক্তার হাতে সঁপিয়া দিয়া দুই চক্ষের জলে অন্ধ হইয়া বলিলাম,—

"মুক্তা আজ আমার স্বামী তোমায় দিলাম। আমি অনেক খোয়াইয়া আসিয়াছি, স্বামীও খোয়াইতে পারিব। কিন্তু ধর্ম্ম তোমায় যা দিয়াছেন আমি নিজের সুখের জন্য তা থেকে তোমাকে বঞ্চিত করিব না।"

"স্বামী দান করিয়া দেখিলাম আমার হৃদয় একটা তলহীন গহ্বর মাত্র বাস্তবিক আমার নারী হৃদয়ের আর কিছুই আমাতে অবশিষ্ট ছিল না। আমি শূন্য হৃদয়ে বিনোদের ঘর হইতে বরাবর সদর রাস্তায় আসিয়া দাড়াইলাম সেই হইতে আমি নির্লজ্জা বেশ্যা! "হাঁ নির্লজ্জা বেশ্যাই বটি আমি। সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া আর কিসের আশায় বাঁচিয়া থাকিব! তাই পাপের জলন্ত আগুনে শীঘ্র পুড়িয়া মরিবার জন্যই এ তুফানের ব্যবস্থা। হৃদয়ের বন্ধন ছিন্ন করিয়া মুক্তাকে আমার সকলই দিয়া আসিলাম। কিন্তু তবু বিনোদের বাড়ীর নিকটে আমি বেশ্যার বাসা বাঁধিলাম কেন? কারণ আমি সে সর্ব্বস্ব ত্যাগের মহাযজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিয়া হোম সমাপ্ত করিয়া উঠিতে পারি নাই; কারণ বিনোদকে সময় সময় চোখে দেখার লোভ সম্বরণ করা আমার নিকট দুঃসাধ্য বোধ হইল। কিন্তু থাক সেকথা। আর আমি কখনো মুক্তার স্বামী সুখের কণ্টক হই নাই। একবার মনে অজ্ঞাত হইয়াছিলাম বলিয়াই তার প্রায়শ্চিত্ত,একটা সুদীর্ঘ নারী জীবনের দুঃসহ নিষ্ফলতা।

"তারপর বিনোদ অনেক দিন এ হৃদয় হীনা বেশ্যার ঘরে আসিয়াছে। অনেক কান্নাকাটি, পায় পড়িয়া অনেক স্তবস্তুতি করিয়াছে। কিন্তু আর কখনো তাকে বিশ্বাস করি নাই। শুধু তাকে বলিয়া কেন, কাহাকেও না। এ জীবনে অনেককে ছলনায় ভুলাইয়াছি কিন্তু একবার ছাড়া আর কখনো পরের ছলনায় ভুলি নাই।

"হুজুর বেশ্যার কলঙ্কের ইতিহাস বৃথা দীর্ঘ করিয়া লাভ কি? সমাজ বা ধর্ম্ম কেউ তাকে সহ্য করিতে পারে না। কথাটা সংক্ষেপেই শেষ করিয়া দেই. হুজুরের মূল্যবান সময় নষ্ট হইতেছে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
কলিকাতা।

লুসেন কনফারেন্সে তুর্ক প্রতিনিধিবর্গ

(উপবিষ্ট বাম হইতে দক্ষিণে) রেসিৎ সাবফৎ বে, জুলিক বে রেজাবুর বে, জেনারেল ইসমেত পাশা, জেকে বে, ভেলি বে, মোকতার বে, মুনির বে। (তুর্কের প্রধান প্রতিনিধি ইসমেত পাশা বাম হইতে দক্ষিণদিকের চতুর্থ জন।)

লুসেন বৈঠকের খবর রয়টারের মারফৎ নিত্য নূতন রকম আসিতেছে। ইহা হইতে আমাদের কিছুই বুঝিবার উপায় নাই। কখনও তুর্কেরা বৈদেশিকদের সব দাবী মানিয়া লইতেছেন কখনও বা বাঁকিয়া চলিতেছেন! শেষ সঠিক খবর না পাওয়া পর্য্যন্ত প্রাচ্য সমস্যার কিরূপ সমাধান হইবে তাহা জানিবার উপায় আমাদের নাই এই সংখ্যার মুখ পত্রে আমরা তুরস্কের বর্ত্তমান মহামান্য খলিফা ও খলিফ জাদীর চিত্র প্রদান করিলাম।

প্রিণ্টার—শ্যামলাল গুহ দ্বারা মুদ্রিত। ভিক্টোরিয়া প্রেস, ঢাকা।

সৌরভ

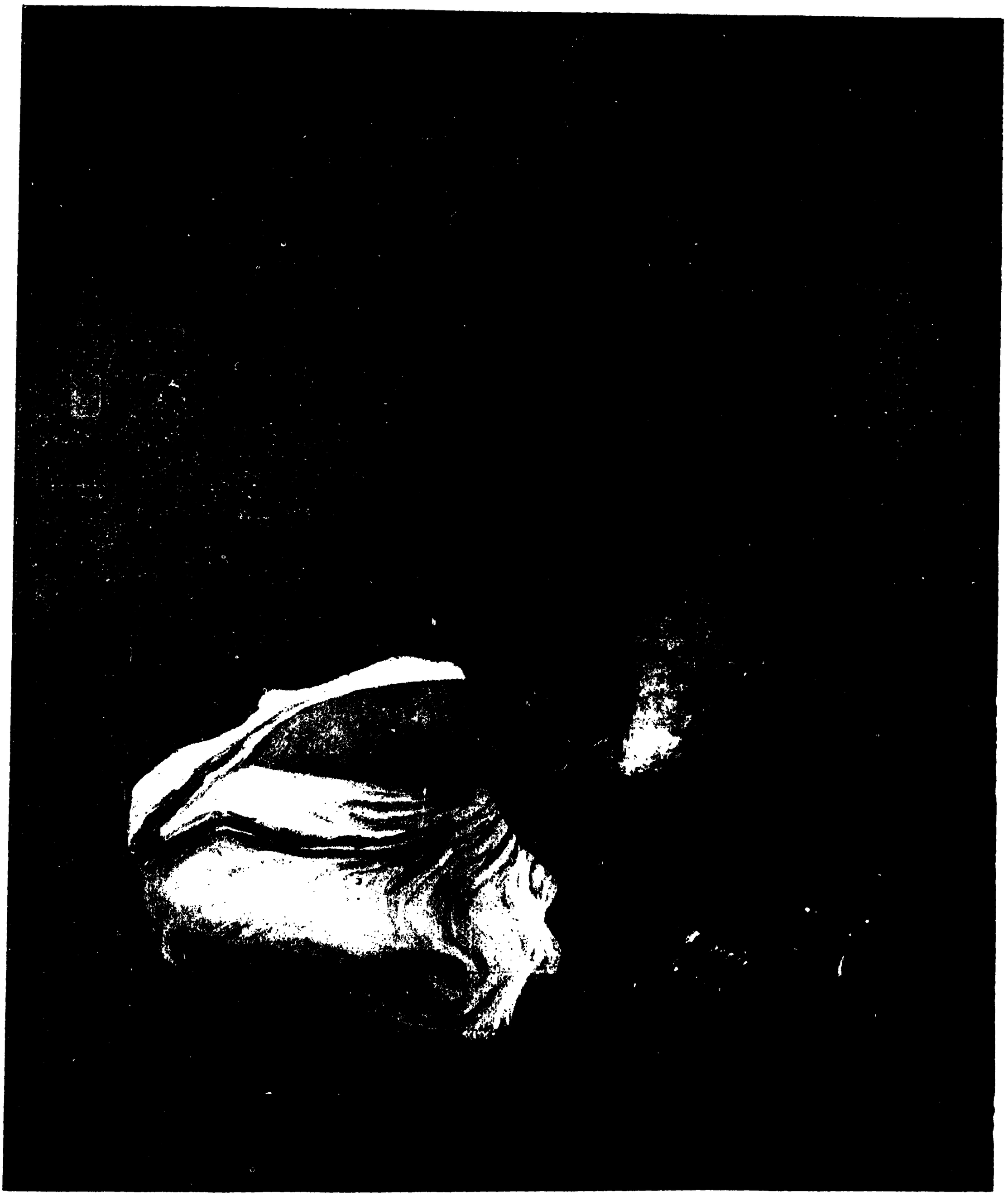

সন্ধ্যা প্রদীপ

আশুতোষ প্রেস, ঢাকা।

উপর অত্যাচার করিয়া দুর্ব্বলের স্বাধীনতাটুকুকে সমূলে বিলুপ্ত করিয়া ফেলে। তাই সমাজে স্বাধীনতার প্রকৃত বিকাশ দেখিতে হইলে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অনেকটা নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক। এই নিয়ন্ত্রণ অথবা শাসননীতির উপরই সমাজিক জীবনের প্রকৃত বিকাশ নির্ভর করে।

উপর্য্যুক্ত বিষয় আলোচনা করিলেই আমরা বুঝিতে পারি যে শাসননীতির প্রকৃত উদ্দেশ্যই স্বাধীনতাকে সার্ব্বজনীন ভাবে উপলব্ধি করা। সার্ব্বজনীন স্বাধীনতার ভিত্তিস্বরূপ শাসন নীতি ব্যক্তিগত স্বাধীনতার নিয়ন্ত্রণ কালে প্রত্যেক ব্যক্তিবিশেষের জন্য কতকগুলি কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করে। এই কর্ত্তব্য পালনদ্বারাই মানুষ পরস্পরের স্বার্থের একটা সামঞ্জস্য সাধন করে। শাসননীতি কর্ত্তব্যের পাশাপাশি ক্ষমতাকে (Right) দাঁড় করায়। যাহা একজনের কর্ত্তব্য, তাহা আর একজনের ক্ষমতা। একজনের ক্ষমতাকে বাঁচাইতে হইলে আর একজনকে তাঁহার কর্ত্তব্য পালনে বাধ্য করা আবশ্যক। আমার সম্পত্তি ভোগ করা আমার ক্ষমতা, অন্যের কর্ত্তব্য আমাকে আমার ভোগে কোনও প্রকার উপদ্রব না করা। যদি কেহও অন্যায়ভাবে আমাকে উপদ্রব করে তাহা হইলে শাসন যন্ত্র তাহাকে দমন করিবে। এই প্রকারে শাসননীতি কর্ত্তব্যদ্বারা মানুষকে সম্বোধিত করিয়া পরস্পরের বিভিন্ন মতের মধ্যে এক সামঞ্জস্য সাধন করিয়া দেয়। এই সামঞ্জস্য (Harmony) সমাজ জীবনকে পূর্ণতার দিকে লইয়া যাইতে পারে। তাই, ইহাতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে ব্যক্তির স্বাধীনতাকে কিছু খাট করিয়া তাহাকে অধিকতর স্বাধীনতা দেওয়া হয়; কারণ সামাজিক ভাবে স্বাধীনতার ভোগই ব্যক্তিকে পূর্ণ স্বাধীনতার অর্থাৎ পূর্ণতার দিকে টানিয়া নিতে পারে।

এখন একটা প্রশ্ন স্বতঃই আমাদের মনে উদিত হয় যে, স্বাধীনতার সুষ্ঠু বিকাশ করিতে হইলে, ক্ষমতা অথবা Rightএর উপরই বেশী জোর দেওয়া আবশ্যক, না, কর্ত্তব্য অথবা Duty'র উপরই বেশী জোর দেওয়া আবশ্যক। বাস্তবিক বর্ত্তমান জগতে Right অথবা ক্ষমতার উপরই বেশী জোর দেওয়া হয়, অর্থাৎ আমাদের নাগরিক (Citizen) জীবনযাত্রার প্রত্যেক বিষয়ই আমরা ক্ষমতার দিক্ হইতে দেখি। তাহাতে অনেক সময় কর্ত্তব্যের দিকটা আমরা ভুলিয়া যাই। বাস্তবিক, কর্ত্তব্য জ্ঞানের উদ্বোধনই সামাজিকতার প্রসারক; কারণ স্ব স্ব কর্ত্তব্য পালন দ্বারাই আমরা অন্যের ক্ষমতাকে সুনিশ্চিত ভাবে নিরাপদ করি। আর, ক্ষমতার দিকে জোর দিয়া নিজের ক্ষমতা রক্ষার জন্য আমাদের যে বদ্ধ পরিকরতা তাহা অনেক সময় পরের ক্ষমতা রক্ষার পক্ষে বিপজ্জনক হইয়া দাঁড়ায়। তাই, Rightএর নামে বর্ত্তমান Democracyর যুগে অনেক রক্তারক্তি প্রত্যক্ষ করা যায়। কিন্তু কর্ত্তব্য পালনরত প্রাচ্য সামাজিক জীবনে সামাজিক শৃঙ্খলা অনেকটা নিরাপদ বলিয়াই মনে হয়। তাই কর্ত্তব্যের দিকে জোর দেওয়াই বোধ হয় সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার বিশেষ অনুকূল!

শাসন নীতি আমাদের কর্ত্তব্যের পথ নির্দ্দেশ করিয়া আমাদের স্বাধীনতা ও সামাজিক শৃঙ্খলা অনেকটা দৃঢ়তর করিয়া তুলে। শাসন নীতি আমাদের স্বাধীনতাকে সুনিশ্চিত করিয়া দেয় বলিয়াই আমরা অন্যান্য ভাবে আমাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের উন্নতির দিকে প্রচেষ্ট হইতে পারি। সুশৃঙ্খলিত সমাজে পরস্পরের স্বেচ্ছা প্রণোদিত সহযোগিতা আমাদের মানব জীবন বিকাশের উপযোগী নৈতিক শক্তিগুলির ক্রমশঃ স্ফুরণ করিয়া আমাদিগকে ব্যক্তিগত জাতীয় ও সার্ব্বভৌম পূর্ণতার দিকে লইয়া যাইতে পারিবে।

একটা কথা আমাদের এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে যে পূর্ণভাবে আমাদের স্বাধীনতা লাভের ও সেই সঙ্গে জীবনে পূর্ণতালাভের অনুকূল হইতে হইলে শাসন নীতির মূলটুকুও আমাদের স্বেচ্ছা প্রণোদিত স্বাধীন মতের উপরই থাকা চাই। কারণ, সার্ব্বজনীন পূর্ণতার ভিত্তি স্বাবলম্বনও নৈতিক শক্তির উদ্বোধন; তাহা কখনই কোনও বাহিঃশক্তির প্রবর্ত্তিত শাসন নীতি দ্বারা সম্ভব হয় না।

স্বাধীন জনমত হইতে উদ্ভূত শাসন প্রণালী সাধারণতঃ দুই প্রকারে হইতে পারে। ইহার এক প্রকার অজ্ঞাতভাবে নানাবিধ ব্যবহারের (custom) উৎপত্তিতে।

শিক্ষা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আজ কাল প্রায় সকলেই ব্যারিষ্টারী ও সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা পাস করিবার নিমিত্ত বিলাতে গিয়া থাকেন; অতি অল্প সংখ্যক লোক শিল্প বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা লাভের জন্য বিদেশে যান। বিদেশ হইতে যাঁহারা শিক্ষা লাভ করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের অধিকাংশই আহার বিহার প্রভৃতি বিষয়ে অত্যন্ত সংযমহীন ও বিলাসী। তাঁহাদের এই অসদ্দৃষ্টান্তের প্রভাব সামান্য নহে।

ভারতবর্ষের ন্যায় উষ্ণ প্রধান ও দরিদ্র দেশের উপর এইরূপ সংযমহীনতা ও বিলাসিতা বিষবৎ কার্য্য করিতেছে। বিদেশ গমনের ফলে ব্যক্তিগত স্বার্থ কতক পরিমাণে সিদ্ধ হইলেও এদেশের জাতীয় স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণ রূপে নষ্ট হইয়া যাইতেছে। সুতরাং জাতীয় জীবনে দুর্দ্দিন ও দুরবস্থা বিশেষ ভাবে ঘনাইয়া আসিতেছে।

আহার, বিহার, বেশভূষা প্রভৃতি দ্বারাই জাতির স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হয়। জাতীয় ভাব বজায় রাখিয়া শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ শিক্ষা লাভ করিতে কোন রূপ আপত্তির কারণ আছে, আমাদের মনে হয় না। তাহা না করিয়া কেবল অন্ধ অনুকরণের বশবর্ত্তী হইয়া জাতীয় স্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন দেওয়া কদাপি সঙ্গত নহে।

আমাদের জাতীয় ভাবের এইরূপ অনাবশ্যক পরিবর্ত্তনের পথ যাহাতে রুদ্ধ হয়, তাহার দিকে সকলেরই দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন। আমাদের মনে হয়—আহার বিহার ও অন্যান্য কতক কতক বিষয়ে আমরা দিন দিন অত্যন্ত অসংযমী হইয়া পড়িতেছি বলিয়াই নানাবিষয়ে আমরা দ্রুত গতিতে হীনাবস্থা প্রাপ্ত হইতেছি; এ অবস্থার প্রতিরোধ যে কোন উপায়েই হউক করিতেই হইবে, নতুবা ভারতবাসীর, বিশেষতঃ হিন্দু জাতির অস্তিত্ব জগৎ হইতে শীঘ্রই লুপ্ত হইবে। যাহাতে আমাদের সর্ব্ববিষয়ে সংযমাভ্যাস হয়, ভবিষ্যতে শিক্ষা প্রণালীর বিধান সেইরূপে করিতে হইবে।

আমাদের দেশেও যাঁহারা শিক্ষালাভ করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যেও একটী বিষম অনর্থকর দোষের ভাব দেখা যাইতেছে। সামান্য শিক্ষালাভ করিলেই তাঁহারা আপনাদের যে সমস্ত ব্যবসায় কায়িক পরিশ্রমের আবশ্যকতা আছে তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক, সার্ট, কোট, কলার, নেকটাই, বুট প্রভৃতি পরিবৃত হইয়া বিলাস সাগরে নিমগ্ন হইতেছেন এবং কৃষিকার্য্য, কর্ম্মকারের ও সূত্রধরের কার্য্য, বস্ত্র বয়ন ভৃতি কার্য্যকরাকে অপমান জনক মনে করেন; ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। শিক্ষালাভ করিয়া যাহাতে ঐ সমস্ত বিষয়ে অধিকতর উন্নতি লাভ করিতে পারেন বরং তদ্বিষয়েই মনোযোগী হওয়া উচিত!

গত বৎসর নাগপুরে ভারতীয় ছাত্রবৃন্দের যে অধিবেশন হইয়া গিয়াছে, ঐ সভার সভাপতি স্বরূপে লালা লাজপতরায় আমাদের বর্ত্তমান কালীন শিক্ষা বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহা খুব সময়োপযোগী ও সমীচীন বলিয়াই আমাদের নিকট বোধ হয়; এ স্থলে তাঁহার মত উল্লেখ করা সম্ভবতঃ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। তিনি বলিয়াছেন "There was a time when as the result of English education the literate classes despised every thing Indian. Fortunately that period was over but they still stood in the danger of going to the other extreme and consider every thing Indian as absolutely perfect. I must say that so far as I am concerned I believe that truth is truth, knowledge is knowledge, science is science. They are neither eastern nor western, nor Indian nor European. We have to maintain our educational continuity and we must keep that object in view. We do not want to be a European, or American nation, we want to remain an Indian nation quite up to date. The underlying policy of the scheme of education should not be based on the past civilisation remodelled in the light of the present day developments. What was good in each culture should be embraced. True

যশোধর্ম্ম শিব ভক্ত ছিলেন : পার্ব্বতীর পঞ্চ অঙ্গুলি চিহ্নিত বৃষধ্বজ তাঁহার শত্রুর তেজ হরণ করিত।

কালিদাস এবং নবরত্ন সভা

আমাদের দেশে বদ্ধমূল বিশ্বাস এই যে উজ্জয়িণীর অধীশ্বর বিক্রমাদিত্যের একটি পণ্ডিত সভা ছিল। রত্নতুল্য নয়জন মনীষী ঐ সভায় অধিষ্ঠিত ছিলেন বলিয়া উহা নবরত্ন সভা নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ঐ নয় জন পণ্ডিতের নাম যুক্ত একটী শ্লোকও জ্যোতির্বিদাভরণ নামক গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। যথা, ধন্বন্তরী, অমরসিংহ, শঙ্খ বেতালভট্ট, ঘটকর্পর, কালিদাস, বরাহ, মিহির, বররুচি। (১) এই শ্লোক পাঠ করিলে ইহাঁদিগকে সমসাময়িক বলিয়া স্থির করিতে হয়। সম্ভবতঃ ধন্বন্তরি (২ বরাহ মিহির খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কিন্তু এই নয়জন মনীষীর সকলেই সমসাময়িক ছিলেন এরূপ নির্দ্ধারণ করা যায় না

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

কবির লড়াই।

কবিগানের ব্যবসায়টা সুদূর অতীতেও উচ্চবংশীয় লোকদিগের মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে নাই। কারণ উহাতে অকথ্য গালাগালি আছে। মান, মাথুর ও বসন্ত বিষয়ক গানগুলি যদিওবা ভদ্রলোকের পাতে দেওয়া যায় কিন্তু অধিকাংশ টপ্পা পাচালীই অশ্লীলতা দোষদুষ্ট—তাহা আসরে বসিয়া শ্রবণ করাই যথেষ্ট, সাহিত্যে সঙ্কিত হইতে পারে না। টপ্পা বা কবির শহরে যেটুকু ঢাকা থাকে, পাচালীতে তাহাও থাকে না, একেবারেই খোলাখুলি বন্দোবস্ত। সে অশ্লীলতা কিরূপ দেখুন, দাড়ার যুধিষ্ঠির বিপক্ষের সরকারকে বলিতেছে :—

স্বর্গে মর্ত্ত্যে লাইন খুলেছে
টিকিট মাষ্টার পাণ্ডুরাজ,
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির,
এইত তোমার সতী মায়ের কাজ!

এখানে তবু কাব্যের আবরণে পুঁতিগন্ধটুকু ঢাকা আছে, ছড়া কাটিবার সময় "তোর মা, তোর বাপ" বলিয়া যে সব কদর্য্য কথার অবতারণা করা হইয়া থাকে, তাহা শুনিয়া কাণে আঙ্গুল না দিয়া থাকা যায় না। এই জন্যই উচ্চস্তরের লোক কবির ব্যবসায়ে বড় লিপ্ত হইতে চান না।

১২৪১ সালেও সুবিখ্যাত পাচালীকার ৺দাশরথি রায় কবির দল চালাইতেছিলেন। একদিন প্রতিপক্ষের সরকারের নিকট তিরস্কৃত হওয়ার সংবাদে তাঁহার পিতা তাঁহাকে যে মর্ম্মবাণী শুনাইয়া ছিলেন তাহাতেই তিনি কবির দল ছাড়িতে বাধ্য হয়েন। তাঁহার পিতা মর্ম্মান্তিক আক্ষেপের সহিত বলিয়াছিলেন, "বৎস দাশরথি, আমি তোমার ধনবান পিতা নহি সত্য, কিন্তু বুদ্ধিমান পুত্রের নিকট দরিদ্র পিতার হিতকথা গ্রাহ্য হয় নাকি? তুমি যে বংশে জন্মিয়াছ, উহা অতি বিশুদ্ধ বংশ, এ বংশে কেহ কখনও অসৎকর্ম্ম বা অসৎ ব্যবসায় করে না" ইত্যাদি। যখন সাতাশি বৎসর পূর্ব্বেই কবি 'অসৎ ব্যবসায়ে' পরিগণিত হইয়াছে তখন এখন আর উহাকে কৌলিন্য দান করা যাইতে পারে না। তবে অশ্লীল অংশ বাদ দিলে কাব্য পিপাসী মাত্রেরই নিকট কবি উপভোগের সামগ্রী। আমাদের বিশ্বাস 'সৌরভ' সম্পাদক মহাশয়ও কবির পক্ষপাতী, তাই বরাবর তাঁহার 'সৌরভে' মৃত কবিদিগের টপ্পা, সখিসংবাদ প্রভৃতি প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। তৎপক্ষে সুলেখক চন্দ্রকুমার দে ও বিজয়নারায়ণ আচার্য্যের সাহায্যই বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। তাঁহাদের ন্যায় সরস ব্যাখ্যা সম্বলিত কবিগানের যোগান দেওয়া আমার সাধ্যায়ত্ত নহে। সে ভার তাঁহাদিগকেই দিয়া আমি এক নূতন পথের পথিক হইতেছি। বলিতে কি ময়মনসিংহের বিখ্যাত নিরক্ষর কবি রামু-রামগতি আমাদের কৈশোর জীবনকে কবির কবিত্ব দোলায় এমনই আন্দোলিত করিয়া গিয়াছে যে এই প্রৌঢ় বয়সেও সে ধাক্কা সামলাইতে পারিতেছি না তাই আমাদের সমসাময়িক জীবিত কবি শ্রীযুক্ত বিজয়নারায়ণ আচার্য্যের সুন্দর একটী

পাঠকদিগকে উপহার প্রদান করিলাম। যাহারা এ রসের রসিক, তাহাদিগকেও সাদরাহ্বান জানাইতেছি। সাহিত্যের আসরে সাধু ভাষায় "কবির "লড়া

(১) সাহিত্য-সংহিতা প্রথম বর্ষ।
(২) পঞ্জিকা দ্রষ্টব্য।

আশ্বাসে বাঁধলো বুক আসবে বলে প্রেমাস্পদ।
মনে মনে ভাব কান্তে তা হ'’ল আর এ বসন্তে
ঘট্‌বেনা বিপদ।।
মরতে হয় মরিব সবে ঘুচিবে আপদ।
চাইনা কিছু ভালবা'র প্রেম জন রাই এমনি দশার—
স্বসার মন্ত্র ঐ,
বন্ধু কই, বন্ধু কই, হা হুতাস সততই;
থাকলেও বন্ধু খুব গোচরে নাই বলে মন সঙ্গে করে
অহেতুকী প্রেমে পড়ে ঘটে পরে, এই জ্বালাতনই
(ঝুমুর) ও সই, মাধবে মাধব আসিবে
দিবে মাধবীর বনে দেখা।
এ হৃদয়, তাইত কয় হবে, না এ’লে পরাণে ঠেকা।
মদন জ্বালাতে করি আমরাও রাই, প্রাণে মরি
তুমি না মরিছ একা
সদা মন, উচাটন এযে আছিল করমে লেখা।
(পর চিতান) রমনীর শিরোমণি, কমলিনী
শুনলো তোরে কই,
যখন ফুল ফুটনের হয়লো সময় ফুলে ধরা ফুলময়
কোন্‌দিন না হয় সই? ফুটে বকুল, ফুটে বেলী,
মল্লিকা তগর চামেলী, ফুটে সে রঙ্গন,
অতুলন, সে কাঞ্চন, ফুটে চাঁপা চন্দন।*
পদ্মকুমুদ কৃষ্ণচুড়া রাধা পদ্ম মনোহরা
করবী কনক ধুতুরা রসে ভরা পুষ্প অগনণ
(২ নং ফুকার)
চিন্তা মোহ জাগরণ কর ইহার যা করণ?
মরণ ভাল নয়;
মরলে ভয় অতিশয় বন্ধু কার কাছে রয়?
মৈলেপরে কেব' তারে রত্ন জ্ঞানে যত্ন করে,
ক্ষীর সর দিয়ে করে কে বন্ধুরে কোলে তু ল লয়?
বসন্ত খুলেছে তার শোভার ভাণ্ডার,
এ সময়ে বন্ধু কি আর ব্রজে না বাড়াবে পদ?
মনে মনে ভাব কান্তে, তা হলে আর এ বসন্তে
ঘট্‌বেনা বিপদ

শ্রীমহেশচন্দ্র কবিভূষণ

* চন্দন গাছেও ফুল ফুটে, কবিবর ৺গোবিন্দদাসের "চন্দন দ্রষ্টব্য

স্নেহের দান।

(৬)

পিতৃবিয়োগে মণিমোহন গুরুতর দায়িত্বের বোঝা মাথায় লইয়া বসিল।

শ্রাদ্ধের পর মাখন চলিয়া যাইতে চাহিয়াছিল, মণির অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া যাইতে পারে নাই। পরীক্ষার ফল বাহির হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সে মণির সহিত সহরে থাকিয়া গেল।

মণির মা মণির বিবাহের কথা মণি ও মাখন উভয়ের নিকট তুলিয়াছিলেন। মণি মার অনুরোধের উত্তরে পরিস্কার জবাব দিয়াছিল—"আমি বিবাহ করিব না।" মাখন বলিয়াছিল—"কাল অশৌচে বরং নাই হইল; পরে দেখা যাইবে। বিবাহ না করিয়া যাবে কোথায়? আপনারা পাত্রি অনুসন্ধান করুন।"

কথা ছোট গিন্নীর কর্ত্রীর সম্মুখেই হইয়াছিল। মাখন চলিয়া গেলে কনকের বিবাহ সম্বন্ধে যে ছোট কর্ত্রী মোটেই কোন আগ্রহ দেখাইতেছেন না ইহা উপলক্ষ করিয়া মণির মা তাঁহাকেও বলিলেন—"ছোট বউ তোমারও যে মেয়ের জন্য কোন চিন্তা দেখিতেছি না; এত বড় মেয়ে তোমার, এ দিকে কি দৃষ্ট করিতে নাই?"

ছোট কর্ত্রী বলিলেন—"কি করিব বল দিদি? হিন্দুর ঘরের মেয়ে, কুল ও কপাল বিধাতা ঠিক করিয়াই পাঠাইয়াছেন। সময়ও তাহারই হাতে, মানুষের কি সাধ্য তাহা খণ্ডন করে?"

বড় কর্ত্রী—"এক কুল-কপাল ভাবিয়া থাকাও ঠিক না। শেষ বেণী পুড়িয়া আঙ্গুলে ধরিলে চিন্তা করিবারও অবসর থাকে না—যেখানে সেখানেই ডুবাইয়া দিতে হয়।"

ছোট কর্ত্রী—"তাহাও কি দিদি প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ ছাড়া হইতে পারে? ছোট হইতে দুঃখ ও বিপদ ভোগিয়া ভোগিয়া ঈশ্বরের বিচারের উপরই নির্ভর জন্মিয়া গিয়াছে। তিনি যখন জগতের ব্যবস্থা করিতেছেন, তখন কনকেরও ব্যবস্থা নিশ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন।"

বড় কর্ত্রী—"মনতো তা বুঝে না বোন, তাই মন আই ঢাই করে।"

ছোট কর্ত্রী "ছেলের বিবাহের জন্য চিন্তাকি দিদি, বল না মণিকে, সে আপনা হইতেই বাছিয়া আনিবে তোমাদের অনাসৃষ্টি কারবারের জন্যইতো সেবার ইাদলপুরের বিবাহ পণ্ড হইল। ইহার পর ওতো কত আসিল।"

বড়কর্ত্রী—"সেও বোন্ তাহা হইলে কুল-কপালেরই কথা..."

ছোটকর্ত্রী—"তাতে কি আর ভুল আছে? আমাদের জন্য আমাদের চেয়েও বেশী ভাবেন, বেশী চিন্তা করেন, এমন দরদীও আছেন সেটা ভাবিতে পারিলে, আর চিন্তা থাকে না; তাই ভাবিয়াই দিদি নিশ্চিন্ত আছি। নতুবা আজ আমার দুঃখে পাষাণ কাঁদিত"

ছোটকর্ত্রী এইস্থলে—তাঁহার জগন্নাথ তীর্থের বিপদে ভগবানের করুণ কর স্পর্শ তিনি কিরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন—চক্ষু জল ফেলিতে ফেলিতে তাহার অনেক কথা বড়কর্ত্রীর নিকট ইচ্ছা করিয়াই বলিয়া ফেলিলেন। এই প্রসঙ্গে মাখনের কথাও উঠিল!

শুনিয়া বড়কর্ত্রী একটু চকমিত হইয়া বলিলেন "তাহা হইলে মাখন তোমার সত্যিকার বোন্‌পুত নয় ছোট বড়?"

ছোটকর্ত্রী বলিলেন "না হইলে ও দিদি সে আমার এত আপনার যে তাহাকে ছাড়িয়া দিলে, আমার সকলি ছাড়িতে হয়। ভগবান তাহাকেই আনিয়া আমার আশ্রয় স্বরূপ ধরিয়া দিয়া আমাকে এ সংসারে পুনরায় আনিয়াছেন। মাখনের সাক্ষৎ না পাইলে কে আমাকে করুণা বাবুর আশ্রয় ধরাইয়া দিত?"

বড় বউ জিজ্ঞাসা করিলেন—"করুণা বাবু কে ছোট বউ?"

ছোট বউ—"ঢাকার উকিল, যাঁর আশ্রয় করিয়া আমি এই বিপদ সাগরে কুল পাইয়াছিলাম। করুণা বাবু আমার জন্য কত বিপদে সাঁতার দিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় তুমি শুনিয়াছ দিদি!

"না বোন, আমরা কেমন করি। শুনিব? আমরা কেবল শুনিয়াছি, তুমি বাবা জগবন্ধুর কৃপায় রক্ষা পাইয়া আসিয়া ঢাকায় এক উকীলের বাসায় আছ।"

বড়কর্ত্রীর মুখের কথা শেষ হইতে না হইতে ছোটকর্ত্রী বলিতে লাগিলেন—"করুণা বাবু অনন্ত বিপথ মাথায় নিয়া নিজের ঘর হইতে টাকা খরচ করিয়া পুরীর হাসপাতালের ডাক্তারকে সমন করিয়া আনিয়া আমার কূল রক্ষা করেন সে মোকদ্দমায় আপোষ না হইলে আমার যে আজ কি দশা হইত, তাহা ভাবিতে ও শরীর সিহরিয়া উঠে।..."

এইস্থানে ছোটকর্ত্রী মাখনের সহিত তাহার আকস্মিক সাক্ষাতের কথা ও তাহার সম্বন্ধে অন্যান্য যাবতীয় কথা বলিলেন।

শুনিয়া বড়কর্ত্রী বলিলেন—"এতকথা তো জানিনা। তাহা হইলে তুমি তো একরকম বোধ হয় নিশ্চিন্তই আছ বোন্। মাখনের ও আশ্রয় নাই।"

ছোটকর্ত্রী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন "সকলি ভগবানের হাত।"

বড়কর্ত্রী—"সম্বন্ধ কি উত্তরে?"

ছোটকর্ত্রী আগ্রহের সহিত বলিলেন—"দেখা তো যায় দিদি উত্তরে এখন ভবিতব্যতা কাহার কি আছে, কে জানে? এ পর্য্যন্ত মনের কথা কাউকে কিছু বলি নাই। তোমার কেমন মনে হয় দিদি?"

গোপী ভাণ্ডারী মাখনের নীচ ও ক্ষুদ্র দৃষ্টির অনেক দৃষ্টান্ত বড়কর্ত্রীর নিকট দুই বৎসর পূর্ব্বে সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছিল। মাখনের সংস্পর্শে মণির স্বভাবেও যে সে ক্ষুদ্রভাব সংক্রামিত হইয়াছিল, তাহা বড় হিস্যার কাহারও অবিদিত ছিল না। সে সকল কথা স্মরণ করিয়া বড়কর্ত্রী গম্ভীরভাবে বলিলেন—"কি জানি ছোটবউ আমার যেন বড় বেশী ভাল ঠেকিতেছে না। তোমার এতবড় সংসার লাড়াচাড়া করিবে যে সে কেন—না অন্নং নবস্বং সচবারি পাত্রং একজন দুকুল হীন পথের কাঙ্গাল হইবে? সে হয় হইবে—একজন হাইকোর্টের উকীল, নয় এমন আর একটা জমিদারের ছেলে—যেন যুগে যুগে বসুন্ধরা মিলে।"

ছোটকর্ত্রী প্রতিবাদের ভাবে বলিলেন—"মাখনও কি হাইকোর্টের উকীল হইতে পারিবে না দিদি? মণি বলিয়াছে, মাখন জেলার কর্ত্তা হইবে।"

বড়কর্ত্রী সে কথার আর কোন প্রতিবাদ না করিয়া বলিলেন—"স্বামীর নাম বজায় থাকুক বোন; যার যা—কুলে কপালে আছে, তো হইবেই; ভাল বর দেখিয়া একটি

সাহিত্যিকগণ মানুষের জীবন চরিত্রের কোন প্রয়োজন আছে তাহা কোন কালেই মনে করেন নাই। মনে করিলে বঙ্কিমচন্দ্রের মত প্রতিভাবান লেখকের একখানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর জীবন চরিত প্রণীত হইত। যে বঙ্কিমচন্দ্র "কাব্য অপেক্ষা কবিকে বুঝিয়া অধিকতর লাভ" লিখিয়া ছিলেন তিনি ও একটী সংক্ষিপ্ত আত্মজীবন চরিত কিম্বা একখানি ডায়েরী পর্য্যন্ত রাখিয়া যান নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুকালে তাঁহার অনেক অন্তরঙ্গ সাহিত্যিক বন্ধু এবং আত্মীয় জীবিত ছিলেন। তাঁহারা তখন ইচ্ছা করিলে অনেক উপাদান সংগ্রহ করিতে পারিতেন। কিন্তু সে কর্ত্তব্য তাঁহারা পালন করেন নাই। ইংরেজী সাহিত্যে আমরা দেখিতে পাই লেখক ছোট হউক বড় হউক সকলের জীবন চরিত আছে। বাঙ্গলা সাহিত্য এ বিষয়ে বড় দরিদ্র বঙ্কিমচন্দ্র অদ্বিতীয় সাহিত্যিক পাশ্চাত্য সাহিত্যে অনেক বিখ্যাত উপন্যাসিক আছেন, অনেক প্রতিভাশালী কবি আছেন, অনেক তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সমালোচক ও ঐতিহাসিক আছেন কিন্তু বঙ্কিমের ন্যায় একাধারে এই সকল শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি জগতের সকল সাহিত্যেই দুর্লভ। বঙ্কিম বাঙ্গালা জাতিকে অসামান্য শক্তিশালিনী ভাষা দিয়া গিয়াছেন। আজ যে ভাষায় গ্রন্থ লিখিত হইতেছে, সংবাদ পত্রিকা ও মাসিক পত্রিকা পরিচালিত হইতেছে, সভায় বক্তৃতা হইতেছে সেই ভাষার স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র। উপন্যাসে বঙ্কিম একচ্ছত্র সম্রাট। তিনি ঐতিহাসিহাসিক ও প্রথম পথ প্রদর্শক। সমালোচনায় তাহার অসামান্য সৌন্দর্য্যজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। অক্ষয় বাবু তাহার পুস্তকে এই সকল কথাই ধারা বাহিকরূপে সুন্দর বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়াছেন। অক্ষয়বাবু বিজ্ঞ ও রসগ্রাহী। তিনি কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, কৃষ্ণকান্তের উইল, রাজসিংহ প্রভৃতি গ্রন্থের চরিত্র বিশ্লেষণে যথার্থ সৌন্দর্য্যানুভূতি ও সূক্ষ্মদৃষ্টির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। সংক্ষেপে বঙ্কিম সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য সকল কথাই এই পুস্তকে উল্লিখিত হইয়াছে। মাসিক পত্রিকায় বঙ্কিমের সমসাময়িক ব্যক্তিগণ তাঁহার সম্বন্ধে যে সকল বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন তাহাও এই গ্রন্থে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে ইংরেজীতে Hutton's life of Scott যেরূপ মনোহর এই পুস্তকখানিও তদ্রূপ চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। আশা করি দ্বিতীয় সংস্করণে অক্ষয়বাবু বঙ্কিমের উপন্যাস সকলের চরিত্র বিশ্লেষণে অধিকতর স্থান প্রদান করিবেন। আর একটী কথা এই পুস্তকের পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে "ধর্ম্মব্যাখ্যা" বিষয়ে বঙ্কিম ও জেনারেল এসেম্ব্লিজ কলেজের অধ্যাপক পরলোকগত মিঃ হেষ্টি মহাশয়ের সহিত প্রতিমা পূজা উপলক্ষে যে লড়াই হইয়াছিল তৎসম্পর্কে অক্ষয়বাবু লিখিয়াছেন,—"এই অধ্যাপক পুঙ্গবের বক্রক্রীড়া করিবার সখ অত্যন্ত বলবৎ হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি নিজের শৃঙ্গের দৃঢ়তা যতটা অপরিমেয় মনে করিয়াছিলেন কার্য্যতঃ দেখিলেন ততটা নয়।" অধ্যাপকদিগের শৃঙ্গ থাকে তাহা আমাদের জানা নাই। ঢাকা কলেজের অক্ষয়বাবু একদিন অধ্যাপক ছিলেন। আমরা আমাদেব কোন পরিচিত বা অপরিচিত অধ্যাপকের শৃঙ্গ দেখি নাই। আশা কর দ্বিতীয় সংস্করণে অক্ষয়বাবু এই অপবাদ দূর করিবেন। আমরা জেনারেল এসেম্ব্লিজ কলেজের পুরাতন অধ্যাপকদিগের মুখে বিঃ হেষ্টির অসাধারণ পাণ্ডিত্যের কথা শুনিয়াছি। মৃত ব্যক্তির সম্পর্কে প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পর এইরূপ উক্তি সুরুচি সঙ্গিত নয়। অক্ষয়বাবুর মত বিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষেতো নহেই। এই পুস্তক খানি আমাদের ভাল লাগিয়াছে বলিয়াই এই দোষটী গ্রন্থকারকে দেখাইয়া দেওয়া সঙ্গত বোধ করিলাম।

শ্রীহিতব্রত।

সাহিত্য সংবাদ।

বাঙ্গালার কথা নামক দৈনিক পত্রিকা খানা আপাততঃ বাহির হইবে না।

বাবু যামিনীমোহন ঘোষ বি, এ, মহাশয়ের ময়মনসিংহে সন্ন্যাসী নামে একখানা ইংরেজী ইতিহাস গ্রন্থ বাহির হইয়াছে।

এপ্রিলের চিত্র।

চৈত্রমাসে বাঙ্গালার কুমারী কন্যারা। "উত্তম ব্রত" করিয়া সন্ধ্যায় তুলসী তলায় প্রদীপ দিয়া থাকে এই সংখ্যায় প্রদত্ত সন্ধ্যা প্রদীপ চিত্র খানাতে চিত্র শিল্পী সেই ভাবটীই প্রকাশ করিয়াছেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

সৌরভ

একাদশ বর্ষ। | ময়মনসিংহ, বৈশাখ, ১৩৩০ সন। | চতুর্থ সংখ্যা।

লোক মত।

সংসারে মানুষ কেবলমাত্র সত্যের অনুসরণ করিয়া চলিতে পারে কিনা? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ সাধ্য নহে। বস্তুতঃ বহু মহানুভব ব্যক্তি এ প্রশ্নের সুমীমাংসার প্রয়াস করিয়াছেন। লোকমত সত্যোপলব্ধির সহায়ক কিনা, এ প্রশ্নের মীমাংসা সহজসাধ্য না হইলেও করা যাইতে পারে।

অনেকের মতে লোকমতই সত্যের রূপান্তর মাত্র। ভগবানের বাণী প্রকারান্তরে মানবের মধ্য দিয়াই প্রকাশ পায়, মানুষ যখন আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নির্ব্বিশেষে একই মত পোষণ করে, তখন ইহা ভগবানের আদেশ বলিয়া মানিয়া লইতে কাহারো কাহারো মতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ হয় না। সুতরাং তাহাদিগের পক্ষে লোকমতই সত্যের রূপান্তর মাত্র।

কিন্তু, জগতের ইতিহাসে বিপ্লবের পর বিপ্লবের কাহিনী আসিয়া এমনইভাবে মানবহৃদয়ে আঘাত করিয়াছে যে লোকমতের উপর অনেককেই বহুবার আস্থা সম্পূর্ণ ভাবে হারাইতে হইয়াছে; মহামতি Burke এর মত বিজ্ঞ এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিকেও প্রথমতঃ French Revolution এর পক্ষ সমর্থন করিয়া পরিশেষে লোকমতের বিরুদ্ধে যাইয়াও সম্পূর্ণ বিভিন্ন মতের প্রচার করিতে হইয়াছে। লোকমত সময় সময় অত্যন্ত ন্যায্য এবং আবশ্যক বোধ হইলেও লোকমতের অপবাদ বহু ক্ষেত্রে এতই অন্যায় এবং অসম্ভব হইয়া উঠে যে তখন বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ ইহার উপর সমুদয় আস্থা হারাইয়া ফেলেন। মিলটন সেক্ষপীয়ার প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কবিগণ লোকমতকে "Hydra headed monster" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। লোক মতের অস্থিরতা এবং অনিশ্চয়তাই যে ইহার উপর আস্থা হারাণের কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই।

লোকমত এতাদৃশ দ্বিভাব সম্পন্ন হইলেও বহু লোকেই ইহাকে সত্যের রূপান্তর বলিয়া মানিয়া লইতে কুণ্ঠিত হন না। তাঁহাদের মতে আপাততঃ বিরুদ্ধ ভাব সম্পন্ন হইলেও উভয়ভাবেরই সমর্থন করা যাইতে পারে। আজ যাহার প্রয়োজন, কালই হয়ত তাহার আবশ্যকতা নাও থাকিতে পারে। কাজেই লোকমত আজই কোনও এক ভাবের জন্য পীড়ন করিয়া কালই অন্য ভাবের জন্য উৎপীড়ন করিলেও তাহা সত্য পথ হইতে বিচ্যুত হইতেছে, ইহা না ভাবিলেও চলে। কিন্তু লোকমত সত্যাশ্রয় করিয়াই যে সকল সময় দাবী করে, তাহা যথার্থ নহে। কবি শ্রেষ্ঠ সেক্ষপীয়ার তাহার 'জুলিয়স সিজর' পুস্তকে তাহা বিস্তৃতভাবেই প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

অনেকেরই মতে, সমাজ ব্যক্তির সমষ্টি মাত্র, সুতরাং ব্যক্তির পক্ষে যাহা সত্য, সমাজের বেলায় তাহাই সত্য। ব্যক্তির স্বভাব আলোচনার ফলে জানা যায় যে কতকগুলি সত্য প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বাধীন চিন্তার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া উপলব্ধি করিতে পারে। এই সত্যগুলিকে আমরা **পারমার্থিক সত্য** নাম দিতে পারি। রাজনীতি কিম্বা সমাজ নীতিতে যে প্রকারের সত্য লইয়া আমরা সাধারণতঃ আলোচনা করিয়া থাকি, সেইগুলি এই শ্রেণীর নহে, সে গুলিকে আমরা **ব্যবহারিক সত্য** নাম দিব। এই ব্যবহারিক সত্য গুলিই ব্যক্তি বিশেষের নিকট প্রকার ভেদে প্রকাশ পায়। এই সত্য উপলব্ধির বেলায় প্রাক্তন, সামাজিক শক্তি, পারিপার্শ্বিক অবস্থা প্রভৃতির স্রোত, ব্যক্তির

বহু বিবাহ প্রথা এখানে বড়ই প্রচলিত। "উষণাবলী" নামক বালীর একখানা প্রাচীন গ্রন্থে নাকি লিখিত আছে যে কালিমন (কালীমোহন ?) নামক এক রাজার প্রপিতামহের পাঁচশত বিবাহিতা রাণী ছিল। অধুনা তথাকার অনেক বড় লোক ১৮।২০টা বিবাহ করিয়া থাকেন। প্রাচীন ভারতীয় সমাজে রাজা দশরথ ৩৫০ বিবাহ করিয়াছিলেন; ১৮।২০টী দার পরিগ্রহ প্রথাতো সেদিন মাত্র বন্ধ হইয়াছে। আমাদের মনে হয় ভোগ-বিলাসের প্রাবল্য ও আর্থিক স্বচ্ছন্দতাই এইরূপ উশৃঙ্খল সমাজ রীতির প্রশ্রয় দান করিয়া থাকে।

বালীদ্বীপে স্বজাতীয় বিবাহই ধর্ম্মানুমোদিত। তবে উচ্চ জাতীয় ব্যক্তিরা নিম্ন বর্ণসমূহ হইতে কন্যা গ্রহণ করিতে পারেন। এই অনুলোম রীতি হিন্দু ভারতের প্রাচীন রীতি। কিন্তু নিম্ন শ্রেণীতে কন্যা প্রদান করিতে কেহ সহজে সম্মত হন না। এই প্রতিলোম বিধি প্রাচীন ভারতীয় সমাজে একদিন প্রচলিত থাকিলেও ক্রমে নিষিদ্ধ হইয়াছিল। এখানে প্রতিলোমজ সন্তান বর্ণ সঙ্কর বলিয়া গণ্য হয়।

খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে এখানে বাছ বিচার নাই। বলিতে কি হিন্দু অধিবাসীগণও গোমাংস গ্রহণ করিয়া থাকেন; কক্কুট ও বরাহ তাহাদের অতি প্রিয় খাদ্য। বোধ হয় প্রথম দুটী মুসলমান জাতির সংস্পর্শে ও শেষ নিষিদ্ধটী ইউরোপীয় জাতির সংস্পর্শে প্রাপ্ত অভ্যাসের নিদর্শন। বালীর ব্রাহ্মণেরা কিন্তু একেবারে নিরামিষাসী। উচ্চ শ্রেণীর ফলমূলাহারী সাধু সজ্জন গৃহস্থেরও এখানে অভাব নাই।

মৃতদেহ এখানে অগ্নি সংযোগে দাহ করা হয়। রাজাদিগের সৎকার খুব ধূমধামে সম্পন্ন হইয়া থাকে এবং তাহাতে প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়। মৃত দেহটী এক মাস কাল পর্য্যন্ত তৈল সংযোগে রাখা হয়। ইহাও ভারতীয় প্রাচীন প্রথা; রাজা দশরথের দেহ রক্ষার ব্যবস্থাই বোধ হয় বালী দ্বীপে অনুসৃত হইয়া থাকে।

সতীদাহ প্রথা বালী-সমাজের একটা পুণ্যময় প্রথা। এই প্রথাকে তাহারা 'সত্য' বলে। এই উপলক্ষে সহস্র সহস্র লোক সমবেত হইয়া আমোদ আহ্লাদ করিয়া থাকে। রাজাই হউক, প্রজাই হউক, কাহারও মৃতদেহ বাড়ী হইতে—বাড়ীর রাস্তা দিয়া বাহির করা তাহারা দোষণীয় বলিয়া মনে করে, এই জন্য রাজরাজরাদের মৃতদেহ বাড়ীর দেওয়াল টপকাইয়া বহির্গত করা হয়।

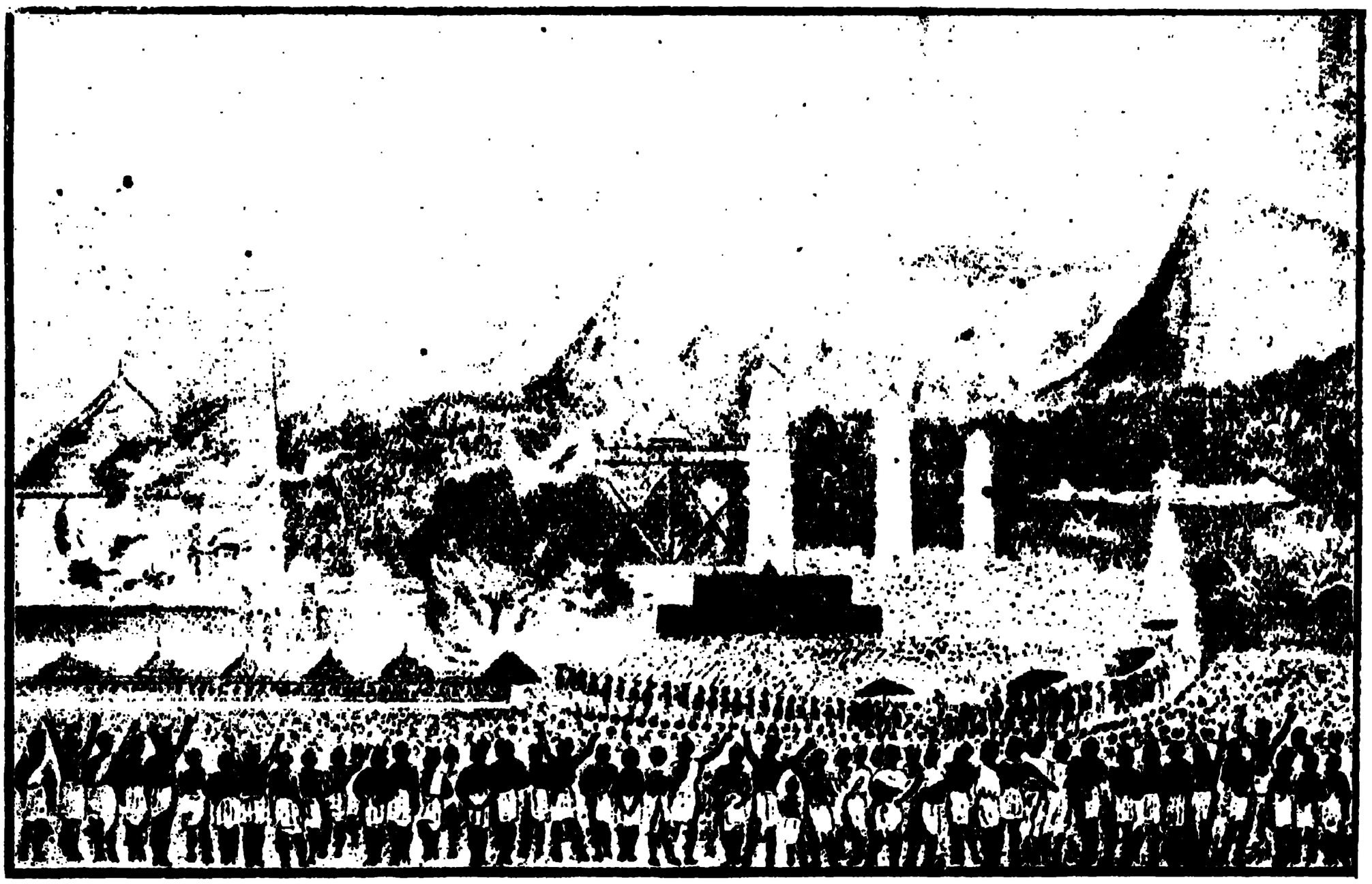

বালী দ্বীপের হিন্দু রাজার শবদাহ ও সতীদাহ চিত্র।

রাজাদের মৃতদেহের সহিত তাহাদের অসংখ্য পত্নীগণ চিতায় প্রবেশ করিয়া থাকেন; সে দৃশ্য দেখিবার জন্য কিরূপ লোক সমাগম হয়, এই চিত্রখানা দেখিয়া তাহা অনুমান করিতে পারিবে। ইহা সতীদাহের একখানা চিত্র। উচ্চ চূড়া বিশিষ্ট যে স্তম্ভগুলি দেখা যাইতেছে তাহাদিগকে 'বদি' বলে। এক একটী বদি ১১ তলা। এই বদীর উপরে

বরুণ দাঁড়াইয়া থাকিয়াই বলিলেন—মহাশয় বসুন আমার বক্তব্য শেষ হয় নাই। আমরা মর্ত্ত্যবাসীর সঙ্গে তাহা করিব না। কারণ নির্লিপ্ত ভাবে মর্ত্ত্যবাসীর উপকার করাই হচ্চে আমাদের উদ্দেশ্য। তবে আমি যে 'ননকোর' কথা উল্লেখ করিলাম তাহার কারণ দেবগণের একটী বিশেষ স্বার্থ এবং অধিকার নরগণ নষ্ট করিতেছেন।"

যম উঠিয়া বলিলেন "আমাদের দেবগণের মধ্যেই ঐক্য সখ্য নাই, তাই শাসন কার্য্যে অনেক সময় আমাকে বেগ পাইতে হইতেছে। এক সময় আমারও মর্ত্ত্যে পূজা ছিল—এখন আমার অধস্তন চরগণের আছে, কিন্তু আমি প্রভু হইয়াও আমার নাই।"

স্বর্গরাজ্যের অপবাদে দেবরাজ ইন্দ্র আপত্তি করিয়া বলিলেন—"যমরাজের কথার কোন মূল্যই নাই। আমাদের ঐক্য সখ্যের অভাব তিনি কোথায় দেখিলেন? এই মন্তব্য আপত্তি জনক।"

যম দাঁড়াইয়া বলিলেন—"দৃষ্টান্ত দিতে গেলে ব্যক্তিগত হইয়া পড়ে, সে জন্য ক্ষমা করিবেন—উপায় নাই। সাক্ষাৎ দৃষ্টান্ত সূর্য্য এবং বরুণের বৈরভাব। সূর্য্যের সঙ্গে আড়ি করিয়া বরুণ তেমন যে সূর্য্যের চলনপথ গ্রীষ্মমণ্ডলটা তাও জলীয় হাওয়ায় হীম শীতল করিয়া রাখিয়াছেন—মানুষ সুখ পাইলেই আর্ত্তনাদ করে, দয়ার্দ্র বিষ্ণুর সিংহাসনও তাহাতেই টলে।—যেখানে সূর্য্যের শাসন, বরুণ তথায় যদি আড়ি পাতিতে না যান, আর যেখানে বরুণের প্রভাব, সূর্য্য যদি সেখানে উঁকিচুপি না দেন—দেখিবেন আর্ত্তনাদ কোথায় থাকে? তাহা হইলে আমার শাসনও নীরবে চলিতে পারে! তাই বলি চাই ঐক্য, চাই সখ্য, চাই কড়া শাসন।"

পবন উঠিয়া বলিলেন—"যমের সে প্রাচীন চালে এখন আর চলিবে না। এখন modern deplomecyর দিন। Martial idea টা আপাততঃ বিসর্জ্জন দিয়া বিশ্ব প্রেমের মূলমন্ত্র যমকে অন্ততঃ মুখে আওরাইতে হইবে। কার্য্যোদ্ধারের যে ইহা একটী উৎকৃষ্ট পন্থা, তাহা ভুলিয়া গেলে চলিবে না। উচ্চারিত যাদু মন্ত্রের মোহন স্পর্শে অক্ষম শক্তিশালী হয়; মর্ত্ত্যবাসীর উপর আমার প্রভাব লক্ষ্য করিলে দেবগণ তাহা সহজেই অনুধাবন করিতে পারিবেন। ভিতরে যাহাই থাকুক, বাহ্যিক ব্যবহারেই মর্ত্ত্যবাসী বিচার করিয়া থাকে। মর্ত্ত্যে আমার আদর তাহার একটী প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। মর্ত্ত্যের এক একটা নর গড়ে সার্দ্ধ ত্রিহস্ত উন্নত। কিন্তু সেই সাড়ে তিন হস্ত দেহ যষ্টির উপর আমি চাপাইয়াছি কত ভার, অনুমান করুণ দেখি আপনারা?

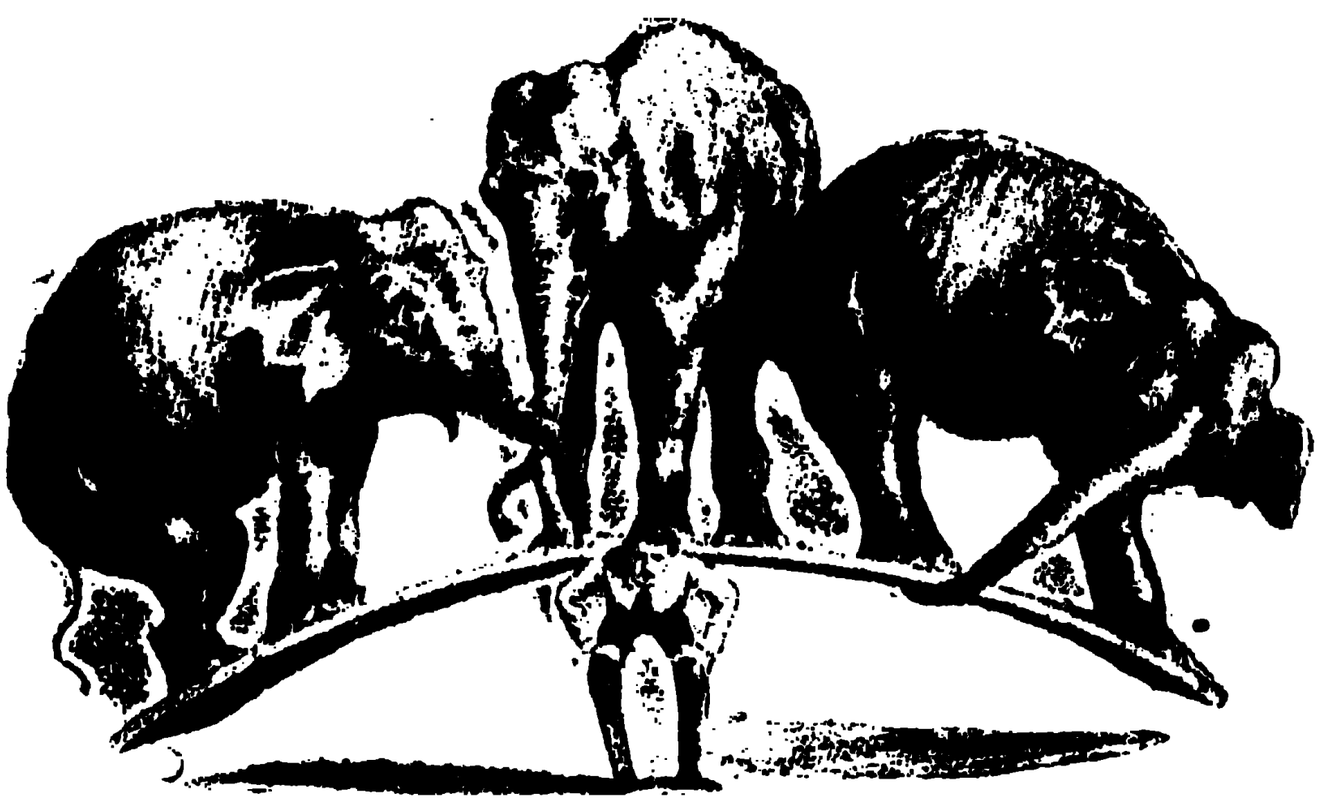

আমি চাপাইয়াছি এই তিনটী ঐরাবতের বোঝা; প্রায় ৩০০০০ ত্রিশ সহস্র পাউণ্ড বা ৩৭৫ মণ ভার। আমার এইরূপ বিরাট বোঝার ভার মর্ত্ত্যবাসী আবাল বৃদ্ধ বনিতা প্রত্যেকে বহন করিয়াও কি আমাকে মুখে কটু কথাটী বলিতেছে?

সকলে সমস্বরে—'শুনুন-শুনুন।'

আমি এমন কায়দা সহকারে আমার এই বিরাট বোঝা মর্ত্ত্যবাসী মানবের স্কন্ধে চাপাইয়া বসিয়া আছি যে সময় সময় আমার অভাবেই বরং তাহাদের অসোয়াস্তি উপস্থিত হয়। পারিবেন কি ইন্দ্র তাহার ঐরাবত মর্ত্ত্যমানবের বক্ষের উপর দিয়া চালাইয়া নিতে? অথচ আমার চাপ কিন্তু ঐরাবতের তিনটীর সমান?"

চন্দ্র উঠিয়া বলিলেন—"সন্ধ্যা আগত; এখন আমাকে বিদায় হইতে হইবে। দেব গণেরও সন্ধ্যা আহ্নিকের সময় হইয়াছে; আজকার জন্য সভা মুলতবী রাখাই এখন উচিত—তবে পবন দেবের নিকট আমার জিজ্ঞাস্য এই যে তাঁহার কোন্ গুণে মর্ত্ত্যবাসী তাহার এমন সম্মান করে, যাহা সুধা বিতরণ করিয়াও আমি পাইনা।"

পবন উঠিয়া বলিলেন—"বর্ত্তমান কূট নীতি, মৌখিক শিষ্টাচার—এ আমাদের সকলেরই শিক্ষা করা উচিত।"

(সেদিনকার জন্য সভা ভঙ্গ হইল।)

আঘাত করিয়াছে এবং তাহাতেই তোমার প্রচণ্ড আত্মাভিমান জাগ্রত হইয়াছে। এই যে আত্মাভিমানী তুমি, এই তোমার সহিত সংসারে সম্পর্ক হীন কপর্দ্দক শূন্য আমার তুলনা অসম্ভব। সকল ভাবকেই ভাই ভাষায় আকার দেওয়া যায় না; অবস্থাই তাহার স্পষ্ট অভিব্যক্তি। অবস্থার ভিতরে প্রবেশ না করিয়া বাহির হইতে বিচার করিলে চলিবে কেন? এরূপ অন্ধের ন্যায় বিচার করিতে যদি যাও, তবে ঐ রূপ অবহেলার উত্তর ব্যতীত আর কি সম্ভব হইতে পারে?"

মাসীমা মণি ও মাখনের তর্ক এতক্ষণ বারান্দায় দাঁড়াইয়া শুনিতেছিলেন, এই বার তিনি ধীরে ধীরে আসিয়া উভয়ের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ঈষৎ হাস্য সহকারে বলিলেন—"মণি, তুই কি তোর বালাখানা মাখনকে ছাড়িয়া দিবি?"

মণি উত্তর করিল—"কেন খুড়ীমা?"

মাসীমা বলিলেন "তা না হইলে মাখন বউ লইয়া আসিয়া উঠিবে কোথায়? সে কি বলিতেছে, তুই বুঝিতেছিস না?"

মণি দুঃখিত ভাবেই বলিল—"এ মাখনের অত্যন্ত অসরল ব্যবহার খুড়ী মা!..."

মাখন মাসীমার ইঙ্গিত-কথায় লজ্জিত হইয়া আত্ম রক্ষার ছলে বলিল—"বউ করিবার মত যখন সময় হইবে, তখন মাসীমার টেঁকী ঘরই আমার বালাখানা-বাসর ঘর হইতে পারিবে; সে জন্য কোন চিন্তার কারণ নাই। এখন চাবুকের জন্য ঘোড়া রাখা, না ঘোড়ার জন্য চাবুক রাখা, সেইটাই বিবেচনার বিষয়।"

মণি বলিল—"আচ্ছা, তবে তুমি তোমার বিবেচনাই কর।"

মাখন মাসীমার দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল—"আচ্ছা মাসীমা, আপনি বলুন, মণির বিবাহ করার সহিত আমার বিবাহ কারার যুক্তি কিসে আসিতে পারে? সে করিবে তার প্রয়োজনে, আমি করিব আমার প্রয়োজনে। আমার প্রয়োজন অভাব, আমি করিব না; তাহার প্রয়োজন গুরুতর, সে জন্য সে তাহার প্রয়োজন পুরণ করিবে—এই তো জগতের রীতি!"

মণি ব্যঙ্গ করিয়া বলিল—"আমার এমনই বা কি গুরুতর প্রয়োজন তুমি বুঝিলে? আমি তো নিজে কিছুই বুঝিতেছি না, সেটাই একটু সরলতার সহিত বুঝাও না।"

মাখন বলিল—"সরল বা অসরল ভাব ইহাতে কিছুই নাই। তোমার কর্ম্ম জীবনের আরম্ভ হইয়াছে; ইহাতে যৌবনের প্রলোভন গুরুতর, মনকে একদিকে আকর্ষণে শৃঙ্খলিত রাখিবার জন্য এই সময় তোমার সংসারবন্ধন প্রয়োজন, অন্যথায় পদস্খলন বিচিত্র নহে। বরং তোমার ন্যায় বিলাস বিভবে যাহাদের বাস তাহাদের সে সম্ভাবনাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, ইহাই আমার ধারণা। অবশ্য তোমার বিবাহের বয়স যায় নাই—সেজন্য আমি তোমাকে এখনই তাহা করিতে বলিতেছি না;— কিন্তু বিবাহ করা উচিত মনে করিতেছি; তোমার মায়েরও সেই মত।"

মাসীমা বলিলেন—"এখন তোমার সম্বন্ধে তোমার নিজ মতও সরল ভাবে মণিকে খুলিয়া বল।"

মাখন বলিল—"আমার পাঠ্যাবস্থাই শেষ হয়, নাই; এম, এ, টা না পাস করা পর্য্যন্ত আমার আকর্ষণ ঐ দিকেই শৃঙ্খলিত থাকিবে। ততদিন পর্য্যন্ত আমার মনকে এক চুল পরিমাণও এদিক ওদিক দিবার ইচ্ছা নাই। আমার জ্যেঠা মহাশয়ের অনুসন্ধানকেও আমি ইহা অপেক্ষা গুরুতর মনে করি না। আমার সম্বন্ধে আমার নিজের ইহাই চূড়ান্ত মত।"

মণি বলিল—"লেখাপড়ার জন্য তুমি যখন মনুষ্যত্বও বর্জ্জন করিতে বসিয়াছ, তখন আর অন্য পরে কা কথা।"

মাখন হাসিয়া বলিল—"মনুষ্যত্ব জন্মিবার পূর্ব্বে মনুষ্যত্ব হীনতার অপবাদ খুব গুরুতর নহে; আর তাহা হইলেও সহ্য করিবার শক্তি প্রত্যেকের থাকা দরকার। তাহা বুক পাতিয়া লইতে হইবে ও মুক হইয়া সহিতে হইবে। তারপর ঐ জিনিসটা লাভ হইলে পর অপবাদ ক্ষালনের বিস্তর অবকাশ জন্মিবে। যাক্, এ সকল বাজে কথার সময় যথেষ্ট হইবে। এখন মণির মাকে বলুন মাসী মা, যে মণি বিবাহ করিবে, পাত্রী স্থির করুন। দেখিয়া পছন্দ করিতে হয়, এই অবকাশে যাইয়া করা যাইতে পারিবে।"

মণি কোন উত্তর করিল না। চুপ করিয়া বসিয়া মাখনের হাতের সেই ইংরেজী মাসিক কাগজখানা পড়িতে লাগিল। তারপর কিছু দূর পড়িয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—"এই বুঝি তোমার বিবাহ না করিবার আরগুমেণ্ট সব! বাঃ! কি সুন্দর।"

মরুভূমির উপর দিয়া সমুদ্র তীরের পথে যাইতে হইল। লোকালয় সে পথে অতিকম, প্রতিক্ষণেই আমাদের সকট চালক আমাদের উপর ডাকাত পড়িবার আশঙ্কা করিত। আমরাও তাহার কথা মত আড়ষ্ট হইয়া পড়িতাম। ফলে ডাকাত বা ডাকাতির কোন চিহ্ন আমাদের নয়ন গোচর হয় নাই। রাত্রিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামে আশ্রয় লইয়া, অথবা অন্যান্য যাত্রী সহ একত্র হইয়া একস্থানে অবস্থান করিতাম। তারপর পুনরায় সকলে মিলিয়া পথ ধরিতাম।

এ প্রদেশের লোকেরা আমাদের অপেক্ষা স্বদেশী। নিজে বস্ত্র প্রস্তুত করে, তারা দেশী লবণ খায়। ইহারা সম্বর, পরভদ্রা প্রভৃতির নুণ খাইয়া থাকে। বিলাতি কোন দ্রব্যই তাহারা ব্যবহাব না করিয়া পারে। মরুভূমির নিকটবর্ত্তী প্রদেশ হইলেও এ অঞ্চলে শস্য একপ্রকার মন্দ জন্মায় না। ইহাদের সামাজিকতা কতকটা আমাদের অনুরূপ। সধবা স্ত্রীলোকগণ ঘোমটা দেন না, বিধবারা দিয়া থাকেন। বঙ্গদেশ অপেক্ষা এ প্রদেশে স্ত্রী স্বাধীনতা বেশী। ঘরের মেয়েদের পথে বাহির হইতে দেখা যায়, অপর পুরুষের সহিত আলাপ করিতেও বাধা নাই। এ দেশীয়েরা চাকরী অপেক্ষা ব্যবসাটা বেশী বুঝে। তুলা ও সূতার কল, কাপড়ের কল—এ দেশে খুব আছে। চাষের মধ্যে তুলার চাষ এ দেশে খুব বেশী। বাঙ্গালীরা এ দেশে আসিয়া এই সকল কলে চাকরী করে, কিন্তু কোন কালেরই স্বত্যাধিকারী বাঙ্গালী নহে। অন্য ব্যবসা সূত্রেও বাঙ্গালীকে এ দেশে পাওয়া যায় না। অথচ বোম্বাই ও রাজ পুতনার লোক বাঙ্গালার ধন লুটিয়া লইতেছে; সুতরাং "তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে।"

শ্রীরাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী, বিদ্যাভূষণ।

গ্রহে প্রাণীর অস্তিত্ব

নূতন প্রমাণ।

পৃথিবী ব্যতীত অন্যান্য গ্রহেও প্রাণীর অস্তিত্ব আছে কি?

মানুষ বাল্যকাল হইতেই অনুসন্ধিৎসা-প্রিয়। এই অনুসন্ধিৎসার মূলে চিত্ত বিনোদন যে অলক্ষ্যে বর্ত্তমান, তাহা কাহারও অপরিজ্ঞাত নহে। চিত্তের সন্তুষ্টির জন্য মানুষ এযাবৎ বহু অসাধ্য সাধন করিয়াছে; আরও যে কত করিবে তাহার ইয়ত্তা নাই। বহু দিন হইতে মানব অন্যান্য গ্রহেও প্রাণী আছে কি না জানিবার জন্য উৎসুক। তাহার এই সমস্যা সমাধানের জন্য যিনি যখনই যাহা বলিয়াছেন তাহা সে উদ্‌গ্রীব হইয়া শুনিয়াছে। শিশুর জিজ্ঞাসায় ঠাকুরমার 'চাঁদের মা বুড়ীর কথা', প্রবাদে পরিণত হইয়াছে। ঠাকুরমা ঘোলের স্বাদ অম্বলে মিঠাইয়া শিশুর চিত্তবিনোদন করিয়াছেন। কিন্তু জ্ঞানীর তৃপ্তি তাহাতে মিটে কই। তাঁহার প্রজ্ঞা সকল সময়েই প্রামাণিক তত্ত্ব চায়। সম্প্রতি ফরাসী বিজ্ঞান ও ভেষজ পরিষদের অন্যতম সভ্য ডাক্তার গালিপ্পে অন্যান্য গ্রহে প্রাণীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে যে বিস্ময়কর নূতন আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা যে সুধীবৃন্দের প্রজ্ঞা চক্ষুর কিঞ্চিৎ তৃপ্তি সাধন করিবে সন্দেহ নাই।

ডাক্তার গেলিপ্পে তদীয় সহযোগী ডাক্তার সুকল্যাণ্ডের সহায়তায় ক্রম পরম্পরায় কতকগুলি পরীবিক্ষণ (Experin ont) করিয়াছেন। ঐ গুলিকে তিনি প্রস্তরীভূত উদ্ভিজ্জও প্রাণীদেহের নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ রূপে বিশ্বাস করেন। ভূপৃষ্ঠে পতিত কোন কোন উল্কাপিণ্ডে এই সকল প্রস্তরীভূত দেহের নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

উল্কাপিণ্ড ও তারা খসা।

উল্কাপিণ্ড কাহাকে বলে সকলেই জানেন। কেহ কেহ ইহার ভূপতন—ক্রিয়াকে তারাখসা বলিয়া থাকেন। প্রতি রাত্রেই এই ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে। বাস্তবিক পক্ষে এই উল্কাপিণ্ডগুলি ছোট তারা অর্থাৎ স্থানভ্রষ্ট বা কক্ষ্য চ্যুত

হইবে। তুমি মিসেস দাসের বাড়ী একটীবার যাও, ঠাকুমার একটা নেক্‌লেস চাহিয়া লইয়া আইস। আমি বাকী তিনটার জোগাড় করিতেছি।

মিসেস দাস সতীশের গ্রাম সম্পর্কে ঠাকুর মা বা খুল্ল পিতামহী, এখানেও প্রতিবেসী।

রাণী হাসিয়া বলিল—"তথাপি পর্দ্দাপার্কে যাইতেই হইবে! এমন যাওয়ার মূল্য কি?"

সতীশ বলিল—"সে বিচারে তোমার প্রয়োজন নাই, আমি যা বলিতেছি তা কর। না গেলে আমি বড় কষ্ট পাইব—এ পাড়ার মেয়েরা দিন রাত থিয়েটার দেখিয়া মসগুল, আর তোমাকে আমি···যাও, যাও।"

(৫)

সতীশ লাউ দাস এণ্ড কোং হইতে ৭৸৵০ আনা দিয়া একটা ব্লাউজ কিনিল, ক্লিনিং হাউস হইতে আট আনা ভাড়ায় এতখানা উৎকৃষ্ট ঢাকাই জামদানী লইল; আর এক বন্ধু হইতে বন্ধু পত্নীর চারগাছ সোণার চূড়ী লইয়া তিনটার পূর্ব্বেই বাসায় ফিরিয়া আসিল।

সতীশ বাসায় আসিয়া দেখিল, রাণীও মিসেস দাসের গৃহ হইতে নিজ পছন্দমত বাছিয়া একটী মূল্যবান মুক্তার হার বাক্সশুদ্ধ লইয়া আসিয়াছে।

হারটী দেখিয়া সতীশ বলিল—"কাপড়, চূড়ী, ব্লাউজের সহিত এ হার মানাইবে কি? হারটা যে বেজায় উঁচু দরের! থাক্‌ এখন ধীরে ধীরে; সাজগুজ কর। ঠিক চারটায় বাহির হইতে হইবে। আমি যাই, হেড্‌মাষ্টার বাবুর বাসায়—জানাইয়া আসি, তাঁহার মেয়েদের সঙ্গেই তুমি যাইবে। অনর্থক দুটা টাকা যাতায়াতের গাড়ীভাড়া আর লাগাইব না। চার ছয় আনা খরচ করিয়া হেড্‌মাষ্টারের বাসায়ই দিয়া আসিব পারিবে না তাঁদের সঙ্গে যাইতে? না, সাহস পাও না?"

বাহিরে যাওয়ায় অনভ্যস্ত রাণীর মনে স্বামী ছাড়া অপরিচিতের সঙ্গে যাইতে প্রকৃতই সাহস হইতেছিল না। কিন্তু কি করে সে, দরিদ্র স্বামীর অভাবের অর্থ—তার পর—সেখানেতো আর পুরুষলোক যাইতে পারিবে না। রাণী অগত্যা বলিল—"দেখি, পারি কি না! কাঙ্গালের ঘোড়ারোগ জন্মানই ভাল নহে, যখন জন্মিয়াছে, তখন যেমন করিয়াই হউক তাহা দমন করিতেই হইবে।"

সতীশ হেড্‌মাষ্টার বাবুর বাসায় চলিয়া গেল।

(৬)

রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত সতীশ হেড্‌মাষ্টার বাবুর বাসায় রাণীর জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়াছিল। দেওয়ালের ঘড়িতে দশটা বাজিলে হেড্‌মাষ্টার বাবু বলিলেন—"আর কতকাল বসিয়া থাকিবেন, আপনি বাসায় যান; ওদের প্রোগ্রেম লম্বা; আমোদ প্রমোদের পর খাওয়া দাওয়ারও ব্যবস্থা আছে; সুতরাং আসিতে রাত্রি ঢের হইবে বলিয়া মনে হয়। আজ বরং তিনি মেয়েদের সঙ্গে এখানেই থাকিবেন, কাল দুপরে আহারের পর লইয়া যাইবেন।"

সতীশ হেড্‌মাষ্টার বাবুর শিষ্টাচারের নিকট মস্তক অবনত করিয়া বলিল—"থাক্‌, এত রাত্রিতে আর যাইয়া কাজই নাই। কিন্তু কাল ভোরে না লইয়া গেলে আমাদের আহার বন্ধ....."

হেড্‌মাষ্টার বলিলেন—"তবে কাল ভোরেই লই। যাইবেন।"

সতীশ দোকান হইতে খাবার কিনিয়া লইয়া বাসায় ফিরিল এবং আহার করিয়া নিদ্রার ব্যবস্থা করিল

পত্নীকে আজ পর্দ্দা পার্কে পাঠাইতে পারিয়া সতীশ তাহার বুকের বোঝা যেন অনেকখানি লাঘব করিয়া ফেলিয়াছে। তাহার এত উদ্যম যে সে কার্য্যে পরিণত করিতে পারিয়াছে, তাহা চিন্তা করিয়া সে আজ পরম উৎসাহী। এই ব্যাপারে যে আট দশ টাকা ব্যয় হইয়াছে, তাহা কষ্টসাধ্য অপব্যয় হইলেও রাণীর জন্য সে করিতে পারে, এবং করা উচিত। তবে এত দিন যে করিতে পারে নাই, তাহার কারণ রাণীই তাহাকে তাহা করিতে সুযোগ দেয় নাই।

রাণী নিজ আকাঙ্ক্ষা আব্দার চরিতার্থ করিতে তাহার দরিদ্র স্বামীকে ইঙ্গিতেও কখন পীড়ন করে নাই; এ বিষয়ে সে ছিল অতি সাবধান।

(৭)

সতীশ ভোরে হেড্‌মাষ্টার বাবুর বাসায় যাইয়া যাহা শুনিল, তাহাতে সে স্তম্ভিত হইয়া রহিল।

হেড্‌মাষ্টার বলিলেন—"আপনার স্ত্রীর গলার হার কাল রাত্রিতে খোয়া গিয়াছে। কোথায়, কোন্ সময়, কি প্রকারে তাহা কণ্ঠচ্যুত হইয়াছে—তাহা তিনি একেবারেই বলিতে পারেন না।"

সতীশ স্তম্ভিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া কথাগুলি শুনিল. আর ফেল্ ফেল্ করিয়া হেড্‌মাষ্টারের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; তাহার মুখ হইতে একটী কথাও বাহির হইল না।

হেড্‌মাষ্টার বাবু বলিলেন—"আপনি ওঁকে লইয়া একবার পার্কে যান. যদি কোথাও ছিঁড়িয়া পড়িয়া থাকে, এই সময়—ভোর বেলায় পাইতে পারেন। কোন্ দিকে তাঁহারা ছিলেন, কোথায় কোথায় গিয়াছিলেন—সবটা যায়গা দেখিয়া আসুন।"

সতীশ তাহাই করিল। স্ত্রীকে লইয়া গাড়ীতে পর্দ্দা পার্কে যাইয়া যে যে দিকে তাহারা গিয়াছিল, যে স্থানে বসিয়া অভিনয় দেখিয়াছিল যে স্থানে জলযোগ করিয়াছিল—ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে পতি-পত্নী তাহা তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিল; মুক্তার একটী রেণুকণাও তাহাদের চক্ষে পড়িল না।

রাণীর দুইচক্ষু ছাপিয়া জল পড়িতেছিল; আর সে মুখে শুধু বলিতেছিল—"কি হ'বে গো আমার—উপায় কি হবে।"

সান্ত্বনা নাই। তবু সতীশ রাণীর অবস্থা চিন্তা করিয়া নিজের মনের ভিতর কোন প্রকারে সান্ত্বনা আনিল—জিনিসের ক্ষতি তো হইয়াছেই, এ ক্ষতি তো পূরণ করিতেই হইবে। কিন্তু ইহার উপর এই দুশ্চিন্তায় স্ত্রীটীও যদি পাগল হইয়া উঠে।

সতীশ রাণীকে আশ্বাস দিয়া বলিল—"কোন চিন্তা নাই রাণী, তুমি এত ঘাব্‌ড়াইও না; না হয় ঋণ করিয়া একটা নূতন কিনিয়া ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করিব! চার বৎসরে পারি, ছয় বৎসরে পারি, ঋণ শোধ করিব। না হয়, আরো কষ্ট করিব। খোলার ঘরে থাকিব; তথাপি ব্যাকুল হইয়া মাথা নষ্ট করিও না। ভগবান আমাদের ব্যবস্থা যাহা করিবেন, ইচ্ছা করিয়াছেন, তাহা হইবেই। এখন দুই একটা কথা স্মরণ হয় কি না; দেখ দেখি! তুমি কি রাত্রিতে গলার হারের কোন খোজই নেও নাই—প্রথম জানিলে কখন?"

রাণী চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিল—"হেড্‌মাষ্টার বাবুর বাসায় গিয়াও হারটা আমার গলায় আমি দেখিয়াছি.."

সতীশ—"তবে তাঁহারা এরূপ বলেন কেন?"

রাণী—"তাঁহারা সন্দেহ করেন, পার্কেই ছিঁড়িয়া পড়িয়া গিয়াছে।"

সতীশ—"তুমি ঠিক জান, তাঁহাদের বাসায় গিয়াও তোমার গলায় হার দেখিয়াছ?"

রাণী বলিল—"হাঁ ঘুমাইবার পূর্ব্বেও আমি হারের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছি; আর কেউ দেখিয়াছে কি না বলিতে পারি না।"

সতীশ—"তুমি যদি নিশ্চয় জান এবং বল যে তুমি ঘুমাইবার পূর্ব্বক্ষণেও হার গলায় দেখিয়াছ, তবে আর বৃথা পার্কে ঘুরিয়া ফিরি কেন রাত্রিকার ভাড়াটীয়া গাড়ীর খোজ লইবারইবা কি প্রয়োজন! চল বাড়ী যাই!"

রাণী কাঁদিতে আরম্ভ করিল। সতীশ তাহাকে খুব মোলায়েম ভাবে সান্ত্বনা করিয়া অভয় বাক্যে বলিল—"তোমার কোন দোষ নাই রাণী, আমি যদি কাল রাত্রিতেই তোমাকে লইয়া যাইতাম, তবেই আর এ সাঙ্ঘাতিক বিপদ ঘটিত না। এ আমারই দোষে ঘটিয়াছে—এ জন্য দায়ী আমি....."

রাণীর কান্না থামিল না। সতীশ তাহাকে লইয়া বাসায় ফিরিয়া আসিল। তাহার অটল বিশ্বাস জন্মিল—হেড্‌মাষ্টার বাবুর বাসারই তাঁহার কোন সম্পর্কীয় লোক রাণীর ঘুমের মধ্যে তাহার গলা হইতে হার ছড়া অপহরণ করিয়াছে। উপায় নাই! এ লইয়া গোলমাল করিলে কোন ফল হইবে না—মাত্র হেড্‌মাষ্টার বাবুকে লজ্জিত করা হইবে। যে চুরি করিয়াছে, সে অবশ্য এখনও তাহা আগলাইয়া লইয়া বসিয়া রহে নাই। রাত্রিতেই সরাইয়া ফেলিয়াছে।

সতীশ রাণীর ভবিষ্যৎ আশঙ্কা করিয়া তাহাকে বিশেষভাবে সান্ত্বনা দিয়া বলিল—"ভগবান আমাদিগের দণ্ড করিয়াও তাঁহার আর এক জন অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষীর আশা পূর্ণ করিবেন ইচ্ছা করিয়াছেন, তাই এই ব্যবস্থা করিয়াছেন। পুনরায় যেদিন প্রয়োজন বুঝিবেন,

পারিলেন না! ইহাতেই মনে হয় রামগতির সঙ্গে সঙ্গে তাহার টপ্পাও সদ্‌গতি লাভ করিয়াছে। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া যাহার অমৃত নিঃস্যন্দিনী বাণী বঙ্গীয় সমাজের প্রতি সুখ উৎপাদন করিল তাহা সংগ্রহ করিবার প্রবৃত্তি কাহারই হইল না। কি দুর্ভাগ্য!

আমরা বহু দিনের চেষ্টায় ৪টী ভগ্ন পদ ও ৩টী টপ্পা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি, আজ তদ্বারাই কবির পরলোক গত আত্মার তর্পণ করিতেছি। প্রথমতঃ ভগ্ন পদ গুলিই উল্লেখ করা যাক।

এক স্থানে প্রতিপক্ষের সরকার নিজে উগ্রসেন হইয়া রামগতিকে কৃষ্ণ বানাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল 'কৃষ্ণ, তোমার যদুবংশীয় ও বৃষ্ণিক বংশীয় এতগুলি বীর থাকিতে সুভদ্রাকে অর্জ্জুন বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া নিল, ইহা কলঙ্কের কথা নহে কি'? রাম গতি কৃষ্ণ হইয়া তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল—

স্বয়ং বরকে না চিনিলে কিসে হয় তার স্বয়ম্বর ?
উগ্রসেন ঠাকুর দাদা এই তোমায় সাদা কথায় দি' উত্তর।

সুভদ্রার স্বয়ম্বর ঘোষিত হইয়াছিল এবং অর্জ্জুন যখন প্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষত্রিয় রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধে বিব্রত, তখন সুভদ্রা স্বয়ং অশ্বের বল্‌গা ধারণ পূর্ব্বক অর্জ্জুনের সারথ্য করিয়া ছিলেন। সুতরাং স্বয়ং বরকে চেনার প্রমাণ উজ্জ্বল হইয়াই রহিয়াছে। কবি কি কৌশলে অনুপ্রাশের ছটায় তাহা বুঝাইতে সমর্থ হইয়াছিল দেখুন! কবি কথিত 'সাদা কথায় দি' উত্তর' কথাটার ও সার্থকতা আছে। অর্থাৎ উহা এত সহজ প্রশ্ন যে এক কথাতেই উত্তর হইল, প্রতিপক্ষের এ কথার পর আর কোন কথা কহিবার অবসর রহিল না। তাহার কথার পুঁজি ফুরাইয়া গেল। উগ্রসেন কংসের পিতা, সুতরাং কৃষ্ণের মাতামহ।

চান্দুরার শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন গোস্বামী একজন সুরসিক লোক, তিনি একবার আড়ালে থাকিয়া প্রতিপক্ষের সরকারের পক্ষাবলম্বন করিয়া রামগতির বিপক্ষ আচরণ করিতে ছিলেন, রামগতি ইহা জানিতে পারিয়া বলিয়াছিলেন ছিটা গুলি মারতে পারি ব্রহ্ম হত্যার আছে ভয়।

শ্রীযুক্ত বিজয়নারায়ণ আচার্য্য প্রথমে মোক্তারী ব্যবসায় আরম্ভ করেন। পরে কবির ব্যবসায়ে প্রবর্ত্ত হন। শুনিয়াছি তিনি রামু-রামগতির আক্রমণে অনেক সময় কাঁদিয়া আসর হইতে বাহির হইয়া যাইতেন। * তাহার সঙ্গে বহু কাল উহাদের সঙ্গীত যুদ্ধ হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস তিনি যদি উহাদের সঙ্গীত সংগ্রহে মনোযোগী হয়েন তবে রামু-রামগতি কি অলৌকিক শক্তি লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল ভবিষ্যত বংশীয়েরাও তাহা অবগত হইতে পারে। ব্যবসায়ের দিক দিয়া তখন অবশ্যই প্রতি যোগীতা ছিল এবং তাহাদের হাড় জ্বালান কথায় রাগ দ্বেষও জন্মিয়াছিল কিন্তু এখন সেই সব তিরস্কার কে তিনি অঙ্গের ভূষণ করিয়া লইলে বঙ্গের কাব্যামোদী লোক দিগের ধন্যবাদ ভাজন হইতে পারেন। তাহার সঙ্গে সেই সমস্ত টপ্পার মাত্র দুইটী ভগ্ন পদ আমাদের হস্ত গত হইয়াছে। একটী—

শুনিলাম আচার্য্য বিজয়, তুমি করলে বাংলা জয়,
হুতুমপুড়ে খেলে পরে পেঁচকেরে করতে জয়।

বিজয় আচার্য্যের বাড়ী বাংলা গ্রামে। কর্‌লে বাংলা জয় কথায় বুঝাইয়াছে শুধু নিজ বাংলা গ্রামেই তুমি কবিমন্য, এখনও গ্রামের বাহির হও নাই। হুতুম পুড়ে খেলে পরে পেঁচকেরে করতে জয় কথায় কণ্ঠ স্বরকে নিন্দাকরা হইয়াছে। ভগ্নপদ অংশটী মোক্তারীতে হ'য়ে ফেল মুছে দিয়ে কেরাচিনের তেল।

উহাতে আরও অনেক রসাল কথা ছিল, দুঃখের বিষয় সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। ভগ্নপদ এই চারিটী। সম্পূর্ণ টপ্পা ৩টী এই—

(১)

বঙ্গ চূড়া এই চান্দুরা
বর্ণিবার আমার সাধ্য কি ?
আমি শুনেছি শাস্ত্রের উক্তি
গুরুতে রয় যার ভক্তি
তারে করেন মুক্তি সেই কমলাখি।
আমি সভার মাঝে হেরিতেছি
সারি সারি নারায়ণ,
বৃন্দাবন গোস্বামীর বাড়ী
তেমনি বৃন্দাবন।

* শেকের গাঁতি নিবাসী এক অশিতি পর বৃদ্ধের নিকট এই সংবাদটী পাইয়াছি।

মাঝ খানেতে অধ্যাপক
চা'রি দিকে বসে পাঠক
শাস্ত্র সব করেন অধ্যয়ন
যেমন কৃষ্ণচন্দ্র লীলা করেন
সঙ্গে লয়ে ভক্তগণ,
বৃন্দাবন গোস্বামীর বাড়ী
তেমনি বৃন্দাবন।

চান্দুরা নিবাসী স্বর্গীয় বৃন্দাবন চন্দ্র গোস্বামীর বাড়ী তাঁহার জামাতা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র তর্কালঙ্কারের চতুষ্পাঠীতে সরস্বতী পূজা উপলক্ষে রামগতি এই টপ্পাটী রচনা করিয়াছিল। রামগতি সম্ভবত বা ঐ গোস্বামী প্রভুদেরই মন্ত্র শিষ্য ছিল। তাহাতেই এই ভক্তি রসের প্রাবল্য। 'বৃন্দাবন গোস্বামীর বাড়ী তেমনি বৃন্দাবন' পদটীতে কি সুন্দর মাধুর্য্য প্রকাশ পাইয়াছে। "যেমন কৃষ্ণচন্দ্র লীলা করেন সঙ্গে লয়ে ভক্তগণ" এই পদটীতে অধ্যাপক কৃষ্ণচন্দ্রকেও ইঙ্গিত করিয়াছে। নিরক্ষর কবির এই অর্থালঙ্কার জ্ঞান কোথা হইতে জন্মিল? বিস্ময়ের বিষয় নহে কি? ঐ পদে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার প্রকাশ পাইয়াছে অর্থাৎ এক বস্তুতে অন্য বস্তুর সম্ভাবনা। ঐ এক কৃষ্ণচন্দ্রেই অধ্যাপক কৃষ্ণচন্দ্রকেও বুঝাইয়াছে

(২)

নায়েব মশাই চৌধুরী বাবুজী
বলি সুখ্যাতি,
তিনি ছিলেন চৌধুরী
হ'লেন মজুমদার,
বর্ণনাকি করবে আর
লেংড়া রামগতি।
তিনি শ্বশুর বাড়ী গাই পেয়েছেন
শিং ভাঙ্গা তার চোক কাণা,
লোকেতে শাশুইরা ব'লে
করে ঘোষণা।
যেমন আত্মতত্ত্ব পাসুরিয়া
রাম হয়েছেন শাশুরিয়া
জানেন দশ জনা,
তেমনি চৌধ্‌রী বাবু খাস করেছেন
* * * * মাল খানা,
লোকেতে শাশুইরা ব'লে
করে ঘোষণা।

অষ্ঠার বাড়ীর জমিদার ৺ মহিমচন্দ্র রায় মহাশয়ের শ্বশুরের প্ররোচনা মতে তাঁহার নায়েবকে লক্ষ্য করিয়া রামগতি এই টপ্পা রচনা করে। টপ্পার ভাব সহজেই বুঝা যায়, তবে 'শ্বশুর বাড়ী গাই পেয়েছন' কথাটায় একটু সামাজিক ইতিহাস লুক্কায়িত আছে। পূর্ব্বে কোন ২ সমাজে বিবাহের পর নব জামাতাকে গাভী উপঢৌকন দেওয়ার রীতি ছিল। তাহারই সাহায্যে ঐ স্থলে শাশুড়ীকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। 'চোখকাণা' কথাটাও অত্যুক্তি না হইতে পারে। শুনিয়াছি ঐ দিন রামগতি পায় কাঁটা ফুটিয়াছিল, তজ্জন্যই লেংড়া রামগতি পদের সৃষ্টি। অতঃপর নায়েবের প্ররোচনায় মহিম বাবুর শ্বশুরকে ব্যঙ্গ করিয়া সে যে টপ্পা দিয়া ছিল তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

(৩)

মহারাজের শ্বশুর বলে আজ
বলতে করি ভয়।
দেখলাম সভায় বসে মনের হরিষে
নৃত্য গীতের প্রেম রসে মত্ত অতিশয়।
করেন শশি মণির বদন চে'য়ে
চক্ষে চক্ষে ইসারা,
দান করলো শশি মণি তোর
পাক্‌না জাম্বুরা।
দেখে তোমার চাঁদ বদন
কেমন কেমন করে মন
যায় না পাসরা,
আমি একলা ঘরে শুয়ে থাকি
বালিশ টানি রাত ভরা
দান করলো শশি মণি * তোর
পাক্‌না জাম্বুরা।

শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, কবিভূষণ।

আলোচনা।

যোগী জাতি।

অনেক দিন হইতে সংবাদ পত্রাদিতে যোগীজাতি সম্বন্ধে নানাপ্রকার আলোচনা হইতেছে। যোগী শব্দে যোগ অভ্যাসকারী বুঝায়। অনেক সাধক বা সিদ্ধপুরুষ 'নাথ' উপাধি গ্রহণ করিয়া থাকেন। হিন্দু সমাজে ও সাধক ও সিদ্ধ পুরুষগণের শবদেহের সচরাচর সমাধি হইয়া থাকে। যোগীজাতির উপাধি নাথ; ইহাদের মধ্যে পূর্ব্বে শবদেহ সমাধি করার প্রথা প্রচলিত ছিল। এই সকল কারণে সহজেই মনে হয়, ইঁহারা পূর্ব্বে কোন সাধক সম্প্রদায় ছিলেন। শুনা যায় যে গোরক্ষনাথ, মীননাথ প্রভৃতি সিদ্ধ পুরুষগণ এই সম্প্রদায় মধ্যেই জন্মগ্রহণ করিয়া ছিলেন! অদ্যাপি এ অঞ্চলে রামায়ণ কীর্ত্তনের ন্যায় গোরক্ষনাথ প্রভৃতি সাধুগণের কার্য্যাবলীর কীর্ত্তন হইয়া থাকে। পণ্ডিতবর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই সম্প্রদায়কে বৌদ্ধ ধর্ম্মের একটি শাখার অন্তর্গত বলিয়া মনে করেন।

যোগীজাতি ধর্ম্মচর্চ্চা হারাইয়া অধঃপতিত হওয়ার পরে ন্যূনাধিক শত বৎসর মধ্যে হিন্দু সমাজে প্রবেশ করিয়াছে। ইহারা শবদেহের সমাধির পরিবর্ত্তে দাহ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, একথা ৬০।৬৫ বৎসর পূর্ব্বেও অনেক প্রত্যক্ষ দর্শীর মুখে শুনা গিয়াছে। এখনও অনেক স্থানে সমাধি প্রথা প্রচলিত আছে।

বঙ্গদেশে সেন বংশীয় রাজগণের আগমনের পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্মই প্রবল ছিল। উক্ত বংশের আগমনের পরেও এদেশে ব্রাহ্মণের সংখ্যা অতি সামান্যই ছিল। ইহার পর মোসলমান বিজেতৃগণ তরবারি হস্তে আসিয়া প্রথমে বিহার ও তৎপরে পশ্চিম বাঙ্গালার বৌদ্ধ মঠ গুলির উচ্ছেদ সাধন করেন। উক্ত ধর্ম্মের গ্রন্থগুলি মঠেই রক্ষিত হইত; সে গুলি ভস্মীভূত হইল। সন্ন্যাসিগণের অধিকাংশ নিহত হইলেন; অল্প সংখ্যক প্রাণভয়ে নেপাল প্রভৃতি দেশে পলায়ন করিয়া জীবন রক্ষা করিলেন। ধর্ম্মগ্রন্থ গুলির অভাবে এ দেশে উক্ত ধর্ম্মের শিক্ষা বিলুপ্ত হইল এবং সন্ন্যাসিগণের বিনাশে শিক্ষাদানের লোকও কেহ রহিল না। কাজেই এদেশে ক্রমে ক্রমে বৌদ্ধধর্ম্মের বিলোপ ঘটিল। যাঁহারা বৌদ্ধ ছিলেন, তাঁহাদের বংশধরগণের কেহ সাম্যবাদী মোসলমান সমাজে, কেহ বা বৈষম্যবাদী হিন্দু সমাজে প্রবেশ করিল।

যোগী সম্প্রদায় বহুকাল আপনাদের স্বতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া আসিতে ছিলেন। ক্রমে ইঁহারা একটি একটি করিয়া হিন্দু আচার গ্রহণ পূর্ব্বক ধীরে ধীরে হিন্দু সমাজে মিশিয়া গিয়াছেন। ইঁহারা কেন যে সাম্যমূলক ইসলাম ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া হিন্দু সমাজের একটি জাতির সংখ্যা বৃদ্ধি করিলেন, তাহার কারণ নির্ণয় করা কঠিন। সহস্র বৎসর পূর্ব্বে দক্ষিণ ভারতে বহু জাতির আধার হিন্দুধর্ম্ম, জাতি ভেদের প্রকোপ রহিত সাম্যবাদী বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মকে পরাজিত করিয়া তথায় জাতিভেদের বন্ধন ও প্রকোপ আরো বাড়াইয়া দিয়াছে। কিন্তু এই ধর্ম্ম ভারতের কোথাও ইসলামকে পরাজিত করিতে পারে নাই। এ অবস্থায় যোগীজাতির হিন্দু সমাজে প্রবেশের কারণ কেহ বুঝাইয়া দিতে পারিলে ভাল হয়।

হিন্দু সমাজে শ্রেষ্ঠ জাতি নিকৃষ্ট জাতির অন্ন গ্রহণ করে না। ইহা হইতে এদেশে সাধারণের সংস্কার এই যে, যে জাতি অন্য জাতির অন্ন গ্রহণ করে না, সে জাতি শ্রেষ্ঠ; এবং যে জাতি অন্যের অন্ন খায়, তাহারা নিকৃষ্ট; খৃষ্টীয়ান সকল জাতির ভাত খায়, তাহারা সকলের ছোট। হিন্দু সমাজের কোন্ কোন আচার অনেক উৎকৃষ্ট। এই সকল কারণে যোগীজাতি হিন্দু সমাজে প্রবেশ করিয়াছে কিনা, তাহা সাধারণের বিচারার্থ উপস্থিত করিলাম।

শ্রীতারিণীকান্ত মজুমদার।

সাহিত্য সংবাদ।

কালীপুরের স্বর্গীয় জমিদার ভারতভ্রমণ গ্রন্থ প্রণেতা ধরনীকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী মহাশয়ের "জাম্বু বা কাশ্মীর ভ্রমণ গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য দুই টাকা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

সৌরভ

একাদশ বর্ষ। | ময়মনসিংহ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০ সন। | পঞ্চম সংখ্যা।

গবর্ণমেণ্টের ঋণ ও ভারতের অর্থ নৈতিক সমস্যা।

ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের অবসানে প্রায় সমস্ত গবর্ণমেণ্টেরই অতিরিক্ত ব্যয় বাহুল্য দরুণ যথেষ্ট ঋণ দাঁড়াইয়াছে। সেই ঋণের মাত্রাতিরিক্ত চাপ সহ্য করিতে না পারিয়াই ইদানিং বর্ত্তমান জার্ম্মাণীর ঘোরতর অর্থ নৈতিক সমস্যা উপস্থিত। এই বিষয় সম্বন্ধে কতক পরিমাণে আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছি।

ঋণ করার অর্থ এই নয় যে শুধু কতকগুলি মুদ্রাই ধার করা হইল। মুদ্রা উপলক্ষমাত্র। মুদ্রা নিজে আমাদের কোনও অভাব দূর করিতে পারে না: উহা আমাদের অভাব নিবৃত্তির উপযোগী জিনিসগুলি সরবরাহ করিয়া দেয় মাত্র। আমি একটা জিনিস দিতে পারি বলিয়া সমাজে সেই জিনিসের পরিবর্ত্তে আর একটা কিছুর দাবী করিতে পারি। মুদ্রা এই দাবী পূরণের মধ্যস্থ সাক্ষিগোপাল।

ঠিক এই প্রকার—ঋণ যখন করা হয়, তখন বুঝিতে হইবে যে, আপাততঃ আমার এমন কতকগুলি অভাব উপস্থিত হইয়াছে যে সেইগুলি পূরণ করিতে হইলে অন্যের নিকট হইতে আমার বর্ত্তমান ক্ষমতার অতিরিক্ত কতগুলি জিনিস গ্রহণ করিতে হইবে। ইহার পর, যখন আমার উপস্থিত অভাব পূরণ হইবে, তখন সঙ্কোচ-সাপেক্ষ অভাবগুলির সঙ্কোচ সাধন করিয়া ঋণ পরিশোধ করিব। সুতরাং এই যে আদান প্রদান, তাহা কতকগুলি চিহ্নাঙ্কিত মুদ্রার নহে, কতকগুলি জিনিসের। এই বিষয়টাই আমাদের বিশেষ বুঝিতে হইবে।

আমাদের প্রকৃত অর্থ নৈতিক সমস্যার উদ্ভব হইবে তখনই, যখনই আমরা দেখিতে পাইব যে গবর্ণমেণ্টকৃত ঋণ পরিশোধ করিবার কোনও সঙ্কোচ-সাপেক্ষ অভাব গবর্ণমেণ্টের সঙ্কোচ করিবার নাই। এরূপ অবস্থা ঘটিলেই গবর্ণমেণ্ট বিব্রত হইয়া পড়ে। তখন উপায়হীন হইয়া গবর্ণমেণ্ট অগত্যা কাগজমুদ্রা চালাইতে আরম্ভ করে। ব্যাপার যখন এইরূপ দাঁড়ায়, তখন রাজ্যের চলিত মুদ্রার মূল্য যথেষ্ট কমিয়া যায়; কারণ যে স্বর্ণ, মুদ্রার পরিমাপ—স্বর্ণমূল্যের বহুবর্ষব্যাপী তারতম্য না হওয়ার দরুণ এবং স্বর্ণের প্রায় অবিনশ্বরত্ব শক্তির প্রভাবে রাজ্যের মুদ্রাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া রাখে, তাহা এই অবস্থায় একপ্রকার লোপ পায়। এবং চলিত মূল্যহীন কাগজের তাড়নায় দেশের প্রায় সমস্ত স্বর্ণমুদ্রা দেশ হইতে বাহির হইয়া যায়। ফলে উত্তরোত্তর স্বর্ণমুদ্রার অভাবে ও কাগজ মুদ্রার ক্রম বিবর্দ্ধমান প্রভাবে মুদ্রার মূল্য যথেষ্ট কমিয়া যায়, এবং সঙ্গে সঙ্গে গবর্ণমেণ্টের বাজার সম্ভ্রমও (market credit) যথেষ্ট কমিয়া যায়।

এই প্রকার অবস্থা আধুনিক প্রায় অনেক গবর্ণমেণ্টেরই হইয়াছে। বিলাতের গবর্ণমেণ্টের ঋণের পরিমাণ এখন আটশত কোটী পাউণ্ড অর্থাৎ একশত কুড়ি হাজার কোটী টাকা; তন্মধ্যে খুব বিশেষ ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া সেখানকার গবর্ণমেণ্ট মাত্র কিঞ্চিদূর্দ্ধ দশকোটী পাউণ্ড অর্থাৎ একশত একান্ন কোটী টাকা গত বৎসর শোধ করিয়াছেন। ইহাতেই বুঝা যায় যে স্বীয় রাজ্যসম্পদের ক্ষমতার অতিরিক্ত ঋণ ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের করিতে হইয়াছিল। ব্যয় সংক্ষেপ করিয়াও যে হারে ঋণশোধ দিতে

কে ?

আজ মরমে মরমে কাহার রাগিনী
ফুটিয়ে উঠিছে গো !
হৃদয়ে কাহার প্রেমের লহরী
নীরবে ছুটিছে গো !
সুখ ও শান্তি কাহার হাতে,
প্রেম ও প্রণয় কাহার সাথে,
কাহার বাসনা "মাধবী" হইয়ে
হৃদয়ে লুটিছে গো ?
আজ মরমে মরমে কাহার রাগিণী
ফুটিয়ে উঠিছে গো ?

কে মোর নয়নে প্রভাত স্বপন,
জীবন যৌবনে ফুল্ল কুসুম,
কাহার 'পলাশ-পারুল" হাসিটী
নীরবে ফুটিছে গো !
কাহার অঙ্গ শিশিরের হার,
কাহার হৃদয় প্রেম পারাবার,
কার অনুরাগ "ভীমী" হইয়ে
পরাণে মিশিছে গো !
আজ মরমে মরমে কাহার রাগিণী
ফুটিয়ে উঠিছে গো !

গৃহের দীপটী বল কে জ্বালে ?
শান্তি মধুর সায়ান কালে,
কার মুখ খানি প্রেম আলো আঁখি
আঁধার টুটীছে গো।
আজ মরমে মরমে কাহার রাগিণী
ফুটিয়ে উঠিছে গো !

শ্রীজগদীশচন্দ্র রায় গুপ্ত।

স্মৃতির আরতি।

সেকালের উচ্ছৃঙ্খল চিত্র।

প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বের কথা বলিতেছি। এই সহরের নৈতিক অবস্থা তখন অত্যন্ত কলুষিত ছিল। সে কালের তুলনায় বর্ত্তমান কালের যুবক ও প্রৌঢ় দিগের অবস্থা অনেক উন্নত। আমরা যে সময় এখানে প্রথম আসিয়াছিলাম। তখন ভদ্রলোকগণের মদ খাওয়া একটা সাধারণ রোগ ছিল। স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়রা যে ধারায় সুরা পান করিতেন বলিয়া তাঁহার আত্ম জীবন চরিতে উল্লেখ করিয়াছেন, এ ধারা তেমন নহে, এ অত্যন্ত হীন, নিকৃষ্ট ধারা। এ মদ খোলা ভাটীর বাঙ্গলা মদ। ইহার সহিত আরও অনেক আনুসঙ্গিক উপকরণ জড়িত থাকিত। ফলে আমরা দেখিয়াছি, প্রায় প্রতি বাসাই 'বাও ও বাঘীর" রোগীতে পূর্ণ। বর্ত্তমানে এই ব্যাধিটী একটী অত্যন্ত লজ্জা জনক ব্যারাম বলিয়া ভদ্র সমাজ হইতে বিতাড়িত হইয়াছে। সেকালে এই ব্যারামের নাম ছিল সিভিলিয়ানের ব্যারাম।

এস্থলে আমি পাঠকদিগকে এই বিভৎস্য ব্যারামের কথাই কেবল বলিব না, এই কলুষ ব্যাধি যে যে সমাজকে কি প্রকার সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিল এবং সেই সন্ত্রস্ত ভাব হইতে যে কিছুকিছু সাহিত্যও গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহাই বিবৃত করিব।

তখন এই সহরের উরে, শিরে, বক্ষে সর্ব্বত্র বেশ্যাবাড়ী ছিল। সহরের অধিকাংশ পরিণত বয়স্ক যুবকেরা এবং প্রৌঢ়েরা সেই সকল পতিতালয়ে নিসা যাপন করিতেন। যে সকল বাসার কর্ত্তাদিগেরও স্বভাব উচ্ছৃঙ্খল ছিল, তাঁহারা নিজ বাসাতেই চাঁদেরহাট জমাইয়া বসিতেন. বাসার স্কুলের ছেলেরা লজ্জায় মরিয়া যাইত ; কর্ত্তাদের কিন্তু ইহাতে লজ্জা বোধ হইত না।

স্বর্গীয় শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের আত্ম জীবনীতে পড়িয়াছিলাম, সেকালে কোন একটি ভদ্র লোক অন্য একটি ভদ্র লোককে বন্ধুর নিকট পরিচয় করিয়া দিতে যাইয়া বলিতেছেন "উনি ইহার এক রক্ষিতাকে একখান পাকা কোঠা করিয়া দিয়াছেন।" এই

ভাবটি তখনকার বৃটীশ রাজধানী কলিকাতার যেমন গর্ব্বের বিষয় ছিল, মোগল রাজধানী ঢাকাতেও তখন এরূপ একটা ভাব খুব গর্ব্বের বিষয় ছিল। ঢাকাতে তখন যাহার একটি রক্ষিতার অভাব ছিল, এবং একটা বৈঠকখানা ছিল না, সে ঢাকার সমাজে মানুষ বলিয়া গণ্য হইত না। সুতরাং ক্ষুদ্র ময়মনসিংহ সহরের ভদ্রলোকদের এই আচরণ লজ্জার বিষয় হইবে না। ইহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি?

আজকাল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মৃতিসভায় গেলেই ছেলেদের প্রবন্ধে ও বক্তৃতায় এই একটি কথা অত্যন্ত জোড়ের সহিত কর্ণে প্রতিধ্বনিত হয় যে বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বহস্তে রান্না করিয়া মসল্লা পিসিয়া থাকিয়া বিদ্যালয়ে পাঠ করিতেন! ইহা আজকালকার ননিগোপাল সদৃশ কোমল নাম যুক্ত অলস প্রকৃতির বালকদের নিকট নিতান্ত আশ্চার্য্যের বিষয় হইলেও সে কালের ঈশ্বরচন্দ্র, জগবন্ধু প্রভৃতি সদৃশ কঠোর নাম যুক্ত কর্ত্তব্যপরায়ন ছেলেদের নিকট একটুকুও আশ্চর্য্যের বিষয় ছিল না। তখন সহরে বাবুরা গোপনে বেশ্যা গৃহে আহার করিলেও প্রকাশ্যে ঠাকুর চাকরের হাতের রান্না খাইতেন না, পরিবার রাখিবারও তখন প্রথা ছিল না। সুতরাং প্রায় সকল বাসাতেই এক কর্ত্তা ব্যতীত আর সকলকেই পালা ক্রমে রান্না করিতে হইত। বাসার ছাত্র দিগের আত্মীয় অভিভাবকদিগের এইরূপ অদর্শন হেতু ছাত্রদিগের শাসনের ভারও তখন বাসার "ভাণ্ডারি পুতি"দের হাতে ছিল। এরূপ অবস্থায় মসল্লাওয়ে সময় সময় না পিষিতে হইত তেমন নহে। আজ কালের ননি.মাখন,সচিন-নবীন প্রভৃতি কোমল নামযুক্ত ছেলেরা রাঁধিয়া খাইবেন দূরে থাক উনুনের নিকট বসিলেন উত্তাপে উনাইয়া যান; সুতরাং তাহাদের সহিত সেকালের বল-ভদ্র গদাধর, গঙ্গারাম ঈশ্বর চন্দ্র প্রভৃতি কঠোর নাম যুক্ত দৃঢ় কর্ম্মী ছেলেদের তুলনাই হইতে পারে না। ছেলেদের নামের কেমলতা ক্রমেই তাহাদের মনকে এবং সঙ্গে সঙ্গে দেহকে ও বীর্য্যকে কেমল করিতেছে—দেহতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণের এ যুক্তি অগ্রাহ্য করিবার নহে।

মোটকথা, ধনীর ছেলেদের এবং কর্ত্তার আদুরে দুই একটি পোষ্য ব্যতীত আর সকল ব্যক্তিকেই তখন পালা ক্রমে রান্না করিয়া খাইতে হইত। রান্না হইলে ভাণ্ডারি ঘণ্টার ধ্বনি করিত; এই ঘণ্টার শব্দ শুনিয়া বাসার নিকট বর্ত্তী পতিতালয় গুলি হইতে আসিয়া বাবুরা চুপে চুপে আহার করিয়া যাইতেন। কর্ত্তার আহার্য্য তাঁহার নিজ শয়ন গৃহে যাইত।

এইরূপ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া ছেলেরা যে কিরূপ প্রকৃতি গঠন করিয়া লইতে পারিত; সে চিন্তা একবার পাঠকগণ করিবেন।

ফলে সে সময় অনেক কিশোর বয়স্ক বালক মুখে গন্ধ মাখাইয়া মাতলামির ভান করিত এবং অনেক ধাড়ী ছেলে প্রকৃত পক্ষেই মদ খাইয়া স্কুল কামাই করিত। আমাদের বাসার চারিদিকের আমলা, হাকিম, মোক্তার, উকীল প্রভৃতির আচরণে আমরা ইহা প্রতি দিন লক্ষ্য করিয়াছি।

এইরূপ শোচনীয় অবস্থা যে কেবল সাধারণ আমলা, হাকিম, উকিল, মোক্তারদেরই ছিল তাহা নহে; শুনিয়াছি বড় বড় সাহিত্যিকগণও মজলিস করিয়া সেকালে সুরাধুনীর আরাধণা করিতেন, এবং বহু অনভ্যস্থ লোককে অনুরোধে ঢোক গিলাইয়া দলবৃদ্ধি করিতেন।

মনস্বী কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের ভবনে এরূপ মজলিস হইত। এই মজলিসের প্রাভাব অতিক্রম করিতে না পারিয়া এক দিন ঘোষ বাহাদুরকে সভ্যই ঢেকি গিলিতে হইয়াছিল:

এই সহরের স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র আচার্য্য চৌধুরি মহাশয় একজন সাহিত্য সেবী ছিলেন। তাঁহার গৃহের মজলিস এই সহরের বিখ্যাত মজলিস ছিল কবিবর গোবিন্দচন্দ্র দাসের মত বিবেকবান লোকও কেশব বাবুর অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। তিনি স্বমুখে আমাদিগের নিকট তাহা প্রকাশ করিয়া সেজন্য প্রায়শ্চিত্ত করিয়া গিয়াছেন।

কেশব বাবুর মজলিসে এই সহরের সাহিত্যরস পীপাসুগণ এবং নানা শ্রেণীর সম্ভ্রান্ত লোকগণ সম্মিলিত হইতেন। সম্মিলনে যে শ্রেণীর রসপীপাসুদিগের সংখ্যাধিক্য হইত, মজলিসের আলোচনার গতি সেই দিকে পরিচালিত হইত।

স্বর্গীয় অমরচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি,জেলা স্কুলের হেড্‌মাষ্টার, উমাচরণ বাবু, স্কুল বিভাগের ডিপুটি ইন্‌স্পেক্টর

বৈকুণ্ঠ বাবু প্রভৃতি কেশব বাবুর মজলিসে রীতিমত যোগদান করিতেন।

আমাদের এক পরম আত্মীয় ব্যক্তির নিকট শুনিয়াছি, তিনি একদিন তাঁহার এক বন্ধুর সহিত কোন এক কার্য্যে কেশব বাবুর নিকট গিয়াছিলেন, সেখানে কার্য্য শেষ হইতে হইতে তাহার নিজের মৌতাতের সময় পার হইয়া গেল, তখন তিনি ভয়ানক ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন। তাঁহার শরীর ভঙ্গি দীর্ঘ শ্বাস, চক্ষু ঢল্‌ ঢল্‌ ইত্যাদি লক্ষ্য করিয়া কেশব বাবু তাঁহাকে খুব অমায়িক ভাবে জিজ্ঞাসা করেন—ক্ষমা করিবেন, "মহাশয়ের কি আফিম্‌ অভ্যাস আছে?"

তিনি লজ্জিত ভাবে বলিলেন—"আজ্ঞা হাঁ মহারাজ"। কেশব বাবু অমনি বাক্স হইতে কৌটাটী খুলিয়া তাঁহার হাতে দিয়া বলিলেন—"নিন, আপনার যতখানি প্রয়োজন।"

তিনি সামান্য এক বিন্দু লইলে কেশব বাবু হাসিয়া কৌটাটী হাতে লইয়া প্রায় ১৫ দিনের পরিমাণ আফিম তাঁহাকে নিজ হাতে তুলিয়া দিলেন। এবং প্রতি দিন বিকালে তাঁহার নিকট আসিতে অনুরোধ করিয়া দিলেন। কেশব বাবুর বৈঠকে চব্য, চূষ্য লেহ্য পেয় পদার্থের বন্দোবস্ত থাকিত। বেগুনবাড়ীর সরু চিঁড়া, বগুড়ার হাটের ইক্ষুগুড়, তাঁহার নিজের বাগানের সাতাভোগ কলা, ও ডাব, মুক্তাগাছার মণ্ডা, কাশীর পেরা, বাটি ভরা দুগ্ধ। এরূপ প্রলোভন কজন ছাড়িতে পারে?

দিনের দুর্য্যোগে যে দিন লোক কম হইত বা একেবারেই না হইত, সেদিন কেশব বাবু প্যাদা পাঠাইয়া লোক সংগ্রহ করিয়া এই ভক্ষ্য ভোজ্যের সদ্ব্যবহার করিতেন। তাঁহার সম্মুখে বসিয়া যাঁহারা কারণ পান করিতেন, তাহারা নাকি স্বীয় স্বীয় করপল্লবের আবরণে পাত্রটী ঢাকিয়া রাখিয়া তাঁহাকে প্রচুর সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহা গলাধঃ করিতেন। তামাক খাইবার বেলাও বাহির হইয়া গিয়া তামাক টানিতেন।

উচ্ছৃঙ্খলতায় সেকালের যুবকেরা সময়োপযোগী উচ্ছৃঙ্খল থাকিলেও বয়োবৃদ্ধ ও সম্মানীতব্যক্তির প্রতি আদবকায়দা প্রদর্শনে তাহারা হীনছিল না। এ হিসাবে এখনকার যুবকেরা অত্যন্ত হীন। তাহারা মদ খায় না বটে কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই চুরট ফুঁকিয়া মুখের পুঞ্জীভূত ধূম বৃদ্ধ পথিকের মুখের উপর ছাড়িয়া তাহাকে বিপন্ন করিতে অনুমাত্র শঙ্কাবোধ করে না।

দেশের আব্‌ হাওয়া এইরূপে দূষিত হইয়া যখন 'বাও ও বাগির' ব্যারামে বাঙ্গালার সহরগুলি ব্যাপ্ত হইয়া গিয়া পল্লিগুলি পর্য্যন্ত আক্রমণ করিল, তখন বেশ্যা দমনের জন্য বাঙ্গলার গবর্ণমেণ্ট একটা আইন করিতে বাধ্য হইলেন। এই আইন তখন 'দশ আইন' নামে পরিচিত হইয়াছিল। আইনের ব্যাখ্যা আমি করিব না। এই আইন পাস হইলে এ জেলার কি উপকার হইয়াছিল, জানি না। কিন্তু এই উপলক্ষে এই সহরের জনৈক রসিক কবি যে একখানা কাব্য পুস্তিকা রচনা করিয়াছিলেন, সাহিত্য স্মৃতির আলোচনায় তাহা অমূল্য বলিয়া মনে করি।

পুস্তক খানার নামছিল 'অবিদ্যার দশ আইন।' লেখকের নাম অপ্রকাশ। গ্রন্থখানা আমরা দেখিনাই; মুখে মুখে ইহার যতটা শুনিয়া স্মরণ রাখিতে পারিয়াছিলাম, এখনও তাহাই স্মৃতিতে জাগিতেছে, তাহাই এখানে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিলাম।

পুস্তিকার প্রারম্ভ ভাগ গদ্য। তাহা এইরূপ—

"একদিন অপরাহ্নে প্রিয়বন্ধু সংজ্ঞানকে সহচর করিয়া ব্রহ্মপুত্র তটে বিচরণ করিতেছি, ইতিমধ্যে দক্ষিণাস্য হইয়া দেখিলাম, রাজবর্ত্মের সমীপবর্ত্তী বটমূলে পিঙ্গলকেশী বক্রদন্ত কোটরাক্ষী একটী রমণী বসিয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহাতে সে কহিল:—

দুঃখিনীর পরিচয়, শুন কহি সমুদয়,
শাস্ত্র নামে ছিল নৃপবর।
অভাগিণী তাঁর কন্যা, রূপেগুণে ধরা ধন্যা,
ধন্যা মান্যা জগত ভিতর।
সুবিদিত ধরাধামে, অভাগী অবিদ্যা নামে,
বিদ্যা নামে জ্যেষ্ঠা সহোদরা।
ইঁনিও সামান্যা নন, যার স্তুত কবিগণ,
আমার বিপক্ষ সদা তারা।
রঘুনাথ শিরোমণি, ভারতের শিরোমণি
যে করিল দিধীতি প্রকাশ।
ভারত বিখ্যাত বর, সুপণ্ডিত গদাধর
সে মোর করেছে সর্ব্বনাশ।

একটী আত্মপ্রচেষ্ট জাতির কথা।

অধীন দাস জাতির পক্ষে স্বাধীনতা যে সহজ-সাধ্য কল্পবৃক্ষের ফল নহে, তাহা আত্ম প্রচেষ্ট জাতি সমূহের নিকট অবিদিত নহে; তাই তাহারা সুখ নিদ্রা সম্ভোগের পর দিব্য প্রভাতে মৌতাতের চা পানের ন্যায় স্বরাজ পাইবার প্রত্যাশা কখনও করে না। এইরূপ সুখ সেব্য আরামের সঙ্গে সঙ্গে কোন এক নির্দ্দিষ্ট উষায় স্বরাজলাভের কল্পনা কেবল আমাদের ন্যায় নিশ্চেষ্ট জাতির মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়।

আজ আমরা এমন একটী স্বরাজ-কামী জাতির কথা বলিব, যে জাতি আরাম নিদ্রার অবসানেই—স্বরাজ লইয়া কোন মহাপুরুষ আসিয়া দ্বারে উপনীত হইবেন—কল্পনা করিয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে অপেক্ষা করিতেছে না। পরন্তু তাহাদের যুগ যুগ ব্যাপী চেষ্টার নিষ্ফল প্রয়াসের ভিতর দিয়াই তাহারা নিজকে মনুষ্যত্বের আসনে টানিয়া তুলিয়া বিশ্বের সম্মুখে তাহাদের দাবীকে দেদীপ্যমান করিয়া তুলিতেছে।

এই আত্ম প্রচেষ্ট জাতি প্রশান্ত মহাসাগরের বক্ষস্থিত ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসিগণ। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের আদিম অধিবাসী আইতা জাতির বাল্য জীবন নিউজিলেণ্ডের মাউরী জাতির বাল্যজীবনের ন্যায়ই প্রকৃতিগত ছিল। আদিম দ্বীপবাসীরা উলঙ্গ বিচরণ করিত, আম মাংস ভক্ষণ করিত; অগ্নির ব্যবহার জানিত না।

আইতা জাতি প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। তাগায়ণ ও বিষায়ণ। এই জাতির ভাষা যোজনান্তর প্রভেদ। প্রায় ২৫-৩০টী ক্ষুদ্র বৃহৎ দ্বীপ লইয়া বর্ত্তমান ফিলিপাইন দ্বীপ পুঞ্জ গঠিত এবং ইহার এক একটী দ্বীপের ভাষা অসংখ্য; এক লুজন দ্বীপের অধিবাসীদিগেরই এক কুড়িরও অধিক ভাষা। এক এক দলের এক এক স্বতন্ত্র ভাষা হইলেও এই সমস্ত ভাষারই মূল এক। ঐ মূল ভাষার নাম টাগালা বা গালা।

ইহাদের প্রাদেশিক ভাষাগুলি এত দুর্ব্বোধ যে এক দলের লোকের কথা অন্য দলের লোক বুঝিতে পারে না। এইজন্য ইহাদের দলও বিস্তর, দলপতিও বিস্তর। স্ব স্ব দলপতির কথা ইহারা অবনত মস্তকে গ্রাহ্য করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত বয়োবৃদ্ধের ইহারা অত্যন্ত সম্মান করিয়া থাকে।

ইহারা সর্ব্বাঙ্গে আলিপনার ন্যায় উল্কি পরিয়া থাকে।

এই জাতির মৃতদেহ সংকারের প্রথা অদ্ভুত। শব বাহীদিগকে আকাশ স্পর্শী চুড়া যুক্ত টুপি মস্তকে দিয়া সজ্জিত করিয়া দেওয়া হয়; তাহারা খচ্চরের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া মৃতের গাড়ী টানিয়া লইয়া যায়। সেই গাড়ীর পশ্চাতে ভিন্ন ভিন্ন গাড়ীতে মৃতের আত্মীয় স্বগণগণ অনুগমন করিয়া থাকে। শব দেহকে তাহারা প্রচুর সম্মান করিয়া থাকে।

মোরগ পোষা ও তাহা দ্বারা লড়াই করান এখানকার লোকের একটী মারাত্মক ব্যসন। এই ব্যসনে এই জাতির এত অর্থ ও শক্তি ব্যয়িত হয় যে তাহার তুলনাই নাই। আমাদের দেশে ঘোড় দৌড় বাজিতে কেবল বাতিকগ্রস্ত সহুরে লোক উচ্ছন্ন যায় কিন্তু ইহাদের এই ব্যসন দোষের ফলে গৃহে গৃহে হাহাকার উঠে। তথাপি তাহাদের ইহাতে নিবৃত্তি নাই। এই ব্যাপারের মোহের পরিচয় একটী কথাতেই দেওয়া যায় যে যদি কোন গৃহ অগ্নিসাৎ হয় সেই ভীষণ বিপদেও গৃহস্থ সর্ব্বাগ্রে তাহার মোরগের অনুসন্ধান করে; মোরগকে বিপদ মুক্ত করিয়া সে তাহার স্ত্রীপুত্র পরিবারের প্রতি মনোযোগ দেয়। সৌখিন সভ্যতার আশ্রয় পাইয়া এইরূপ ব্যসনে যে জাতি মজিয়া থাকে, তাহার উদ্ধার করিতে ভগবানও অগ্রসর হন না।

এই দ্বীপ সমূহে খুব ঘন ঘন ভূমিকম্প হয়। চীন সাগরের টাইফুন ঝড়ও দ্বীপ সমূহের প্রচুর ক্ষতি করিয়া থাকে। এই সকল ক্ষতির সহিত তুলনা করিয়া জনৈক ইংরেজ লেখক লিখিয়াছেন—মোরগের লড়াই এই জাতির যে ক্ষতি করিতেছে,

কিরূপে তৈরী করিতে হইবে; কোন্ কোন্ বিষয় অপেক্ষাকৃত কঠিন, কোন্ বিষয়ে সময় বেশী লাগিবে, মূল আলোচ্য বিষয় কি, কিসের উপর তাহাকে বেশী ঝোক দিতে হইবে। যখন তাহার কাজের এতটুকু বুঝিতে পারে তখন সে আর শিক্ষকের হাতে ছেলে খেলার জিনিষ নয়। সে বুঝে, সে মানুষ; তাঁর একটা পৃথক স্বত্ত্বা আছে; তাঁর ভিতর কর্ম্মের প্রেরণা আছে; তাঁর কাজের বিশেষত্ব আছে, দায়িত্ব আছে। এইজন্য যেমনি ছাত্র চুক্তিপত্র সই করে, অমনি তাহার কাজের জন্য নিজকে দায়ী মনে করে। তারপর সে আপন মনে আপন কাজ করিয়া যায়। তার মনের ভিতর স্বাধীন চিন্তাশক্তি আপনা হইতে ফুটিয়া উঠে। বাহির হইতে তার মনের উপর কেহ কোন চাপ দেয় না, কেবল নেহাত দরকার হইলে স্বেচ্ছায় শিক্ষকের সাহায্য গ্রহণ করে। সে কর্ম্মের ভিতর দিয়া নিজকে খুঁজিয়া লয়; নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করে; দিন দিন ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উন্মেষ সাধন করে।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, যদি ছাত্র শিক্ষকের নিকট স্বেচ্ছায় কিছুই জিজ্ঞাসা না করে, তবে কি শিক্ষক মহাশয়ের কোন কাজ থাকিবে না? তিনি কি অলসভাবে বসিয়া সময় কাটাইবেন? আমরা উত্তরে বলিব "না"। কারণ এখানে শিক্ষকের কাজ আরও গুরুতর, আরও বেশী দায়িত্ব পূর্ণ। শিক্ষকের বিদ্যা বুদ্ধি অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার এমন একটা মোহিনী শক্তি থাকা চাই, যেন তাহাকে দেখিবামাত্রই ছাত্রগণের মনে বলবতী অধ্যয়ন স্পৃহা ও অনুসন্ধিৎসা জাগিয়া উঠে। ছাত্রগণ কোন কিছু জিজ্ঞাসা করিলে শিক্ষক তৎক্ষণাৎ উত্তর দিবেন। এখানে ভাবনা চিন্তা করিয়া কোন কিছু বলিবার সময় নাই। কাজেই শিক্ষক মহাশয়কে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতে হয়। কেবল জ্ঞাতব্য কোন বিষয়ের সংবাদ সরবরাহ করা শিক্ষকের কর্ত্তব্য নহে। সহজে কোন্ বিষয় কিরূপে শিখা যায় তাহাও শিক্ষক বলিয়া দিবেন। যে সমস্ত যন্ত্র ও পুস্তকাদি ছাত্রদের কাজে লাগে, তাহাদের কোন্‌টী কিরূপে ব্যবহার করিলে বা পড়িলে ছাত্রগণের পরিশ্রমের লাঘব ও কাজের সুবিধা হয়, তাহা শিক্ষক দরকার হইলে বলিয়া দিবেন।

কিছুদিন হইল মিলিসেণ্ট মেকেঞ্জি টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডেল্‌টন শিক্ষা প্রণালী সম্বন্ধে অতি উপাদেয় বক্তৃতা দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন তিনি স্বয়ং পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিয়াছেন যে এই প্রণালী অনুসারে শিক্ষকগণের কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব বড়ই গুরুতর।

ডেল্‌টন প্রণালী অনুসারে প্রত্যহ ছাত্রগণের নাম ডাকার নিয়ম নাই। যে পথে ছাত্রগণ বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে, সেখানে কে কখন আসে, তাহা লিখিবার জন্য একটা কাগজ টানাইয়া রাখা হয়। ছাত্রগণ স্কুলে ঢুকিবার সময় নিজেরাই ঐ কাগজে কে কখন আসে তাহা লিখিয়া রাখে। যদি কেহ বিলম্বে আসে, তবে কত মিনিট বিলম্ব হইল, তাহাও লিখিতে হয়।

কোন্ সময়ে কোন্ কাজ করিতে হইবে তাহারও কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। অর্থাৎ এই প্রণালীর ভিতর দৈনিক কার্য্যতালিকা (Routine) বলিয়া কোন জিনিষ নাই। ৪৫ মিনিট পর পর শিক্ষকগণের শ্রেণী ও বিষয় পরিবর্ত্তন করার বিধি নাই। ছাত্রগণ নিজের সুবিধা অনুসারে সপ্তাহের কাজগুলি যে দিন ইচ্ছা সেই দিন করিতে পারে। কোন ছাত্র ইচ্ছা করিলে একমাস কেবল এক বিষয়ের চুক্তির কাজ শেষ করিয়া সেই বিষয় পরীক্ষা দিতে পারে? অথবা সে সকল বিষয় প্রত্যহ কিছু কিছু পড়িয়া এক সময়ে সব বিষয়ে পরীক্ষা দিতে পারে। প্রত্যেকেই এক মাসের কাজ শেষ করিয়া আর এক মাসের কাজের চুক্তি পত্র লিখিয়া দেয় যদি কেহ কোন অনিবার্য্য কারণে নির্দ্দিষ্ট কাজ শেষ করিতে না পারে, তবে তাহার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করা হয়। ভাল ছেলেরা তাড়াতাড়ি নির্দ্দিষ্ট কাজ শেষ করিয়া অনেক অতিরিক্ত কাজ করিতে পারে; কিংবা যে বিষয় তাহাদের খুব ভাল লাগে, সেই বিষয়ে মৌলিক গবেষণাও করিতে পারে। যাহারা তেমন ভাল ছেলে নয়, তাহারা ধীরে ধীরে আপন কাজ করিতে পারে। ইহাতে কোন আপত্তি নাই।

আবার কতকগুলি কাজের জন্য নির্দ্দিষ্ট সময় আছে। যেমন গীত বাদ্য, আবৃত্তি, ব্যায়াম প্রভৃতি। এগুলি সাধারণতঃ বৈকাল বেলায় হইয়া থাকে। মাঝে মাঝে ছাত্রগণ দল বাঁধিয়া যাদুঘর, প্রদর্শনী ওশ্বড় বড় কল কারখানা দেখিতে যায়।

প্রত্যেক কামরার ভিতর দেওয়ালের গায় একটা চার্ট (Chart) ঝুলান থাকে। প্রত্যেক গ্রেডের জন্য একটা চার্ট আছে, এই চার্ট দেখিলেই শিক্ষকগণ বুঝিতে পারেন—কোন্ গ্রেড্ কতটুকু কাজ করিয়াছে! কোন্ বালককে কতটুকু

সাহায্য করা দরকার। কেহ কেহ বলেন, প্রত্যেক কামরার ভিতর প্রত্যেক ছাত্রের কাজের মাত্রা বুঝিবার জন্য একটা গ্রাফ (Graph) থাকা দরকার। ইহার সাহায্যে প্রত্যেক ছাত্রের উন্নতি অবনতি বুঝিবার সুবিধা হয়। শিক্ষক যদি বুঝিতে পারেন—যে কোন ছাত্র পিছনে পড়িয়াছে। সে অগ্রসর হওয়ার পথ খুঁজিয়া পাইতেছে না, তখন তিনি তাহাকে সাহায্য করিতে পারেন।

ছাত্রগণ প্রায় ৯টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত সাজান কামরায় (Laboratory) বসিয়া কাজ করে। তারপর এক ঘণ্টা শিক্ষক ও ছাত্রগণের সম্মিলন হয়। ইহাতে কোন্ বিষয় কিরূপে পড়িলে সুবিধা হয়, তাহার আলোচনা করা হয়, বিকাল বেলায় ছাত্রগণের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

অন্যান্য প্রণালীর ন্যায় এখানেও একজন শিক্ষকের অধীনে যত কম ছাত্র থাকে, কাজ ততই ভাল চলে। এই প্রণালী অনুসারে একজন শিক্ষক সাধারণতঃ ২৫ জন হইতে ৩০ জন ছাত্রের তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন।

এ জগতে নিখুঁত জিনিষ নাই। ডেল্‌টন প্রণালীও নিখুঁত বা নির্দ্দোষ নহে। ইহার প্রথম দোষ এই যে—অল্প বয়সে ছাত্রগণের ঘাড়ে অতিরিক্ত মাত্রায় দায়িত্বের বোঝা চাপাইয়া দেওয়া হয়! মিস্ রোসা বেসেট (Miss Rossa Basset) বলেন এত কচি বয়সে ছেলেদের ঘাড়ে এত দায়িত্বের বোঝা চাপান যায় কি না সে বিষয়ে ঘোর সন্দেহ আছে। * কারণ এমন অনেক ছেলে আছে, যাহারা বাহিরের কোন চাপ না থাকিলে, কখনই কোন কাজ করিতে চায় না; কেবল হেলায় খেলায় সময় কাটায়। যে কোন রকমে তাহাকে কাজ করিতে দেওয়া যায়, সে কাজ না করিয়া কেবল কার্য্যপ্রণালীর দোষগুণের বিচার করে; কিছুতেই যেন তুষ্ট হইতে চায় না।

এখনও ছাত্রদের নৈতিক জ্ঞান এতটা পাকিয়া উঠে নাই যে সকলেই কর্ত্তব্যের অনুরোধে বিবেকের অনুমোদনে সব কাজ করিয়া ফেলিবে; আবার বাস্তব জগতে নিরবচ্ছিন্ন স্বাধীনতা নাই। কার্য্যক্ষেত্রে বা সমাজেই কোন না কোন এক জনের অধীনে কতকগুলি নিয়ম মানিয়া চলিতেই হইবে। কাজেই ছাত্রগণকে নিরবচ্ছিন্ন স্বাধীনতা দেওয়া অথবা তাহাদের হাতে সব কাজ সঁপিয়া দেওয়ার বিশেষ কিছু সার্থকতা নাই। তবে কি না, কৌশলে কাজের ভিতর দিয়া যতটুকু আবেগ উৎসাহের প্রেরণা দেওয়া যায়, ততই কাজটা মনের আনন্দে করা যায়। কাজের সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ ও আত্মপ্রসাদের মাত্রা এবং দায়িত্বজ্ঞান বাড়ানই ডেল্‌টন প্রণালীর বিশেষত্ব।

দ্বিতীয় দোষ এই যে ডেল্‌টন প্রণালীর মর্য্যাদা রক্ষার জন্য দিনরাত ছাত্রগণের স্বাধীনতার কথা ভাবিতে ভাবিতে হয়ত শিক্ষক মহাশয় নিজের স্বাধীনতা হারাইয়া ফেলিতে পারেন। ইহা বাস্তবিক আশঙ্কার বিষয়।

তৃতীয় দোষ—যাহারা নির্দ্দিষ্ট সময়ে চুক্তিবদ্ধ কাজ করিতে না পারে, তাহাদের কাজের বন্দোবস্ত করা বড়ই জটিল ব্যাপার। এখানে দৈনিক কার্য্যতালিকা (Routine) অনুসারে কাজ করা বৈ আর উপায় নাই। কাজেই বাধ্য হইয়া ডেল্‌টন প্রণালীর আইন ভঙ্গ অপরাধে অপরাধী হইতে হয়।

৪র্থ দোষ—এই প্রণালী অনুসারে লিখিত পাঠ্যপুস্তকের নিতান্ত অভাব। বাজারে প্রচলিত পুস্তকে এই প্রণালীর কাজ চলে না। এই সমস্ত কারণেই ডেল্‌টন প্রণালী এখনও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় নাই। নানা অপূর্ণতা সত্ত্বেও শিক্ষাজগতে ইহার উপযোগিতা আছে। সকলেই স্বাধীনভাবে কাজ করে অথচ কেহই কাহারও অনুগ্রহে বঞ্চিত নহে। প্রয়োজন হইলে একে অন্যের সাহায্য করে; নির্ব্বিবাদে সকলে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করে। ইহার ফলে ছাত্রগণ বেশ বুঝিতে পারে যে ছাত্র সমাজের ন্যায়, মানব সমাজও পরস্পরের সাহায্য, সহানুভূতি না পাইলে চলিতে পারে না।

শ্রীগৌরচন্দ্র নাথ বি, এ।

---

* "The Times"—Educational Supplement for March—1922

কনক—"আমি বাজি রাখিয়া বলিতে পারি, আসিলে তুমি ফেল্ হইবে না। আসিবে এবং পাস করিবে—দুটাই তুমি করিবে।"

মাখন হাসিয়া বলিল—"তোমার বিবাহে আসিব।"

শুনিয়া কনকের মুখ ম্লান হইয়া গেল। সে মাখনের মুখের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে কতক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া মুখ নত করিয়া লইল। এ দৃশ্য মাখনের নিকট নূতন ঠেকিয়াছিল এবং ইহা তাহার মনেও দারুণ আঘাত করিয়াছিল। মাখন পুনরায় কথা ফিরাইয়া বলিল—"তবে কি করিব দিদি?"

কনক ম্লান মুখেই বলিল—"যাহা করিয়া তুমি মনে সুখ পাইবে, তাহাই করিও।"

মাখন বলিল—"তুমি যাহা বলিবে, করিতে পারিলে তাহা করিয়াই সুখী হইব।"

নানা মুণির নানা মত।

নানা মুণি যখন, তখন নানা মত তো হবেই হবে।
হ'লে পরও মূল ঘরের সেই বার্ত্তাটুকু ঠিকই রবে।
ব্রহ্ম রূপ চৈতন্য বস্তু এক যেমন সে একই আছে
ভ্রম দৃষ্টি জন্মেছে কেবল জগৎ সৃষ্টি হ'লে পাছে।
গ্রহাদিত্যের দীপ্তি যখন প্রকাশ পায়নি ঐ অম্বরে
ব্রহ্ম তখন ছিলেন স্থিত বাক্য মনের অগোচরে।
বহু হবার ইচ্ছাতে যেই আত্ম মায়ার নিলেন শরণ
ব্যক্ত হ'ল স্বভাব কর্ম্ম অদৃষ্টের সেই স্থূল আবরণ।
সত্য সত্যই সগুণ ব্রহ্মের সঙ্গ সাজিবার স্বভাব আছে;
বিশ্ব ভরা এই বিভূতি একেতেই লীন হবে পাছে।
নির্গুণ আর সে নিরুপাধির স্থিতি নিত্য এক আধারে,
নানা মুণির না না মত হয় সগুণ ব্রহ্মের গুণ বিচারে।

শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কবিভূষণ।

দর্প চূর্ণ।

(ক)

চল্লিশ টাকার মাষ্টার শিশিরকুমার চক্রবর্ত্তী যে কোন্ দুরভিসন্ধি মনে আটিয়া একটা কায়েতের ছেলেকে বিদেশে রাখিয়া তাহার বি. এ, পড়িবার সর্ব্বপ্রকার খরচ জোগাইতেছে, এই সমস্যাটা বাউলপাড়া গ্রামের নিষ্কর্ম্মা দলের মধ্যে বেশ একটুক মজ্‌লিসি ভাবেই আলোচিত হইত। ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান বক্তার মত কেহ কেহ মন্তব্য পাশ করিত, নিশ্চয়ই এতে বামুনের স্বার্থের গন্ধ আছে, নতুবা বামুন হয়ে কায়েতের ছেলের উপর এত দরদ, তা কি তোমরা বুঝ্‌তে পারছনা হে?'

কেহ কেহ উহা সমর্থন করিত, কেহবা অপর একটা নূতন কল্পনায় উপনীত হইয়া সগর্ব্বে বলিয়া ফেলিত—"তা আর বুঝ্‌বনা ভায়া, ছেলেটি এম, এ. বি, এল পাশ করবে, উকীল হবে, জজ হবে, তারপর শিশির চক্কোত্তির শেষ বয়সের খোরাক জোগাবে।"

বাস্তবিক শিশিরকুমার চক্রবর্ত্তী যে আনন্দপ্রসাদ মজুমদারের টাকার তাগিদ না আসিতেই তাহার নিকট মাসে মাসে ত্রিশটি টাকা করিয়া পাঠাইয়া দেন, একথা গ্রামের ভিতর কাহারও অবিদিত ছিলনা। গ্রামের আশে পাশের লোকগুলা পর্য্যন্ত এই খবরটাও সত্যরূপেই জানিয়া নিয়াছিল যে যদি কোন মাসে আনন্দ মজুমদার টাকার তাগিদ দিয়া আর্জ্জেণ্ট চিঠি পাঠাইত, তখন চক্রবর্ত্তী মহাশয় তৎক্ষণাৎ টেলিগ্রাফ মণিঅর্ডার করিয়া টাকা পাঠাইয়া দিয়া আশ্বস্ত হইতেন।

শিশির চক্রবর্ত্তীর আর্থিক অবস্থা যে খুবই ভাল, তাহা নহে; তবে গোলাভরা ধান, পুকুরভরা মাছ, বাগানভরা ফল, গোয়ালভরা গরু—যথেষ্টই আছে। তাছাড়া মাষ্টারী করিয়া বাড়ীতে বসিয়া মাসে মাসে চল্লিশটি টাকা প্রাপ্তি—এটাকে উপড়ি পাওনা বলিলেও চলে। আনন্দ প্রসাদের চরিত্র ও প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া তিনি তাহাকে শিশুকাল অবধি পালন করিয়া আসিতেছেন।

সেবার গ্রীষ্মের ছুটিতে বাউলপাড়া আসিয়া আনন্দ মজুমদার শুনিতে পাইল, তাহার আগমনে মুক্তি কামনা

করিয়া নাকি কোন এক কন্যাদারগ্রস্তব্যক্তি তাহারই অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। অথচ ঐ অপরিচিত ব্যক্তির মনোগত অনুরোধটা যখন স্বয়ং শিশিরকুমার চক্রবর্ত্তীর মারফৎ বাহির হইয়া আসিল, তখন আনন্দ-প্রসাদ ঐ অনুরোধটির সদ্গতিই করিবে কিংবা অধোগতি করিবে, এই ভাবিতে ভাবিতে খানিকক্ষণ বিহ্বলের মত দাঁড়াইয়া রহিল। শিশির বাবু বলিলেন "বুঝেছ আনন্দ, মনোরমী গ্রামের এই জনার্দ্দন বসু তোমারই পিতার বাল্যবন্ধু। এরই জ্যেষ্ঠা কন্যার কথা বল্‌ছি তোমাকে. মেয়েটি দেখ্‌তে শুন্‌তে বেশ। এই এগারো বছর বয়সেই মেয়েটি গৃহস্থালীর যাবতীয় কাজ স্বহস্তে সম্পন্ন করতে শিখেছে। তাছাড়া সূচীকার্য্য, শিল্পকর্ম্ম প্রভৃতিতেও বেশ চতুরা। রামায়ণ ও মহাভারত আমি নিজে পড়িয়ে শুনে এসেছি।"

আনন্দ মজুমদার শুধু শুনিয়াই যাইতেছিল। উহাকে নীরব দেখিয়া শিশির বাবু আবারও বলিতে লাগিলেন "উপার্জ্জনক্ষম হও নাই. তাই ভাব্‌ছ. না? সেই জন্যে তোমার চিন্তা করবার মোটেই দরকার নাই। তোমার বাপ মা যদ্দিন বেঁচে আছেন, দু'বেলা আহার জুট্‌বেই। বুড়ো মানুষ, মেয়েটি দেখে, খুবই পছন্দ হয়ে গেছে তাঁর। একথাটা জানাবার জন্যই তিনি সে দিন বাড়ী থেকে অতিকষ্টে আমার এখানে এসেছিলেন। আজ মেয়ের বাবাই স্বয়ং উপস্থিত।"

মেয়ের বিদ্যার দৌড় মোটেই রামায়ণ ও মহাভারত পর্য্যন্ত, এই ভাবিয়া আনন্দপ্রসাদ নিজের মনোভাবটি গুপ্ত রাখিয়া শিশির বাবুকে জানাইল যে এখনও তত ব্যস্ততার কারণ নাই।

তারপর আনন্দ বহরমপুরে আসিয়া প্রিন্সিপ্যালের নিকট হইতে পাশের খবরটা পাইয়া বরাবর ঢাকাতে চলিয়া আসিল। ইচ্ছা যে অবশিষ্ট পড়া ঢাকাতেই পড়িবে।

বি, এ পাশের খবরের সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যৎ খরচের জন্য লম্বা একটা ফর্দ্দ এ যাত্রা যাহা আসিল, তাহা শিশির বাবুর হাতে না পড়িয়া দৈবক্রমে চক্রবর্ত্তী গৃহিণীর হস্তগত হইল। স্বামীর মেজাজ তিনি বিলক্ষণ জানেন, তাই একটু নরম সুরেই বলিলেন"—সারাজীবনটা এই ছেলের জগদ্দল খরচ জুগিয়ে শেষকালে কি তুমি ফতুর হতে যাবে নাকি? দেখছনা কত বড় লম্বা ফর্দ্দ! শার্ট চাই, কোট্ চাই, জুতো চাই, এম, এ ক্লাসে ভর্ত্তি হবার ফিস্ চাই, বেতন চাই, আগামী মাসের খরচ, বইপুথির দাম, আইন কলেজের পড়া—আরো কত কী? এদিকে যে জগদ্দল ঋণের বোঝা—নিজের জমিজমাগুলো পর্য্যন্ত গ্রাস করতে বসেছে! অবস্থা বুঝেতো ব্যবস্থা কর্ত্তে হবে? ছেলেপুলোগুলো হয়েছে এদের দিকেও তো তাকাতে হবে?"

পর্ব্বতের মত অটল, অথচ জলধির মত গম্ভীর শিশির বাবুর স্নেহ প্রবণ হৃদয়ে সে সমস্ত উপদেশ বাণী বাজে কথার সামিল গণ্য হইয়া বড় একটা আঘাত করিয়া উঠিতে পারিল না। আনন্দপ্রসাদ ঢাকার মেসে থাকিয়া যথাসময়েই সকল টাকা গণিয়া পাইল।

ঢাকা ইডেনগার্লস্ স্কুল হইতে সেবৎসর সুরীতিবালা পাল ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পনর টাকা জলপানী পাইয়াছে—এই সাচ্চা খবরটা যেদিন তাহার সবজ্যান্তা বন্ধু হারাণ সোম বড় আড়ম্বরের সহিতই মেসের মধ্যে আসিয়া প্রচার করিয়া বসিল, সেদিন আনন্দপ্রসাদের নৈশভোজন ও রাত্রি নিদ্রা এই উভয়েরই পরিমাণ অপ্রত্যাশিত রূপে খাটো হইয়া পড়িয়াছিল। ভোজনের পরিমাণটি লক্ষ্য করিয়াছিল সেই মেসের নিরীহ পাচকটি, আর রাত্রিযাপন লক্ষ্য করিয়াছিলেন সর্ব্বদর্শী লেখক ভগবান্।

পরের দিবস হইতে সেই সবজ্যান্তা হারাণ সোমের সঙ্গে আনন্দপ্রসাদের বন্ধুত্ব, শীতকালের বরফরাশির মত অতি দ্রুত ঘনাইয়া উঠিতে লাগিল। মিস্ পালজা মহাশয়ার গায়ের রংটি অপছন্দের কারণ হইলেও ইনি যে সর্ব্বাংশে আনন্দপ্রসাদের আনন্দদায়িনা হইবেন ইহাই উভয়ের পরামর্শে স্থিরীকৃত হইল এবং বিচক্ষণ হারাণ বাবুর ঘটকালিতে কন্যাপক্ষ এবং পাত্রপক্ষের সর্ব্ববিধ মত মীমাংসা হইয়া শ্রাবণ মাসের ভিতরেই শুভ কর্ম্মটি সম্পন্ন হইয়াগেল। এই বাবতে পাত্রপক্ষের যাহা কিছু খরচ সমস্তই শিশির বাবুকে বহন করিতে হইল।

(খ)

সুরীতিবালা পিতৃপ্রদত্ত খরচেই বেথুন কলেজে ভর্ত্তি

বিষয় তিনি কিছুই জানেননা। মোটেই এক সপ্তাহ তিনি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্‌সিপ লইয়াছেন। X'mas উপলক্ষে পুরীর কন্‌সেসন্ জোগাড় করিয়া ছয়টি মেয়ে দরখাস্ত করিলে তিনি তাহা মঞ্জুর করিয়াছেন; মেয়েরাও আজ ভোরের গাড়ীতে পুরী চলিয়া গিয়াছে। তবে তারা আস্‌ছে রবিবারই কলিকাতায় ফিরিবে এমন একটা আশ্বাস বাণী তাঁহার নিকট শুনিয়াও আনন্দরহৃদয়ে আনন্দ ফিরিয়া আসিলনা।

নিরানন্দ মনে গৃহে ফিরিয়া মামা মামিকে নানা অজুহাতে প্রবোধ মানাইয়া রাত্রি দশটায় আনন্দপ্রসাদ ঢাকা মেইলে চাপিয়া বসিল।

(ঘ)

বসন্ত হওয়ার দরুণ সে বৎসর এম. এ পরীক্ষা দিতে না পারিয়া পরের বৎসর এম, এ এবং বি এল উভয় পরীক্ষা একবারে দিবে বলিয়া আনন্দপ্রসাদ প্রস্তুত হইতেছিল। এই এক বৎসরের মাঝে সুরীতি যে কি মনে করিয়া একবারও বাবার টাকা খরচ করিয়া ঢাকাতে কিংবা বাউলপাড়া অসিয়া আনন্দর সঙ্গে দেখাটা পর্য্যন্ত করিলনা এই দুর্ভাবনাটুকু মাঝে মাঝে তাহার পরীক্ষার পড়ায় ব্যাঘাত জন্মাইত। আনন্দ ভাবিত, সুরীতি বোধ হয় পুরী হইতে আসিয়াই লজ্জায় ম্রিয়মানা হইয়া দারুণ আক্ষেপে স্বামীর সঙ্গে পর্য্যন্ত সাক্ষাৎ করিতে সাহস করিতেছেনা। কিন্তু সুরীতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিঠি পত্রের ভিতর যখন ঐ সমস্ত লজ্জা, অনুশোচনা, আক্ষেপ বা সহানুভূতির কোন চিহ্নই সে পাইতেছিল না, তখন বস্তুতই তাহার মন দারুণ অবাধ্যতায় মত্ত হইয়া উঠিতেছিল।

একদিন সন্ধ্যাবেলা স্বয়ং শিশিরকুমার চক্রবর্ত্তী একখানা খোলা টেলিগ্রাম হাতে করিয়া আনন্দর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আনন্দ টেলিগ্রামখানা হাতে লইয়া দেখিল যে ঐ মধ্যে আর একখানা টেলিগ্রাম অদ্য ভোর বেলায় তাহার নিকটও আসিয়াছে। মেসের কর্ত্রী টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছেন যে সুরীতির 'ডাইরিয়া'।

পত্নীর এই জীবন মরণ সমস্যার কালেও আনন্দপ্রসাদের শিক্ষিত হৃদয়ে প্রতিশোধ নেওয়ার দুর্ভাবনাটি প্রবল হইয়া উঠিয়া তাহার সুবুদ্ধিটুকু লোপ করিতে বসিল।

সকল বিষয় শুনিতে পাইয়া শিশির বাবু যখন অনাদ্যকে খুব আচ্ছা করিয়া গালি দিলেন এবং বালিকাপত্নীর বোধাবোধি ভাবী এম. এ, বি, এলের পক্ষে এইরূপ নিষ্ঠুর আচরণ যে নরাধমব্যক্তিরই উপযোগী হইবে—তাহাও বুঝাইয়া দিলেন, তখন অতিবিষন্নচিত্তে আনন্দপ্রসাদ কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিল।

(ঙ)

নানা প্রকারের বিপদ আপদের মধ্য দিয়া আনন্দ দের আরও কতকগুলি মাস কাটিয়া গিয়াছে। তাহার ছাত্রজীবন অতিবাহিত হইতে না হইতেই বৃদ্ধা জননা পুত্রের উপার্জ্জন ভোগে বাতশ্রদ্ধ হইয়া এবং কলেজের শিক্ষিতা পুত্রবধুর পরিচর্য্যায় পরাঙ্মুখ হইয়া পরমপিতা পরমেশ্বরের চরণতল শরণ করিয়াছেন।

আনন্দ এখন জজ্‌কোর্টের উকিল হইয়া বসিয়াছে। সঙ্গে তার পত্নী সুরীতি বালা। দীর্ঘকাল ব্যারামে ভুগিয়া সুরীতি বি এ পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে পারে নাই। এখানে সে সরকারী কাজের উমেদার।

একদিন অপরাহ্ণে কাছারী হইতে আসিয়া জলযোগের পর আনন্দপ্রসাদ একখান নিমন্ত্রণের চিঠি সুরীতিবালাকে পড়িতে দিয়া তাহার মন্তব্য শুনিবার আশায় তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। চিঠি পড়িয়া সুরীতি বলিল—"তা বেশত, শিশিরবাবুর মেয়ের বিয়ে—তুমি যাবে বৈ কি?"

"আর তুমি?"

"আমি? কেন? আমাকে এখানে রেখে যেতে বুঝি তোমার..."

কথাটা শেষ হইতে না হইতেই—সুরীতি যে কোন্‌কথায় কি মনে করিয়া বসে, তাহাই ভাবিয়া আনন্দপ্রসাদ তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিল—"তা—নয়, আমি বলিয়াছিলাম কি—এতকাল শিশির বাবুর স্নেহে প্রতিপালিত হয়েছি, এখন তাঁর এই আনন্দের সময়ে আমাদের দুজনারই সেই আনন্দের ভাগী হওয়া উচিত। এতে অন্ততঃ আমাদের মনের ভিতরের কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ পাবে।"

"আমার যা যা হবে কি প্রকারে বল! এই সপ্তাহের ভিতরেই যে আমার একটা এপয়েণ্টমেণ্ট আস্‌বার কথা। যদি এসেই পড়ে, তবে কি আমার 'ডিলে' করাটা ভাল

সৌরভ

ভাওয়ালের সন্ন্যাসী কুমার।

ASUTOSH PRESS, DACCA.

সৌরভ

একাদশ বর্ষ। | ময়মনসিংহ, আষাঢ়, ১৩৩০ সন। | ষষ্ঠ সংখ্যা।

রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের অভিব্যক্তি।

(১)

একটা বিশেষত্ব ভারতবর্ষের আছে। ভারতবর্ষই প্রথমে বস্তুর বহির্ভাগ ত্যাগ করিয়া উহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছে; তাহারই ভাবস্রোত বিচিত্রের মধ্য দিয়া একের লক্ষ্যে বহিয়া চলিয়া গিয়াছে। খণ্ড জিনিষের ঠিক খণ্ডের মধ্য দিয়া অখণ্ডে পরিসমাপ্তি হইতে পারে, সমার ভিতর অসীমতা আছে—ভারতবর্ষের আবিষ্কৃত এই তত্ত্ব। এবং আধুনিক কালেও রবীন্দ্র কাব্যের ইহাই মূল সুর।

বাঙ্গালী কবি রবীন্দ্রনাথ আধুনিক জগতে এই গভীর তত্ত্বকে রসপূর্ণ করিয়া বিশেষভাবে স্বীয় কাব্যে চিরসুন্দর আকারে প্রকাশ করিতেছেন—উপনিষদের উদাত্তধ্বনি বৈষ্ণবের বেণুরবে আসিয়া তাঁহার কাব্যে সম্মিলিত হইয়াছে তৎসঙ্গে তাঁহার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনার প্রাচুর্য্যে পাশ্চাত্যের প্রবৃত্তিবেগও ফুটিয়া উঠিয়াছে।

বঙ্গীয় সাহিত্যে "নব অভ্যুদয়ের" নক্ষত্রত্রয় মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র—কেবল ইঁহাদিগেরই অনুবর্ত্তী রবীন্দ্রনাথ, ইহা বলিতে পারি না। ইঁহারা আংশিকভাবে প্রকাশিত; কোন একটী ভাব ইঁহাদিগের মধ্যে সমগ্রতা লাভ করে নাই। বরং কবি বিহারীলালের 'সারদা মঙ্গলের' সঙ্গে রবীন্দ্রগ্রন্থের সম্বন্ধ বলা যাইতে পারে। কিন্তু 'মেঘনাদবধ', 'বৃত্রসংহার' বা 'রৈবতকের' পরেই রবীন্দ্রকাব্য আলোচিত হইতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্টতাই এই স্থলে, যে তিনি দ্বিধাকৃত বঙ্গসাহিত্যকে একত্র করিয়াছেন—অতীত বৈষ্ণব আদর্শের সহিত বর্ত্তমান Romantic আদর্শকে যুক্ত করিয়া তিনি উহাদিগকে উপনিষদের নিগূঢ়তায় অনুপ্রাণিত করিয়াছেন। এইরূপে তিনি শুধু বাংলা সাহিত্যেরই ঐক্যসম্পাদন করেন নাই, বাঙ্গালা সাহিত্যের সহিত সংস্কৃত সাহিত্যের জ্ঞাতিত্ব স্পষ্টতর করিয়া জাগাইয়াছেন সুতরাং তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে অবধান করিতে হইলে তিনি যে অতীত ভারতবর্ষের অপরাপর সকল কবিরই উত্তরাধিকারী এবং পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত, ইহা মনে রাখিতে হইবে।

মূলতঃ রবীন্দ্রনাথ গীতিকবি। বিশ্বের সৌন্দর্য্যবোধে তাঁহার আবেগভরা মানস শতধা বিচ্ছুরিত হইয়া কবিতায় ছড়াইয়া পড়ে। অথচ তিনি নাট্যভাব বর্জ্জিত নহেন। হৃদয়বৃত্তির ঘাতপ্রতিঘাতকে, জীবনের পরিবর্ত্তন আবর্ত্তনকে ও পারিপার্শ্বিকের ছায়াপাতকে তিনি এত সূক্ষ্ম, এত তীব্র, এত উজ্জ্বল করিয়া দেখাইয়াছেন যে নাটকেই তাহা সম্ভবে। প্রকৃত পক্ষে নাটকেরই এইটী প্রধান গুণ—অভিভূত করা—যাহা আমরা রবীন্দ্রনাথের অনেক তথাকথিত গীতি কবিতাতেও অনুভব করি। রবীন্দ্রনাথের সুর এক নহে। তিনি বহু সুরে গাহিয়া থাকেন। আমরা যাহাকে তাঁহার কাব্যের মূল সুর বলিয়া আসিয়াছি, তাহা এই সমস্ত সুরের বিপুল একতান। তাঁহার কাব্যের ঐ গূঢ়তত্ত্ব তদীয় কাব্যরচনাতেও ধরা দিয়াছে। তাঁহার এক একটী পৃথক্ কবিতা স্ব স্ব পূর্ণতার মধ্যেও অপূর্ণতা-ছাওয়া। আবার তাঁহার অনেকগুলি কবিতা একত্রে এক অপরিমেয়তায় সমাপ্ত। নানা ছন্দের নানা ভাবের কবিতা তাঁহার। মহাকাব্য ব্যতীত সকল প্রকার রচনাতেই তিনি

এ পর্য্যন্ত হাত দিয়াছেন—নূতন রচনা প্রচলিত করিয়াছেন, সকল রচনাই তাঁহার—হস্তে নব শোভায় মণ্ডিত।

প্রতিভার প্রমাণ মৌলিকত্ব। হয়তো কেহ প্রশ্ন উত্থাপন করিবেন—রবীন্দ্রনাথে যদি ভারতের পুরাতন রাগিণী শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাঁহার প্রতিভার মৌলিকত্ব কোথায়? আমি উত্তর দিব,—তিনি বিশেষভাবে ভারতবর্ষের কবি. ইহাই তাহার মৌলিকত্ব। সমাজের দিক হইতে মানুষের আলোচনা আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে অতি বিরল। তাঁহার পূর্ব্বে ভারতবর্ষের সার বস্তুকে ভারতের ভারতবর্ষত্বকে এমন করিয়া,—এমন সুন্দর করিয়া অপর কেহ পদ্যে ও কবিতায় সংসারের চক্ষে উৎঘাটিত করেন নাই। ভারতের পুরাতন রাগিণীতেই তিনি গান করিয়াছেন—

"তপস্যা বলে, একের অনলে
বহুরে আহুতি দিয়া,
বিভেদ ভুলিল, জাগায়ে তুলিল,
একটী বিরাট হিয়া।
সেই সাধনার সেই আরাধনায়
যজ্ঞশালার খোলা আজি দ্বার,
হেথায় সবারে হবে মিলিবারে
আনত শিরে—
এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে॥"

একমাত্র তিনিই ডাকিয়াছেন—

"এস হে আর্য্য এস অনার্য্য
হিন্দু মুসলমান।
এস এস আজ তুমি ইংরাজ
এস এস খৃষ্টান।
এস ব্রাহ্মণ শুচি করি মন
ধর হাত সবাকার।
এস হে পতিত, কর অপনীত
সব অপমান ভার।
মার অভিষেকে এস এস ত্বরা,
মঙ্গল ঘট হয় নি যে ভরা
সবার পরশে পবিত্র করা—তীর্থনীরে—
আজি ভারতের মহামানবের সাগর তীরে॥"

আমরা কালিদাসের কাব্যে এত বড় আহ্বান পাই নাই। কবিরকেও ঠিক এইরূপ বলিতে শুনি নাই। বহু জাতির সম্মিলনে এই ভারতবর্ষ—

"হেথায় আর্য্য, হেথা অনার্য্য
হেথায় দ্রাবিড় চীন.
শক, হুনদল পাঠান মোগল
এক দেহে হল লীন"

বহু ধর্ম্মপথ দ্বারা এদেশ আচ্ছন্ন। বহু শ্রেণীতে ইহা বিভক্ত। রবীন্দ্রনাথ এই বহুকে এক বলিয়া এই বহুরই জয়গান করিয়াছেন—বহুর বহুত্ব নষ্ট করিয়া নহে, জাতীয়তার অংশ চিহ্নকে লুপ্ত করিয়া নহে, ধর্ম্মপথ সকলকে এক করিয়া নহে, শ্রেণী বিভাগকে অবহেলা করিয়া নহে, অথবা নীচকে সর্ব্বদা নীচু করিয়াও নহে; কিন্তু একের মধ্যে বহুর স্থল বজায় রাখিয়া, মানুষের মনুষ্যত্ব রাখিয়া, জাতি সমূহের যথার্থ বিশিষ্টতাকে জাগ্রত রাখিয়া এবং তাহাদিগের আবাস-ভূমি যে এক—ইহা স্মরণ রাখিয়া। ভারতবর্ষ বিশাল দেশ। পৃথিবীর সর্ব্বপ্রকার বৈচিত্রেরই সমাবেশ এই ভারতে। কবি রবীন্দ্রনাথ সেই ভারতবর্ষের মর্ম্ম কথার প্রচারক। এই কারণে তাঁহার নিকট হইতেই সকল সম্প্রদায়ের বিশেষ কথা জানিয়া সংসারেরই আসল কথাকে আমরা সহজে বুঝিতে পারি। বাস্তবিক, তাঁহাকে একই সঙ্গে জাগতিক ও সম্প্রদায়িক কবি বলা যায়। তাঁহার কাব্যে বিভিন্ন সমাজের বিভিন্ন মানবের উচ্ছাস উৎসারিত। রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের কবি এইরূপে।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনকে মানব জীবনের ন্যায় তিন অংশে বিভক্ত করা চলে, যথা, যৌবন, প্রৌঢ়াবস্থা ও বার্দ্ধক্য। এই তিন অংশের প্রতি কবিতাই সময় হিসাবেও যে যথাক্রমে রচিত হইয়াছে, তাহা নহে। ভাবপ্রবাহের গতি অবলম্বন করিয়াই ইহাদিগের স্থান নিরূপণ করা যায়। এক সময় ৺ মোহিতচন্দ্র সেন মহাশয় অনেকটা এইভাবে কবিবরের কবিতা গুলিকে সজ্জিত করিয়া জনসাধারণের নিকট উপস্থিত করিয়াছিলেন। এই আলোচনায় আমরা তাঁহার প্রদর্শিত পথেই কবি-জীবনের অনুসরণ করিব।

শ্রীসুধীরচন্দ্র ভাদুরী এম, এ,।

অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া অসহ্য ক্লেশের তাড়নায় আত্মহত্যাকরে। হিন্দু সমাজের পতিদেবতারা ঐ সব অভাগিনীর অনেক সময়ই রক্ষক না হইয়া ভক্ষক হইয়া থাকেন।

অতি অল্পদিন পূর্ব্বে সংবাদপত্রে কলিকাতার একটি বধূ আদালতে তাহার যে মর্ম্মন্তুদ কাহিনী ব্যক্ত করিয়াছিল, তাহাতে বিচারালয়ের কেহই অশ্রু সম্বরণ করিতে পারে নাই। অবশ্য বিচারে শাশুড়ী, ননদ ও স্বামীর জেল হইয়াছে কিন্তু আদালতের অগোচরে এরূপ কত নারী যে অরন্তুদ যাতনা ভোগ করিয়া অকালে দেহত্যাগ করিতেছে তাহার সংখ্যা কে নির্ণয় করিবে? সমাজ এবিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন, কেবল উদাসীন নয় সেই সব হত্যা কারীর খোসামোদকারী, প্রশ্রয় দাতা।

তবে সর্ব্বত্রই যে স্ত্রীলোক অত্যাচার প্রাপ্ত হইয়াই আত্মহত্যা করে, তাহা নয়। অনেকে সামান্য কারণে অভিমান করিয়া আত্মহত্যা করে! আমাদের জ্ঞাত ঘটনার মধ্য কেহ কেহ স্বামীকে জব্দ করিবার জন্য আত্মহত্যা করিয়াছে। কেহ কেহ শুধু ভয় দেখাইবার জন্য আত্মহত্যার উদ্যোগ করিয়া মরার অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রাণ রক্ষা করিতে পারে নাই। স্বামীর প্রতি অভিমান করিয়া আত্মহত্যার উদ্যোগের অনেক ঘটনা শ্রুত হয়।

বর্ত্তমানে দারুণ অর্থ কষ্টেও বহু লোক আত্মহত্যা করিয়া থাকে। আমাদের দেশের অনেক পুরুষ স্ত্রীলোকের মনোবৃত্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান। তাহাদের আত্মসম্মান জ্ঞান ভাব প্রবণতা প্রভৃতি কোন কোন পুরুষ অগ্রাহ্য করেন. ফলে তথাকথিত শিক্ষিত ও ভদ্রলোকের মধ্যেও স্ত্রীর সহিত ব্যবহার কোন কোন ক্ষেত্রে অতি বিসদৃশ হয়। নিম্নলিখিত সত্য ঘটনাটী পাঠ করিয়া আমাদের দেশের স্ত্রীলোকের আত্মহত্যার যে আর একটা দিক্ আছে, তাহা স্পষ্ট রূপে প্রতিভাত হইবে।

এক ভদ্রলোক তাহার প্রৌঢ়া স্ত্রীকে অতি সামান্য কারণে ক্রুদ্ধ হইয়া নবাগত জামাতার সমক্ষে প্রহার করে। উক্ত বর্ষীয়সী মহিলা নিজ নূতন জামাতার সমক্ষে স্বামী কর্ত্তৃক এইরূপ লাঞ্ছিতা হইয়া তৎনই স্থানান্তরে যাইয়া দারুণ মনঃ ক্লেশে উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করে। এই ঘটনা ভিন্ন প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধা স্ত্রীর আত্মহত্যা সম্বন্ধে আরও অন্য প্রকার কারণ শুনা যায়! বৃদ্ধা শাশুড়ী পুত্রবধূ কর্ত্তৃক সর্ব্বদা উৎপীড়িতা হইয়া এমনকি প্রহার প্রাপ্ত হইয়া অত্মঘাতী হইয়াছে, এবং বৃদ্ধামাতা স্ত্রীর পক্ষসমর্থনকারী পুত্রহস্তে প্রহৃতা হইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে, এরূপ ঘটনাও কয়েকটী শ্রুত হ য়া যায়।

কিছুদিন পূর্ব্বে নব্যশিক্ষিত রাজকীয় উচ্চপদস্থ কোনও ব্যক্তির মাতা পুত্রের ঔদাসীন্তে মলিন বস্ত্রে বাটীর নিকটস্থ কূপ হইতে কলসীতে জল আনিতেছিলেন, সেই সময় পুত্রের বন্ধুবর্গের দৃষ্টিগোচর হওয়ায় পুত্র মাতাকে ঝি বলিয়া পরিচয় প্রদান করে। পুত্রের তাদৃশ উক্তি বৃদ্ধা মাতার কর্ণগোচর হয় ও মাতা মনের বিষম যাতনায় কূপে ঝাপ দিয়া আত্মহত্যা করে। পরের গলগ্রহ বিধবা অর্থনৈতিক কারণে ও নিজের অসহায় অবস্থা ভাবিয়া বিষম হতাশায় আত্মহত্যা করিয়াছে এরূপ ঘটনা অনেক দৃষ্ট হয়। এসব ক্ষেত্রে বিধবা স্ত্রীলোকের অসহায় অবস্থা ও পরাশ্রয়ে বা নিজ আত্মীয়ের আশ্রয়ে নানাপ্রকার লাঞ্ছনা ভোগই আত্মহত্যার প্রধান কারণ। তদ্ভিন্ন সধবা স্ত্রীলোক কোন কোন স্থলে দুশ্চরিত্র বা অক্ষম স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া অর্থনৈতিক কারণে নানা ক্লেশ ও লাঞ্ছনা সহ্য করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে—এইরূপ ঘটনাও কয়েকটী অবগত হওয়া যায়।

নিম্নলিখিত ঘটনাটী আমাদের কর্ণগোচর হইয়াছে।

কোনও ধনাঢ্যগৃহে যুবতীবধূ শ্বশুর শাশুড়ী ও স্বামীর বিষ নজরে পরে। স্বামী দুশ্চরিত্র সে বারাঙ্গনা গৃহেই কাল যাপনকরে। স্বামীর কোনও ঘনিষ্ট আত্মীয় উক্ত বাড়ীতে থাকিত, সে বধূটীর সর্ব্বনাশ করার জন্য নানাপ্রকারে উত্যক্তকরে, বধূটী শ্বশুর, শাশুরী ও স্বামীকে একথা জানায় কিন্তু তাহারা উক্ত আত্মীয়ের কথায় বউটীকে উল্টা তিরস্কার করে। কাহারও নিকট সাহায্য না পাইয়া এবং ধর্ম্ম রক্ষার পথ না পাইয়া উপায়ন্তর অভাবে বধূটী আত্মহত্যা করে। এরূপ আরও কয়েকটী ঘটনা জানাগিয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে দেবর প্রভৃতির

একটী আত্ম প্রচেষ্ট জাতির কথা।

পৃথিবী ব্যাপি আজ যে স্বাধীনতার সংগ্রাম চলিয়াছে তাহা নূতন নহে। যুগে যুগে এই সংগ্রাম চলিয়া আসিতেছে। জ্ঞান বিজ্ঞানের বিস্তার এবং উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অধীনতা পাশে বদ্ধ জাতিসমূহের প্রাণেও এক সাড়া পড়িয়াছে; বর্ত্তমান পৃথিবীর ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর দিকে লক্ষ্য করিলেই তাহা স্পষ্ট লক্ষিত হয়।

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের লোক সংখ্যা এখন এক কোটীর বেশী হইবে না। ভারতবর্ষের তুলনায় এই মুষ্টিমেয় লোক সংখ্যা স্বাধীনতার সংগ্রামে যাহা করিয়াছে, তাহা বাস্তবিকই অতুলনীয়। শুধু সংখ্যাধিক্যে কোন কার্য্য হয় না; কর্ম্মবীর একজনে যাহা করিয়া তুলিতে পারে, অকেজো শতাধিক লোকে তাহার কিছুই করিতে পারে না।

১৫২১ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনিয়েরা এই দ্বীপপুঞ্জ প্রথম আবিষ্কার করেন। অতঃপর স্পেনের রাজা ফিলিপের রাজত্বকালে

শিক্ষিতা সঙ্কর ফিলিপাইন যুবতী।

১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দে এই দ্বীপপুঞ্জে স্পেনের আধিপত্যের সূত্রপাত হয় এবং ১৫৭১ খ্রীষ্টাব্দে উহা স্পেনের রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হয়। ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজেরা একবার এই দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করিয়াছিলেন, কিন্তু পর বৎসর পারিস নগরের সন্ধির পর দ্বীপপুঞ্জ পুনরায় স্পেনের হস্তে প্রত্যর্পিত হয়। তদবধি ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এ দ্বীপে স্পেনের আধিপত্য অক্ষুণ্ণ ছিল।

"সর্ব্বমত্যন্তম্ গর্হিতম্"। যেমন ব্যক্তিগত জীবনে, তেমনি—কি সমাজ শাসন, কি রাজ্য শাসন, সকল বিষয়েই এই নীতি বাক্য প্রযোজ্য। কোন বিষয়ে মাত্রাধিক্য হইলেই তৎফল প্রায়ই বিষময় হইতে দেখা যায়। যে স্পেন তিন শতাধিক বৎসর যাবৎ ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের উপর শাসন দণ্ড চালাইয়া আসিতেছিল হঠাৎ তাহার পতন কেন হইল, উপর্য্যুক্ত নীতিবাক্যই তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে। শাসন যখন শোষণে পরিণত হয়, তখনই তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী। স্পেন যখন শাসন নীতির দোহাই দিয়া ফিলিপাইনবাসির উপর অন্যায় অত্যাচার ও উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করিল, তখন হইতেই তাহার পতনের সূত্রপাত দেখা যাইতে লাগিল। স্পেনীয় রাজ কর্ম্মচারীগণ যখন ক্রমাগত পীড়ন করিয়া দ্বীপবাসী প্রজাসাধারণের নিকট হইতে উৎকোচ গ্রহণ করিতে লাগিল, অযথা রাজ কর ধার্য্য করিয়া এবং ধর্ম্মের ভান করিয়া অন্যায় অত্যাচারে যখন লোকের সর্ব্বনাশ সাধনে প্রবৃত্ত হইল; এবং যখন রাজদ্বারে প্রজার সহস্র আবেদন নিবেদন নিষ্ফল হইতে লাগিল; তখন হইতেই ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের রাজনৈতিক গগনে কৃষ্ণ মেঘের সঞ্চার হইয়া ভীষণ প্রলয়ের আভাস প্রদান করিল।

১৮৯৬ সনের এক ভীষণ কাণ্ডে দেশে যে আতঙ্কের ভাব জাগিয়া উঠিল সেই আতঙ্কই সেই অসভ্য জাতিকে জাতি গঠনে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিল। ১৮৯৬ সনে ফিলিপাইন বাসীগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে গবর্ণমেণ্ট বিদ্রোহ দমন করিতে যাইয়া ১৯৬ জন অধিবাসীকে গ্রেপ্তার করিয়া মাটীর নীচে নির্ম্মিত একটি মাত্র গবাক্ষ বিশিষ্ট এক ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ করিয়া রাখিল। ফলে ১৯৬ জনের মধ্যে ৪৫ জন আবদ্ধ হইবার দিন রাত্রিতেই দমবন্ধ (Suffocation) হইয়া মৃত্যু-মুখে পতিত হইল। অবশিষ্ট জীবিত বন্দীগণকে পর দিবস গুলি করিয়া হত্যা করা হইল। এই ঘটনার পর আবার একদিন রাজকর্ম্মচারিগণ আরো ১৩ জন ভদ্র লোককে ধরিয়া আনিয়া গুলি করিরা হত্যা করিলেন। এইরূপ পুনঃ পুনঃ হত্যাকাণ্ডে দেশে অশান্তির প্রবল স্রোত প্রবাহিত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশের লোক আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে আরম্ভ করিল।

এখন তাহারা আর সেই আদিম অসভ্য ভাবাপন্ন নহে।

পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ফিলিপাইন বাসীরা ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ২৫শে মার্চ্চ, এক নেতার গৃহে একত্র মিলিত হইয়া দেশের দুর্দ্দশার বিষয় আলোচনা করিতে আরম্ভ করিল। সভা জমিয়া উঠিয়াছে, এমনই সময় সশস্ত্র সৈন্যদল আসিয়া যথেচ্ছ ভাবে গুলি চালাইয়া তাহাদিগকে হত্যা করিতে লাগিল।

এইরূপে—অত্যাচার দিন দিন যতই বাড়িতে লাগিল, দেশের লোকের প্রাণে আত্মরক্ষার সঙ্কল্প ততই জাগিয়া উঠিতে লাগিল। আগুইনাল্ড এবং যোশী রাইজেল নামক দুইটী মহাপ্রাণ ব্যক্তি এই সময় দেশের নেতারূপে দণ্ডায়মান হইলেন —স্পেনের অত্যাচার হইতে দেশকে উদ্ধার করিয়া দেশে আত্মশাসন প্রতিষ্ঠা কল্পে বদ্ধপরিকর হইলেন।

আগুইনাল্ড যখন দেশের কাজে ব্রতী হন তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ২৭ বৎসর মাত্র। ফিলিপাইনের এক সম্ভ্রান্ত বংশে তাঁহার জন্ম। দেশপ্রেমিক আগুইনাল্ড তাঁহার জ্বালাময়ী বক্তৃতা দ্বারা দেশের লোককে উদ্বোধিত করিতে লাগিলেন। জীবন মরণের ভীষণ সংগ্রামে প্রস্তুত হইবার জন্য দেশবাসীকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। দেশের লোক তাঁহাকে দলপতি বলিয়া মানিয়া লইল এবং সকলেই আজ্ঞাবহ ভৃত্যের ন্যায় তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিল। এইরূপে যখন আগুইনাল্ডের নেতৃত্বে দ্বীপবাসী বীর মদে মাতোয়ারা হইয়া স্পেন গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল, তখন গভর্ণমেণ্ট ভীত হইয়া পড়িলেন।

এই সময় আমেরিকার সহিত কিউবা লইয়া স্পেন বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং কোন প্রকারে আগুইনাল্ডকে হস্তগত করিবার জন্য রাজপক্ষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আগুইনাল্ড এবং তৎসম্পর্কিত প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণকে উৎকোচ প্রদান করিয়া নিরস্ত করিবার জন্য রাজ সরকার হইতে ২০ লক্ষ ডলার (এক ডলার তিন টাকার উপর) মঞ্জুর হইল। আইগুনাল্ড তখন ভাবিলেন, শত্রুর নিকট হইতে যাহা কিছু আত্মসাৎ করিতে পারা যায়, তাহাই লাভ। বিশেষতঃ সে সময় দেশের কাজের জন্য প্রচুর টাকারও দরকার। তিনি এই সুযোগে এক ঢিলে দুইশিকার ধরিবার সঙ্কল্প করিয়া গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবিত অর্থ গ্রহণ করিলেন এবং স্বদেশ বহিষ্কৃত হইয়া হং কং সহরে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি ভিতরে ভিতরে বল সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন।

আগুইনেল্ড দেশত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে রহিলেন, যোশীরাইজেল। এইবার সংক্ষেপে রাইজেলের কথা বলিব। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে এক ধনবানের ঘরে রাইজেলের জন্ম হয়। তাঁহার শৈশবকালীন কার্য্যকলাপেই বুঝাগিয়াছিল যে উত্তর-কালে তাহাদ্বারা দেশের কোন মহৎ কাজ সাধিত হইবে। তিনি সুন্দর বক্তৃতা দিতে পারিতেন এবং একজন সুলেখক বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ২১ বৎসর বয়সের সময়

শিক্ষিত ধনকর ফিলিপাইন বালক।

তিনি ইউরোপে গমন করেন। পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত ইউরোপের নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া তিনি ডাক্তারী, এবং নানাবিধ বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়া ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে দেশে ফিরিয়া আইসেন। এই সময় ফিলিপাইনে স্পেনের অত্যাচার প্রবল ভাবে চলিতেছিল। দেশের এইরূপ শোচনীয় অবস্থা দর্শন করিয়া রাইজেল বক্তৃতাদ্বারা এবং প্রবন্ধ লিখিয়া দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই প্রচেষ্টা দেখিয়া গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ধরিবার জন্য সুযোগ অন্বেষণ করিতে-ছিলেন। অবস্থা বুঝিয়া তিনি পুনরায় দেশ ছাড়িয়া জাপান চলিয়া যান এবং তথা হইতে লণ্ডন সহরে গিয়া কিছুকাল বাস করেন। রাইজেলের পুনরায় বিদেশে যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল, স্পেনের অত্যাচারের কথা সভ্যজগতে প্রচারিত করা।

বান্ধব কতবৎসর বাঙ্গালার জলবায়ুর প্রভাব সহ্য করিয়া টিকিয়াছিল তাহা ঠিক বলা যায় না।† বান্ধব সম্পাদকের কর্ম্মান্তর গ্রহণই যে বান্ধবের তিরোভাবের প্রধান কারণ তাহা অনুমান করা যায়। তাহার আর একটী কারণ লেখকগণের প্রবন্ধের জন্য পারিশ্রমিক দাবী। স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত, প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি নিজ নিজ প্রবন্ধের জন্য প্রচুর পরিমাণে অর্থ দাবী করাতে শেষ সম্পাদক নিরুপায় হইয়া বান্ধব বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হন। বঙ্গদর্শনেরও নাকি এই অবস্থা ঘটিয়াছিল।

শ্রীগৌরচন্দ্র নাথ বি,এ,।

অভিমান।

চাইনা তোমার আধেক চাওয়া
চাইনা তোমার আধেক কথা;
এজগতে আমি থাকিয়া ভুঞ্জিব
জন্ম জীবন বিরহ ব্যথা।

শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কবিভূষণ।

স্নেহেরদান।

(৯)

তহবিল ভাঙ্গার মোকদ্দমা দায়ের করা লইয়া মাতা পুত্রে মত ভেদ হইয়াছে।

মণিমোহন বলিয়াছিল—'নালিস করিয়া টাকা আদায় হউক বা না হউক, আমার নিকট এরূপ অপরাধ করিলে তাহার যে ক্ষমা নাই, ইহার দৃষ্টান্ত রাখিবার জন্যই নালিস করিতে হইবে।"

মণি ম্যানেজারবাবুকে এরূপ আদেশ দিলে, অপরাধী নায়েব মহাশয় হরকুমার, বৃদ্ধগোপী ভাণ্ডারী এবং অন্যান্য পাঁচজন কে লইয়া যাইয়া বড় কর্ত্রীর শরণাগত হইলেন।

সকলেই নায়েবের নিকট হইতে যথাযথ দস্তুরি খাইয়া একবাক্যে বলিল—গরীব তাঁবেদার, রাজ সংসারের না খাইয়া যাইবে কোথায়? খাইবে কোথায়? স্বর্গীয় কর্ত্তা মহারাজার আমলেই এই তহবিল ভাঙ্গা হইয়াছে। তিনি তাহা জানিতেন; অনেক গুলি টাকা তাঁহার মৌখিক আদেশেও খরচ লিখা হইয়াছে। তিনি ছিলেন মহাপ্রাণ; তাঁহার এ-সকল ক্ষুদ্র বিষয়ে নজর একেবারেই ছিল না। মণিবাবুরও নজর ক্ষুদ্র নহে, তবে এ বিষয়ে তাঁহার নিজের কোন দোষ নাই. যত কিছু ঘটনা ঐ মাখন ছোকরার পরামর্শে ঘটিতেছে। সে ছোকরা নেহাৎ অল্পপ্রাণ, ক্ষুদ্র প্রকৃতির; তাহার কথাতেই ছোট কর্ত্রী নালিস করিতে উদ্যত হইয়াছেন। এখন আপনি—রাণী মা, যদি রক্ষা করেন। আপনি রক্ষা করিলে ছোট কর্ত্রী নালিস ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইবেন।

এরূপ নালিস হইলে যে মফস্বলের সকল নায়েবই একবারে কর্ম্ম ইস্তাফা দিয়া যাইবেন এবং তাহা হইলে যে আদায় তহসিলের পথে কিরূপ বিভ্রাট ঘটিবে তাহারও দুই একটা দৃষ্টান্ত দিয়া তাহারা কর্ত্রীর মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিলেন।

গোপীর মন্ত্রণায় ও চক্ষের ইঙ্গিতে নায়েব বেচারা বড় কর্ত্রীর পায়ে পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে মা মা বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

বড় কর্ত্রীর জীবনে এই প্রথম বিচার মিমাংসার দায়িত্ব উপস্থিত হওয়ায় তিনি বিচলিত হইয়া পড়িলেন। নায়েব বেচারার কাতর ক্রন্দন, মফস্বলের নায়েবদের কর্ম্ম ইস্তাফায় ভাবি বিভ্রাট আশঙ্কা, দশের অনুরোধ, ছেলের জিদ—এই সমস্ত চিন্তায় তিনি উপস্থিত বুদ্ধি স্থির করিতে না পারিয়া হরকুমারের সহিত অনেকক্ষণ পরামর্শ করিলেন, তারপর সে দিন আর কোন আদেশ না দিয়া সকলকে বিদায় করিয়া দিলেন।

মণির মার মন দশের কথায় ও নায়েবের কান্নায় নরম হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু তিনি কি করিবেন? মণি যে এই ব্যাপারে প্রতিবাদী।

সকলে চলিয়া গেলে মণির মার মনে জাগিতেছিল—ছেলের প্রকৃতি পরিবর্ত্তনের কথাটাই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী।

মণি ছোট বেলা অত্যন্ত অস্থির প্রকৃতির ছিল। কাহারও শাসন মানিত না। জমিদারের একমাত্র

† শ্রীযুক্ত শ্রীপতি প্রসন্ন ঘোষ আমাকে লিখিয়াছেন ১২৮৫ও১২৮৬ সালে সম্পাদকের চক্ষুরোগের জন্য বান্ধব বাহির হয় নাই। ১২৯১ সালে বান্ধবের অষ্টম বর্ষ এবং তাহাই ছিল তাহার শেষ বর্ষ।" তাঁহার কথা বোধ হয় ঠিক নহে, কেননা গৌরভ আফিসে আমরা ১২৮৫। ৮৬ সালের কোন কোন সংখ্যা এবং ১২৯২।১২৯৩ সালের দ্বাদশ সংখ্যা পর্য্যন্ত বান্ধব দেখিয়াছি।

ছেলে বলিয়া কেহ কিছু বলিতেতো পারিতই না বরং অত্যধিক আদর করিত। সেই অন্যায় ও অপরিমিত আদরে পিতামাতার প্রতিও সে প্রচুর উদ্ধত ব্যবহার করিত।

কলিকাতা যাওয়ার পর হইতেই তাহার এই ব্যবহারে গুরুতর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহার পর হইতে সে সকলকেই গ্রাহ্য করিয়া চলে, কাহাকেও কোন উচ্চ কথা বলে না হরকুমার প্রভৃতি আত্মীয়-পরিজনও সেই হইতে তাহার অন্যায় আচরণের হাত হইতে একেবারে নিষ্কৃতি পাইয়াছে; দাস দাসীদিগের প্রতি তাহার যে কড়া শাসন ছিল, তাহা একেবারে লয় পাইয়া গিয়াছে। এগুলি ব্যতীত তাহার অন্যান্য আচরণও সকলের আলোচনার বিষয় হইয়াছিল।

কড়া ও বদ মেজাজী শাসককে লোকে যতটা ভয় করে, নিরীহ ও মেজাজ শূন্য লোককে তেমন লোকে ভয় করেনা। মণির চাল চলনের প্রকৃতি নিরীহ ও মেজাজ শূন্য হইয়া যাওয়ায় এ সংসারে যে-ই যখন কোন ত্রুটী করিত, তাহা যে মণির মৃদুস্বভাবের ফলে করিত, তাহা বলিতে লোকে ত্রুটী করিত না।

মণির এই নিরীহ প্রকৃতির প্রশ্রয়েই জমিদার বাড়ীর দাস দাসী হইতে আরম্ভ করিয়া আত্মীয় স্বগণ—সকলেরই প্রকৃতি পরিবর্ত্তন হইয়া অল্পে অল্পে তাহার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতেছিল। ইহা মণির মায়ের দৃষ্টিতে মোটেই প্রীতিকর বলিয়া বোধ হইতেছিল না। ঠিক এই সময়ে নায়েবের তহবিল ভাঙ্গা সম্পর্কে মণির এইরূপ আদেশ মায়ের মনে অনেকটা সান্ত্বনা প্রদান করিয়াছিল।

মা, ছেলে কড়া শাসক হউক—ইহাই আশা করিতেছিলেন। মণি মেজাজ গরম করিয়া চলুক; জমিদারী প্রকৃতি বজায় রাখিয়া একটু এদিক সেদিক যাতায়াত করুক; খরচ-পত্র হৈ চৈ, যাহা একজন জমিদারের পক্ষে প্রজার চক্ষে তাক্ লাগাইবার জন্য প্রয়োজন, তাহা করিতে তাহার মোটেই অপত্তি ছিল না। সেই জন্যই নায়েবের সম্বন্ধে মণির দম্ভকে তিনি মনে মনে সমর্থনই করিয়াছিলেন।

এই আদেশের ভিতর যে মাখনের প্রভাব ছিল তাহা অবগত হইয়া তিনি তাঁহার মনকে কোন রকমেই সান্ত্বনায় আনিতে পারিলেন না। পরের পরামর্শে রাজত্ব চলতে পারে না; তাহা আজ সুফল দিলেও কালই হয়ত বিষম বিভ্রাট ঘটাইয়া বসিবে।

মণির মা এই সকল চিন্তা করিয়া মাখনের প্রভাব হইতে এই উপলক্ষে মণিকে মুক্ত করিতে সঙ্কল্প করিলেন।

এই সময় জীবানন্দ স্বামীর শিষ্য দীনানন্দ স্বামী গুরুর আদেশে নাম কীর্ত্তনের জন্য পুনরায় সেই অঞ্চলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। জীবাশ্রমেই তাঁহার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। মণিমোহন সে দিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য জীবাশ্রমে গিয়াছিল। সন্ধ্যার পর বাড়ীতে আসিলে তাহার মা তাহাকে ডাকাইলেন।

মা বলিলেন—"মৃজাপুরের নায়েব আজ বিকালে আসিয়া হত্যা দিয়াছিল।"

মণি—'আমি শুনিয়াছি।'

মা—"তোমাকে কে বলিল?"

মণি—"তোমাকে যে সজাগ থাকিতে বলে, আমাকে সেই চুরী করিতে বলে জমিদার বাড়ীর কোন কার্য্যই গোপন থাকেনা মা, সুতরাংই আমি জানিয়াছি।"

মা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন—"তুমি কখন শুনিলে, কে বলিল?"

মণি—"আমি জীবাশ্রমে থাকিয়াই। শুনিয়াছি কে কে আসিয়াছিল, কি কি কথা বার্ত্তা হইয়াছে এবং এই ব্যাপারে নায়েবের কি পর্য্যন্ত অপদণ্ড হইয়াছে—সবই আমার কাণে গিয়াছে। কে বলিয়াছে, তাহা শোনা নিষ্প্রয়োজন। মণি তুমি যাহা ভাল বুঝ তাহাই করিও। আমি এত গুলি টাকা ছাড়িয়া দিয়া চুরির প্রশ্রয় দিবার পক্ষপাতী নাই।'

মা—"টাকা নাকি অনেক গুলিই স্বর্গীয় কর্ত্তার আমলের ভাঙ্গতি এবং তাঁহার মৌখিক আদেশে খরচ হইয়াছে।"

মণি—"এরূপ কথা বলিলেই চলিবে না, প্রমাণ চাই। কর্ত্তার আদেশে যদি খরচই হইয়া থাকে, সে জন্য ছোট হিস্যার খুড়ী মা কেন তাহা ছাড়িয়া দিবেন; তাঁহার পক্ষেরও তো আদেশ থাকা প্রয়োজন?"

মা—"তথাপি যখন স্বর্গীয় কর্ত্তার নামের দোহাই দেয়—আর কাটাই বা কত?"

"আমাকে তো তিনি কোন দুঃখ দেন নাই!"

"কেন, আমার অন্ধত্ব কি তোমারও দুঃখের কারণ নয়?"

"সে জন্য দুঃখ করিলে ফল কি? ভগবানের উপর রাগ করিলে দুঃখের উপসম হইবে কি?"

"তোমার মনে তবে সান্ত্বনা আছে; বেশ!" বলিয়া অন্ধ স্বামী পত্নীকে সাদরে টানিয়া লইয়া সোহাগ দেখাইলেন।

হরিপ্রিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"পূজার আয়োজন রাখিলাম, আমি এখন আখা ধরাই গিয়া; বেলাতো দুপর হইতে চলিল।"

"আর এক কলিকা তামাক দিয়া যাও। এই আমিও মালা রাখিলাম। হরিপ্রিয়া, সম্বল আমার এখন তুমি, আর জপের মালা; লাঠি, আর এই হুকা। দাও, আর একটা ছিলুম দাও; তারপর তৈল দাও, স্নানে যাই। মালা জপিয়া আর সান্ত্বনা পাই না হরিপ্রিয়া! নির্দ্দয় ভগবান—নির্দ্দয় ....."

হরিপ্রিয়া স্বামীর হস্ত হইতে মালার ঝুলীটী লইয়া তুলিয়া রাখিয়া তাঁহার হস্তে হুকাটী দিল; তারপর কলিকাটী আনিয়া হুকার মাথায় চাপাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

কানাচাঁদ দীর্ঘ নিশ্বাসে মর্ম্মযাতনা প্রকাশ করিলেন—"হরি কে বলে তুমি দয়াময়।"

তারপর একাগ্র মনে হুকার সেবা করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—স্বপ্ন-মঙ্গল।

গোস্বামী প্রভুর বড় বড় শিষ্য সেবক ছিল; বিস্তর জোত ব্রহ্মোত্তর জমিও ছিল। সুতরাং অন্ধত্ব ব্যতীত তাঁহার আর কোন বিশেষ দুঃখের কারণ ছিল না। কিন্তু এই এক দুঃখই তাহাকে সময় সময় এত উত্তেজনা করিত যে তখন তিনি ভগবানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে ইতস্ততঃ করিতেন না।

আজ বেহারার স্কন্ধে আরামে শয়ান থাকিয়াও গোস্বামী প্রভু তাঁহার অন্ধত্বের জন্য ভগবানকে অজস্র অভিসম্পাত করিতে লাগিলেন, এবং সেই চিন্তায় তন্ময় হইয়া ক্রমে নিদ্রাভিভূত হইলেন।

নিদ্রার আবেশে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন—দূর আকাশ হইতে জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ স্বয়ং যেন নামিয়া আসিয়া তাঁহার করুণ করস্পর্শে গোস্বামীর চক্ষু তারকা দুটী আগুণের ফুলকীর মত জ্বালাইয়া দিয়া কহিলেন—বৎস, সুখ দুঃখ কিছুই নহে; তাহা মনের ভাবের অভিব্যক্তি মাত্র। তুমি যাহাকে দুঃখ মনে করিতেছ, তাহাই তোমার হয়ত বাঞ্ছিত, আর তুমি যাহাকে সুখ কল্পনা করিতেছ, তাহা তোমার জীবনের মহা বিপদের কারণ। এ জগতে কেহই নিজের জন্য আইসে নাই, আমার সৃষ্টি বিকাশের জন্যই কর্ম্মের বিধান তোমরা কর্ম্মী মাত্র। এ বিধান কর্ম্মীকে মানিতেই হইবে। এবং এ বিধান মানাতেই তাহার সুখ। যাহা হউক—আজ তোমার ইচ্ছাই পরীক্ষিত হউক। দেখা যাউক—বসুমতীর যৌবন শ্রী তোমাকে কত তৃপ্তি দান করিতে পারে!"

পাল্কীর ঝুঁকিতে গোস্বামীর নিদ্রা ভঙ্গ হইল। পাল্কী গন্তব্য স্থানে আসিয়া পঁহুছিয়াছে। শিষ্য গণ গললগ্না কৃতবাস পাল্কীর সম্মুখে ভূলুণ্ঠিত হইয়া আছেন। গুরুগোঁসাই পাল্কীর ভিতর হইতে স্বীয় পদদ্বয় বহির্গত করিয়া ধরিলেন; শিষ্যেরা তাঁহার পায়ের পাতা ললাটে ও জিহ্বাগ্রে স্পর্শ করিয়া তাঁহাকে সভক্তিপুষ্পাঞ্জলি গৃহে বরণ করিয়া লইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—বিধাতা মঙ্গলময়।

শিষ্য গৃহে গুরুর কার্য্য শেষ হইয়া গেলে গোঁসাই প্রভুর প্রত্যাগমনের ব্যবস্থা হইতে লাগিল। এমন সময় এক শিষ্য ভক্তি গদগদ কণ্ঠে বলিল—"গুরুগোঁসাই-কর্ত্তা-প্রভুর আদেশ হইলে একজন চক্ষু চিকিৎসক আসিয়াছেন—তাহাকে একবার দেখাইতে পারি।"

স্বপ্নের কথা তখন গোস্বামীর স্মরণ হইল। তিনি ঊর্দ্ধে হস্তোত্তোলন করিয়া উদ্দেশে সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের প্রতি ভক্তি দেখাইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন—"প্রভো, মঙ্গলময়, তোমার মঙ্গল আদেশ পূর্ণ হউক! ডাক দেখি তোমাদের চক্ষু চিকিৎসককে।"

চিকিৎসক আসিল এবং গুরু গোঁসাইর অনুমতি লইয়া তাঁহার চক্ষে অস্ত্র প্রয়োগ করিল। স্বপ্ন ও সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকের আবির্ভাব আজ গুরু গোঁসাইকে ভগবানের মঙ্গলময়ত্বে ধ্রুব বিশ্বাসী করিয়া তুলিয়াছে।

সম্পূর্ণ দিন ও রাত্রি চক্ষু বাঁধিয়া রাখিয়া পর দিন প্রভাতে যখন চিকিৎসক তাঁহার চক্ষের বন্ধন মোচন

স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

Asutosh Press, Dacca.

'লোকালয়ের' প্রায় কবিতাতে কবি খণ্ডের মধ্যেই পরিপূর্ণতা পাইয়া অখণ্ডের চাইতেও খণ্ডকে বৃহৎ মনে করিতেছেন। 'লোকালয়ে' যৌবনের মুগ্ধনেত্রে নারীর মহিমা দেখিয়া কবি পুলকিত হইয়াছিলেন। কবির মনে হইতেছে—বিশ্বের সকল সৌন্দর্য্যের সারাংশেই যেন নারী সৃজিত। তাহার হৃদয় কত গভীর; তাহার দেহ কত সুন্দর। সংসারে সমস্ত কর্ম্মক্লেশের পরে ওগো নারী, তুমি আসিয়াই—

"ধুয়ে মুছে দাও ধূলির চিহ্ন,
জোড়া দিয়ে দাও ভগ্ন-ছিন্ন,
সুন্দর কর সার্থক কর
পূজিত আয়োজন"।

ওগো নারী, সংসারে তুমিই প্রকৃত পূজা করিয়া থাক।—

"অবারিত করি ব্যথিত বক্ষ,
খোল হৃদয়ের গোপন কক্ষ,
এলোকেশ পাশে, শুভ্র বসনে
জ্বালাও পূজার বাতি।"

"উর্ব্বশী" কবিতায় গৌরবভরা চিত্তে কবি বিশ্ব সৌন্দর্য্যকে এই নারীরূপেই বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা জগৎ সাহিত্যের একটী শ্রেষ্ঠ গীতি। কল্পনার প্রাচুর্য্যে ইহা শেলীর Hymn to Beauty এবং কীট্‌স্‌এর Ode on a Grecian Urnকে ম্লান করিয়াছে।

কবির অভিলাষ ছিল কল্পনাকে বাস্তব আকারে দেখিতে। এখন নারীকে দেখিয়া তাঁহার সাধ পূর্ণ হইয়াছে। তিনি তাহার সম্বন্ধে বলিয়া উঠিয়াছেন—

'অর্দ্ধেক মানবী তুমি অর্দ্ধেক কল্পনা'।

কবি পতিতার মধ্যেও নারীত্ব বিদ্যমান দেখিয়া স্বর্গের দেবী জ্ঞানে প্রণাম করিয়াছেন।

'আনন্দময়ী মূরতি তোমার
কোন দেব তুমি আনিলে দিবা
অমৃত সরস তোমার পরশ
তোমার নয়নে দিব্য বিভা'।

কবি রবীন্দ্রনাথের এইস্থলে নূতনত্ব আছে। নারীকে এমন করিয়া সম্মান করিতে আর দেখি নাই। কল্যাণময়ী নারীর জন্যই তিনি বলিয়াছেন,

'সর্ব্বশেষের শ্রেষ্ঠ যে গান
আছে তোমার তরে'।

বিশ্ব প্রকৃতি খণ্ডের মধ্যেও আপন সৌন্দর্য্যে বিকশিতা, ইহাই "নারীর" কবিতা সকল আমাদিগকে জানায়।

নারী তাঁহাকে কল্প লোকে লইয়া গিয়াছে 'কল্পনায়' তাই দেখিতে পাই কবি তাঁহার আদর্শদেবীকে সকলের অন্তরালে নিভৃতে নীরবে গোপনে চিনিতে চাহিতেছেন—

'তোমারে চিনিব প্রাণের পুলকে
চিনিব সজল আঁখির পলকে
চিনিব বিরলে নেহারি
পরম পুলকে'।

বিশ্ব প্রকৃতির সহিত খণ্ড সৃষ্টির, অসীমের সহিত সসীমের রহস্যময় পরিচয়ই এই 'কল্পনা' শীর্ষ কবিতাবলীতে আমরা বুঝিয়াছি; 'লীলা'তেও তাহাই দেখিয়া থাকি।

কবি বলিতেছেন,

—'তোমারে পাছে সহজে বুঝি
তাইকি এত লীলার ছল
বাহিরে যবে হাসির ছটা
ভিতরে থাকে আঁখির জল,
বুঝি গো আমি, বুঝি গো তব
ছলনা।
যে কথা তুমি বলিতে চাও
সে কথা তুমি বলনা।

হাস্য কৌতুকেই কবি তাঁহার আকুল আকাঙ্ক্ষা, অতৃপ্ত প্রেম তাঁহার আরাধ্যাকে জানাইয়াছেন। কারণ

গভীর সুরে গভীর কথা
শুনিয়ে দিতে তোরে
সাহস নাহি পাই।
হাল্কা তুমি কর পাছে
হাল্কা করি তাই,
আপন ব্যথাটাই।

"কৌতুকে'র" অনেক কবিতায় প্রেমের মিথ্যা ছায়াকে পরিহাস কটাক্ষে 'সরমে' দূর করিয়া কবি প্রেমের যথার্থতা অপরোক্ষভাবে তাঁহার জীবনাধিষ্ঠাত্রী দেবীকে দেখাইতেছেন।

"যৌবন স্বপ্নে" কবি কিন্তু তাঁহার এক অর্দ্ধপুরাতন অর্দ্ধ নূতন আবেশমোহে মুহ্যমান।—

যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই
যাহা পাই তাহা চাই না।

হাস্যপরিহাস ছাড়িয়া কবি এখন তাঁহার আদর্শ মূর্ত্তির আবেশে জড়ান স্বপ্ন দেখিতেছিলেন কত সুধা কত সৌরভ যে সে মূর্ত্তি তাঁহার জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে, তিনি তাহার অন্ত পাইতেছেন না। কিন্তু কখনও তাঁহার মনে হইতেছে, এই সব যে স্বপ্ন মাত্র—এখন পর্য্যন্ত ত তিনি আদর্শ মূর্ত্তিকে আপন করিয়া লইতে পারেন নাই। আকুল আন্দোলনে তিনি অধীর হইয়া পড়িতেছেন—ইচ্ছা হইতেছে এই "আকাশ কুসুম বনে স্বপ্নচয়ন" ত্যাগ করিয়া জগতের অপর সাধারণের মত চঞ্চল সংসারের সুখদুঃখের মধ্যে তিনিও জীবন কাটান। তাই কবির সর্ব্ব মুখে ঐ নিরাশার সুর।

কিন্তু তিনি প্রেমের ভেলায় আশ্রয় লইতে পারিয়াছেন। তাই তাহার মনে হইতেছে যেন—

বসন কার দেখিতে পাই জ্যোৎস্নালোকে লুণ্ঠিত
নয়ন কার নীরব নীল গগণে!

পরেই তাহাকে গাহিতে দেখি

সুন্দরী ওগো সুন্দরী!
শতদল দলে ভুবন লক্ষ্মী।
দাঁড়ায়ে রয়েছ, মরি মরি!
জগতের পাকে সকলি ঘুরিছে
অচল তোমার রূপরাশি
নানা দিক হতে নানা দিন দেখি,—
পাই দেখিবারে ঐ হাসি!

তিনি আরাধ্যাদেবীর সাক্ষাৎ পাইয়াছেন; হর্ষে, উল্লাসে কবিহৃদয় তাঁহাকে ধরিতে গিয়াছে—কিন্তু সে তো আকাঙ্ক্ষার ধন নহে'। কবি তাই আপন মনে বলিতেছেন।

নিবাও হাসনা বহ্নি নয়নের নীরে
চল ধীরে ঘরে ফিরে যাই!

তবুও তাঁহার মনের অতৃপ্তি সতৃষ্ণনয়নে তাকাইয়া রহিল। রুদ্ধবক্ষে কবি তাঁহার আরাধ্যাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—সে কি তাঁহাকে ভালবাসে? কিন্তু, আবার আপনার বাসনা মলিন চিত্ত দেখিয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে কবি আপনাকে সকল রূপ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে চাহিলেন—তাঁহার হৃদয়াকাশে তাঁহার আরাধ্যার দেহহীন জ্যোতিই যেন জাগিয়া রহে। এইরূপে কামনা তাঁহার দূরে অপসারিত হইল। ফলে প্রেমাস্পদের পূর্ণতায় তিনি নিজকে হারাইয়া ফেলিলেন—জগতে আর কিছুরই সন্ধান তিনি জানেন না। তাঁহার মনে পড়িল,

তোমাকেই যেন ভাল বাসিয়াছি
শতরূপে শতবার
জনমে জনমে, যুগে যুগে, অনিবার।

তাঁহার এই এক প্রেমের স্মৃতিতে জগতের সকল প্রেমের স্মৃতি ডুবিয়া গিয়াছে। আর এই অপার স্মৃতিতে নিজকে তিনি ঘিরিয়া রাখিয়াছেন।

ভারতবর্ষে এরকম সুরে আরও গাহিতে শুনিয়াছি। Mrs Browning এর Sonnets form the Portugaese এক দিন এই সুরেই নাচিয়াছিল। ইহাই সসীমের অসীমে মিলন গাঁথা।

"কবি কথায়" কবি তাঁহার আপনার কথাই আবার পাড়িয়াছেন। তিনি যে কিরূপ অলস জীবন কাটাইবেন বীণার ঝঙ্কারে কাহার কথা শুনাইবেন, ইহাই তিনি জানাইতেছেন। কবিকথায় তাহার মানস-সুন্দরীকে স্পষ্ট দেখিতে পাই। (আগামীবারে সমাপ্য।)

শ্রীসুধীরচন্দ্র ভাদুরী।

দিবা ও রজনী

"বৃথা জন্ম রাত্রি তব ঘন অন্ধকারে
মলিনা মূরতি মতি হেরিতে কে পারে?
নিশাচর নিশাচরী তব—প্রিয় প্রিয়া
নিয়ত কুকাজে রত আত্মবলি দিয়া;
তুমি পাপ, আমি পুণ্য উজ্জ্বল আলোক
আমায় লভিতে সদা ব্যস্ত সর্ব্বলোক।"
বলে নিশা, "গর্ব্ব তব শোভা নাহি পায়,
আমি আছি বলে তুমি আছ মহিমায়।
রাত্রি-দিন পাশাপাশি না থাকিত যদি
কে তবে চাহিত দিবা-আলো নিরবধি?"

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

বিবাহ।

মানব সমাজে বহু প্রকার বিবাহ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঐ সকল প্রকারভেদ পরে হইয়াছে। পূর্ব্বে বিবাহ ছিল না, ছিল সংগ্রহ। স্ত্রী পুরুষ প্রবৃত্তির তাড়ণায় আপনা আপনি সঙ্গত হইতে পারিত। সেটাকে স্বেচ্ছাচারিতার যুগ বলিলেও অত্যুক্তি হয়না। ক্রমে পৃথিবীতে যখন নর নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া উঠিল, তখন ঐ সংগ্রহই বিবাহ রূপ ধারণ করিল। বিবাহ কিন্তু প্রণালী বিশেষের দিক দিয়া যৌন সম্বন্ধ স্থাপনের উপায়; উহা স্বেচ্ছাচার মূলক না হইয়া যখনকার যেরূপ সামাজিক অবস্থা, তাঁহার বিধি অনুযায়ি হইলেই হইল। সংগ্রহ যুগের সময় সমাজ স্থাপন হয় নাই, সুতরাং বিধি নিষেধেরও গণ্ডী প্রস্তুত হয় নাই। উদার আকাশ তলে অদম্য আকাঙ্ক্ষা লইয়া মানুষ উদ্দাম গতিতে বিচরণ করিত।

মনুষ্য-সমাজ ঈশ্বর সৃষ্ট নহে। সামাজিক বিধি বিধানেও ঈশ্বরের কোন হাত নাই। উহা প্রয়োজনের দিক দিয়া শ্রেষ্ঠ মণীষিগণ দ্বারা সৃষ্টি হইয়া সমাজ রক্ষার সাহায্য করে। স্ত্রী পুরুষ একীকরণের মূল নিদান প্রণয়নে এক অচিন্ত্য শক্তির অস্তিত্বাভাস থাকিলেও পরস্পর পরস্পরকে সংগ্রহে লৌকিক কর্ত্তৃত্বেরই পরিচয় পরিস্ফুট। ইহা আদি মধ্য অন্ত্য—একই ভাবে নির্ব্বাহিত হয় নাই। আদিম অবস্থাতেই এক, বিপ্লব ও শাশ্বি শৃঙ্খলার সময়ই এক—আকারধারণ করিয়া থাকে।

মূল বেদে বিবাহের একটীও পূর্ণাঙ্গ চিত্র দৃষ্ট হয় না। প্রাচীন আর্য্যজাতি কতটুকু দাম্পত্য সুখের অধিকারী হইয়াছিলেন, বেদে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ নাই। মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র, অগ্নি, প্রভৃতি দেবতাদিগের নিকট তাহারা যে সকল প্রার্থনা করিয়াছেন তাহাতে পারিবারিক সম্বন্ধ সূত্রের কিছু কিছু সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু তদ্বারা বৈদিক যুগের বিবাহ ইতিহাসের পূর্ণতা সাধন হয়না। স্বামীর চিতায় আত্মাহুতি যেখানে, সেইখানেই আবার পুরুষান্তর গ্রহণের প্ররোচনা। অর্থাৎ মৃত ভর্ত্তার শ্মশান চুল্লিতে শায়িতা রমণীকে তাহার আত্মীয়েরা সহ মরণ সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া পুরুষান্তর গ্রহণের পরামর্শ দিতেছেন। তবে একথাও স্বীকার্য্য যে বেদের অর্থ পরিগ্রহে কেহই বলিতে পারেন না - আমি অভ্রান্ত সত্যে উপনীত হইয়াছি। বেদকে অপৌরুষেয় বলার মূল তাৎপর্য্য এই যে বেদ কত কালের তাহা নিশ্চয় করিয়া উঠা যায় না; বেদের ভাষা যেন বিশ্বাত্মার আদি বাণী। এই জন্য পরবর্ত্তীকালে পণ্ডিতেরা অধিকাংশ স্থলে উহার প্র তার্থ গ্রহণে পরাঙ্মুখ। ঐ স্থলে সতীত্ব ও দ্বিচারিণীত্ব দ্বৈত মতের সংঘর্ষ। যাহা হউক, আমরা কিন্তু ঐ দ্বৈত মতেরও একটা সামঞ্জস্য খুজিয়া পাইতেছে; তৎকালে আর্য্য জাতিদিগের সহিত অনার্য্য জাতিদিগের প্রতিনিয়তই সংঘর্ষ চলিত। যুদ্ধ আর মহামারী—উভয়েই নাহি রাখে বংশে দিতে বাতি। যে প্রদেশে জাতির অস্তিত্ব নাশের আশঙ্কা হইয়াছে সেই প্রদেশে বসিয়া সমাজ সংস্থাপকেরা মৃত ভর্ত্তৃকার পুরুষান্তর গ্রহণের প্রস্তাব পাশ করিবেন, ইহা কিছুই আশ্চর্য্যের কথা নহে। আমরা স্ব স্ব রুচির মাপ কাঠিতে সবদিক মাপিতে গিয়া অনেক সময় প্রকৃত তত্ত্বকেও বিস্ময়ের পথর চাপা দিয়া বসি। বাস্তবিক আমাদের সর্ব্বদাই স্মরণ রাখা উচিত যে এ সংসারে মনুষ্য সংস্থানের পরের কথাটাই হইবে সমাজ সংস্থান, ঐ দুইটাই অতি বড় কথা। জাগতিক উন্নতির দিক দিয়া পিঠা পিঠি ভাবে দণ্ডায়মান।

বিবাহ, উপময়, পরিণয় প্রভৃতি শব্দ পরে উৎপত্তি হইয়াছে। ঐ তিনটী শব্দের ব্যুৎপত্তি গত অর্থ পরস্পর রূপে বহা নিবৃত্ত হওয়া, ও সম্পূর্ণরূপে পাওয়া। এই শব্দার্থের দ্বারাও বুঝা যায়যে জগতে প্রাণী সংপ্রবাহের দ্বারে প্রথমত ইচ্ছা শক্তিকে রোধিবার কোনই চেষ্টা হয় নাই। পরে যখন বিপুল মনুষ্য সমাগমে জনপদের পর জনপদ সৃষ্টি হইতে লাগিল তখন আবশ্যক হইল সমাজ। বিবাহ, উপযম পরিণয় এগুলি সমাজ সংহিতারই পরিভাষা।

সেই অপৌরুষেয় শ্রুতি যুগ অবসান হইয়া যখন ঋষি যুগ প্রবর্ত্ত হইল তখনও কিন্তু যৌন সম্বন্ধ সুনিয়ন্ত্রিত হইল না। সে চিত্র পুরাণে সুসংযত ভাষায় চিত্রিত হইয়াছে। বাহুল্য ভয়ে সে সকল দৃষ্টান্ত এই প্রবন্ধে উদ্ধৃত করিলাম না। তখন পুত্র কামনায় যে কোন পুরুষের সহিত সঙ্গত

স্নেহের দান।

(১০)

ষ্টেট সম্বন্ধে ম্যানেজারের সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহার উপর সকল ভার অর্পণ করিয়া মণি পুনরায় জীবাশ্রমে নিয়মিতরূপে যোগদান করিতে আরম্ভ করিয়াছে। প্রাতে যায়, দ্বিপ্রহরে আসে; আবার বিকালে যায়; রাত্রে কোন দিন আসে, কোন দিন আসে না। সেখানে দীনানন্দের ধর্ম্ম ব্যাখ্যা শুনে এবং পরম ভক্তরূপে প্রতিকার্য্যে ও চিন্তায় তাঁহার অনুসরণ করিয়া থাকে। সে এখন দীনানন্দ স্বামীর অনুগত শিষ্য।

সে দিন মণির সঙ্গে ছিল তাহার আত্মীয় রমেশ। রমেশ মণির মার নিকট হইতে কিছু কিছু সাহায্য পাইয়া ঢাকা কলেজে এম, এ পড়িতেছিল।

মণি রমেশকে লইয়া গুরুর নিকট আসিয়া বসিলে গুরু অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া মণির দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"বৎস এই জগৎকে যে সৃষ্টিকর্ত্তা জীবের ভোগের জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহা প্রত্যক্ষ সত্য।"

মণি বলিল—"আপনি প্রাশ্চাত্য মত বলিতেছেন; ত্যাগ প্রধান প্রাচ্যে এ মত খুব সম্মানিত নহে। ভারতবর্ষের মত, সুখ-ভোগে নহে, সুখ—ত্যাগে; সুখ—আত্ম প্রতিষ্ঠায় নহে, সুখ—আত্ম বিসর্জ্জনে—"

দীনানন্দ—"এই জন্যই আমরা পরাধীন। যে জাতি ঐহিক সুখকে তুচ্ছ করে, সংসারটা কিছু না বলিয়া যে জাতিকে শিশুকাল হইতে প্রাণের আকাঙ্ক্ষা দমিত রাখিবার শিক্ষা দেওয়া হয়, সে জাতির ইহকালের বর্ত্তমান তো নাই-ই, ভবিষ্যৎ ও সে জাতির গড়িয়া উঠিতে পারে না। সুতরাং এই কর্ম্ম ও ভোগের জগতে সেই ত্যাগী ও জ্ঞানীর স্থান নিতান্ত নিম্নে; নাই বলিলেই হয়।"

মণি—"তবে আপনি নিজে সংসার ত্যাগ করিলেন কেন?"

দীনানন্দ—"ত্যাগ করি নাই; ভোগ দ্বারা ত্যাগকে গঠন করিব বলিয়া আপাততঃ যতখানি ত্যাগের প্রয়োজন, তাহাই করিয়াছি। এখন ত্যাগ ও ভোগের সমন্বয় সাধন করিয়া ধ্যান-জ্ঞান-ময় প্রাচ্য সাধনা অপেক্ষা ভোগ কর্ম্ম রূপী প্রাশ্চাত্য জীবনের ধারাই যে শ্রেষ্ঠ, তাহাই প্রচার করিতে চেষ্টা করিব। ইহাই দ্বন্দ্ব মীমাংসার শ্রেষ্ঠ উপায়; ধর্ম্ম ও শক্তি প্রতিষ্ঠার মূল উপাদান।"

রমেশের নিকট কথাটা ভাল লাগিল না; সে কি যেন বলিতে যাইতেছিল, মণির ইঙ্গিতে থামিয়া গেল।

মণি বলিল—"অনেক মহাপুরুষের জীবনইতো ত্যাগের মাহাত্মে গরীয়ান; তাঁহারা ভোগের স্পৃহায় বিতশ্রদ্ধ ছিলেন কেন?"

দীনানন্দ—"ধর্ম্ম দর্শন তর্কের ব্যাপার; ন্যায়ের জটিল কুহেলিকায় তাহার সত্য মীমাংসার পথ রুদ্ধ। জগতের মনুষ্য বুদ্ধিও বিচিত্র। মহাপুরুষদের মধ্যে মতভেদও বিচিত্র এবং পদে পদে; সুতরাং কোন্ পন্থা যে ভগবানের নির্দ্দিষ্ট পন্থা, তাহার মীমাংসা এ পর্য্যন্তওতো হয়ই নাই, হইবে ও যে কখন তাহারও সম্ভাবনা নাই। এই জন্যই—"ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং, মহাজন যেন গতঃসঃ পন্থা" :—এই বাণী আলস্যপন্নতন্ত্র ভারতবাসীকে আরো জড় প্রকৃতির করিয়া ফেলিয়াছে; কর্ম্মশূন্য ও চিন্তাশূন্য করিয়া আরও গতানুগতিক ও নিশ্চেষ্ট করিয়া তুলিয়াছে।"

মণি—"ধর্ম্ম সাধনের জন্য তবে কোন পন্থা অবলম্বন করার উপদেশ হয়? ত্যাগী হইয়া, না ভোগী হইয়া; গার্হাস্থ্য ধর্ম্মরক্ষা করিয়া, না সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া?"

দীনানন্দ—"জটিল প্রশ্ন! বড়ই জটিল, কিন্তু সহজে বুঝিতে চেষ্টা করিলে মীমাংসা সরল। সকল ত্যাগ করিয়া যিনি কেবল ধর্ম্ম চান, তিনি, স্রষ্টার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিতে চান। সৃষ্ট জীবের উদ্দেশ্য ত্যাগ হইলে সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিষ্ফল হইয়া যায়। সুতরাং ভোগের ভিতর দিয়া ধর্ম্ম সাধনই সৃষ্টির উদ্দেশ্য বুঝিতে হইবে। আমি তোমাকে তাহাই করিতে উপদেশ দিতেছি। দীক্ষা লইয়া তুমি তাহাই কর।"

রমেশ যতদূর সম্ভব বিনীতভাবে বলিল—"ধর্ম্ম জিনিসটার আপনি কি ব্যাখ্যা দেন, আপনার মতে ধর্ম্ম কি?"

দীনানন্দ উত্তর করিলেন—"অত বড় কথার আলোচনা এখন অনাবশ্যক, যখন প্রয়োজন হইবে, তাহ বুঝিবার তোমার অধিকার জন্মিবে, তখন আপনা হইতেই বুঝিতে পারিবে। অধিকারী ভেদ প্রত্যেক বিষয়ের জন্যই নির্দ্দিষ্ট

আছে। সাধারণতঃ গুরুর উপদেশ পালনই ধর্ম্ম, ভগবানের সৃষ্টির উদ্দেশ্য বুঝিয়া চলাই ধর্ম্ম পথে চলা। এতদ্ব্যতীত ধর্ম্মের ব্যাখ্যা, কল্পনার আশ্রয় ব্যতীত আর কিছুই নহে; অনেক স্থলেই এরূপ তর্কে ভগবানের অস্তিত্বও লয় পাইয়া যায়"

রমেশের নিকট এই ব্যাখ্যাও ভাল ঠেকিতে ছিল না; বিশেষ দীনানন্দ তাহার বিদ্যাবুদ্ধির পরিমাণ না জানিয়াই যে তাহাকে অনধিকারী সাব্যস্ত করিয়া বসিয়াছেন, তাহাতে তাহার উচ্চ অভিমানে একটু আঘাত লাগায় সে আর কোন কথা না বলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

মণি বলিল—"তবে কি বড় বড় মুনি ঋষিদের ধর্ম্ম ব্যাখ্যার কোন মূল্যই নাই?"

দীনানন্দ হাসিয়া উত্তর করিলেন—"পর্ব্বতোবহ্নিমান্ ধূমাৎ—" এই যে ধূমের অস্তিত্ব হইতে অগ্নির অস্তিত্ব প্রমাণিত সত্য বলিয়া গৃহীত হইতেছে—সকল মানবই কি এই উক্তিকে এক বাক্যে স্বীকার্য্য বলিয়া গ্রহণ করিবে? যদি করিত, তবে বিভিন্ন মতের এত বাহুল্য দেখা যাইত না। ঠাণ্ডা জল হইতেও ধূম নির্গত হয়, সাক্ষাৎভাবে অগ্নির অস্তিত্বই কি তাহার কারণ? একটী গল্প মনে হইল। একটী বালককে পণ্ডিত মহাশয় বেত্রাঘাত করাতে বালকটীর কাপড় নষ্ট হইয়া যায়। বালকের পিতা লঘুপাপে গুরুদণ্ড হইয়াছে বলিয়া আসিয়া পণ্ডিতকে আক্রমণ করায় পণ্ডিত দর্শন শাস্ত্রের আশ্রয় লইয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিলেন—

ইদং কাষ্ঠং হরিতকী—রেচকত্বাৎ।

অর্থাৎ বালকের যে কাপড় নষ্ট হইয়াছে তাহা গুরুতর প্রহার জন্য নহে, পরন্তু প্রহারের যন্ত্রটী রেচকত্ব গুণ বিশিষ্ট হরিতকী কাষ্ঠের শাখা বলিয়া। আমাদের সমস্ত ধর্ম্ম দর্শনের ব্যাখ্যাই এইরূপ কল্পনা প্রসূত। এই কারণে আমাদের জাতটাও কল্পনা প্রিয় বেশী। প্রত্যক্ষের দিকে না যাইয়া কেবলি কল্পনা লইয়া জল্পনা করিয়া মরে।"

মণি—"যাহা প্রত্যক্ষ করিব না, তাহাই কি বিশ্বাস করিব না? তবে ভগবানকে বিশ্বাস করিব কি প্রকারে?

দীনানন্দ—"সেও বৎস ধর্ম্মেরই ন্যায় জটিল প্রশ্ন। সৃষ্টি দেখিয়া যদি স্রষ্টার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে হয়, তাহাতে ও তার্কিকের তর্কের বহু অবকাশ থাকে। এইজন্যই খৃষ্টানেরা যিশুকে, মুসলমানেরা মহম্মদকে প্রত্যক্ষ দেবতা বলিয়া স্বীকার করেন; এবং হিন্দুরা গুরুবাদ স্বীকার করেন। গুরুই প্রত্যক্ষ ভগবান—তাঁহার উপদেশ ভগবানের সাক্ষাৎ আদেশ। দীক্ষা লইয়া মন্ত্র গ্রহণ করিলেই, সে জ্ঞান তোমার জন্মিবে। তোমার ন্যায় বুদ্ধিমান ছেলে জমিদার পরিবারে অসম্ভব। পূর্ব্বে রাজা জরাসন্ধ এদানিং রাজবল্লভ—তোমার সিদ্ধি আমি প্রত্যক্ষ দেখিতেছি।"

স্বামীজীর নিকট হইতে বিদায় হইয়া আসিয়া মণি রমেশকে জিজ্ঞাসা করিল—"কেমন বুঝিলে রমেশ দা, স্বামীজীর কথা বার্ত্তা? আমার নিকট কিন্তু বড়ই মিষ্টি বোধ হয়।"

রমেশ মণির অনুগ্রহ প্রার্থী মণির যাহা মিষ্টি লাগিয়াছে তাহা তাহার নিকট মিষ্টি লাগাই স্বাভাবিক; না লাগিলেও অন্ততঃ তাহার কথায় সায় না দিলে পাছে তাহার আগমনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় সে ভয় ভাবিয়াও রমেশ বলিল "বেশতো বলেন।"

কথাটী বলিয়াই রমেশের মনে পড়িল, তার প্রতি স্বামীজীর তাচ্ছল্য ভাবের কথা। সে—'বলিল পড়া শোনা খুব আছে বলিয়া মনে হইল না; কথা গুলি রচা কথা, এবং ভাসা ভাসা বোধ হইল.."

মণি রমেশের কথার দিকে লক্ষ্য না করিয়া বলিল—"আমি তাঁহার নিকট মন্ত্র লইব; তুমি লইবে কি?"

রমেশ—"কুল গুরুকে ত্যাগ করিয়া মন্ত্র লইতে বাবা মত দিবেন না। বিশেষ বিবাহ না করিয়া মন্ত্র লওয়া আমাদের কুল প্রথা নহে।"

সে দিন রমেশের সঙ্গে মণি বাড়ী চলিয়া আসিল। ইহার কয়েক দিন পরেই মণি দীনানন্দের নিকট হইতে যথা রীতি মন্ত্র লইয়া দীক্ষা গ্রহণ করিল।

মণির মা প্রতিবাদ করিয়াছিলেন—"কুল গুরু ত্যাগ করিলে মহা পাপ হয়, এমন কুকাণ্ড তুই কখনও করিস্ না।"

মণি উত্তরে বলিয়াছিল—"গুরু ঠাকুর মহাশয়—বৎসর বৎসর আসিতে কষ্ট হয় বলিয়া যখন এককালীন কয়েক বৎসরের বার্ষিক অগ্রিম লইয়া গিয়াছিলেন তখনই আমি বলিয়াছিলাম, গুরুর অদর্শনে যদি শিষ্যের মন তাহার প্রতি বিমুখ না হইবার কারণ হয় এবং অর্থই যদি গুরু শিষ্যের

তৎপূর্ব্বে কাহারো মৃত্যু হইলে কিরূপে পাপের ক্ষয় বা স্বর্গলাভ ঘটিতে পারে? বাস্তবিক এই মতটি প্রাচীন কালে প্রচলিত ছিলনা। কালী, কৃষ্ণ বা রামের হাতে মরিলে পাপমুক্ত হইয়া স্বর্গে গমন করিবে, পৌরাণিক যুগে এই মত প্রচারিত হইয়াছে। বাল্মীকি রামায়ণের উত্তর কাণ্ড মূলগ্রন্থের দীর্ঘকাল পরে রচিত। সেই উত্তর কাণ্ড রচনার সময়েও এইমত প্রচারিত হয় নাই। উত্তরকাণ্ডের একটি আখ্যায়িকা এই—কোন সময়ে এক ব্রাহ্মণ সন্তমৃত শিশু সন্তানের শব লইয়া রামের নিকট উপস্থিত হইলে রাম প্রতিকার মানসে অনেক অনুসন্ধানের পর দেখিতে পান এক শূদ্র স্বর্গ কামনায় তপস্যা করিতেছে। শূদ্র তপস্যার অনধিকারী এবং এই অনধিকার প্রবেশই দ্বিজপুত্রের অকাল মৃত্যুর কারণ মনে করিয়া ধার্ম্মিক রাজা তৎক্ষণাৎ তাহার শিরশ্ছেদ করেন,ইহাতেই দ্বিজ পুত্র পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠে। (উত্তর কাণ্ড একোননবতি সর্গ।) কিন্তু এখানে রাম কর্ত্তৃক নিহত হইয়া যে শূদ্র তপস্বী স্বর্গের অধিকারী হইল, এমন কোন কথা লিখিত নাই। বরং ইহার বিপরীত কথাই আছে। শূদ্র হইয়া স্বর্গ কামনা করিয়াছিল; রাম তাহার শিরশ্ছেদ করাতে সে স্বর্গে যাইতে পারিল না। এই কারণেই দেবগণ রামকে সাধুবাদ করেন এবং বর প্রদান করিতে চাহিয়াছিলেন।

কালিদাসের সময়ে বিশ্বাসের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। রঘুবংশ পঞ্চদশ সর্গে ৫৩ সংখ্যক শ্লোকে মহাকবি বলিতেছেন

কৃতদণ্ডঃ স্বয়ং রাজ্ঞা লেভেঃ শূদ্র সতাং গতিম্।
তপসা দুশ্চরেণাপি ন স্বমার্গ বিলঙ্ঘিণা॥

অর্থাৎ, তপস্যার অনধিকারী শূদ্র কঠোর তপস্যা করিয়াও যে ফল লাভ করিতে পারিত না, রামের হস্তে নিহত হইয়া সেই ফল লাভ করিল।

আনুষঙ্গিক আর একটী প্রশ্ন করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। স্বর্গলাভ যদি সুকৃতির ফল হয়, তবে সেই স্বর্গ কিরূপে অসুরেরা বল পূর্ব্বক অধিকার করিয়া লইতে পারে? ইন্দ্র যম প্রভৃতির অধিকার অর্থাৎ রাজকার্য্য যদি বিধাতৃ নির্দ্দিষ্ট হয়, তবে তাহাই বা কিরূপে অসুরেরা বল পূর্ব্বক হরণ করিয়া লইয়া যাইতে পারে? যজ্ঞ করিলে সুকৃতি হয় এবং সেই যজ্ঞ ভাগ দেবতারা পাইয়া থাকেন, ইহা যদি বিধাতার বিধান, তবে অসুরেরা কিরূপে সেই যজ্ঞ ভাগ বল পূর্ব্বক গ্রহণ করিতে পারে? চণ্ডীতে লিখিত আছে যে অসুরেরা স্বর্গ অধিকার এবং দেবতাদিগের অধিকার ও যজ্ঞ ভাগ বল পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছিল। বিচার প্রার্থনীয়।

শ্রীতারিণীকান্ত মজুমদার।

ভাই ভাই।

(অ)

বি, এ, পাশ-করা উপযুক্ত ভাই যখন জোর করিয়াই সর্ব্বজ্যেষ্ঠ মনোমোহন ভট্টাচার্য্যকে বাড়ীর বড় ঘরটি হইতে বাহির করিয়া দিয়া ছোট এক খানা খড়ের ঘর দেখাইয়া দিল, তখন পর্য্যন্তও পাড়ার সব লোক তাহাদের বাড়ীতে একত্র হয় নাই। কিন্তু মনোমোহন ভট্টাচার্য্যের পুত্র কমলাকান্তের আকুল ক্রন্দনে ক্ষণপরেই একে একে পাড়ার লোক সব জমায়েৎ হইতে লাগিল। গ্রামের মধ্যে এই ভট্টাচার্য্য বাড়ীটাই নাকি শিক্ষিত পরিবার। দুই ভাই গ্রাজুয়েট, এক ভাই পণ্ডিত, অপর ভাই যাজনিক ব্যবসায়ী পুরোহিত এবং চতুর্থ ভাই জিলা কংগ্রেস কমিটির প্রচারক ও বক্তা। ইনি অধিকাংশ সময়েই সহরে বাস করেন।

আজ যে-সময়ে সহসা এই গৃহ-বিচ্ছেদের প্রকাশ্য অভিনয়টা হইয়া গেল, তখন বাড়ীতে দুই ভাই ভিন্ন অপর কোনও সমর্থ পুরুষ উপস্থিত ছিলেন না। জ্যেষ্ঠ মনোমোহন স্মৃতিগিরি এবং তৃতীয় ভাই কালীমোহন ভট্টাচার্য্যই বাড়ীতে উপস্থিত। পাড়ার লোক একত্র হইয়া মনোমোহন ভট্টাচার্য্যের অবস্থা দর্শনে মর্ম্মাহত হইল। শুধু দুই একজন নবীন বয়সী বন্ধু কালীমোহনের বন্ধুত্ব মর্য্যাদা বিস্মৃত না হইয়া—ভাল হউক মন্দ হউক—তাহারই পক্ষ অবলম্বন করিল। শাস্ত্রে বলে বিপদ কালে যে সহায় সে-ই প্রকৃত বন্ধু। কিন্তু এইক্ষেত্রে কালীমোহনের যে বিপদটা কি, তাহা এখন পর্য্যন্তও জানিতে বাকী আছে।

বৃদ্ধ রামসুন্দর নন্দী সমবেদনার সুরে বলিয়া উঠিল হ্যা, বল কি মনো! ছোড়াটা তোমার গায়ে আঘাত পর্য্যন্ত করেছে? ছি ছি ছি! বড় ভায়ের গায়ে হাত-তোলা

ব্রাহ্মণ আর একখানা পাতি লিখিয়া দিলেন, মাঝি এবার হুসিয়ার হইয়া চলিয়া গেল।

(ঊ)

হাতে মাত্র একটি টাকা সম্বল, তাই মণ্ডিত মহাশয় রেলের ভরসায় চাহিয়া না থাকিয়া পদব্রজে বরুণা চলিয়াছেন। এ পথশ্রম তাহার নিত্য কর্ম্ম।

যথা সময়ে তিনি জমিদার রাধামাধব রায়ের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছেন। কাছারী ঘরের বারান্দায় পদক্ষেপ করিয়া ভিতরে চাহিয়াছেন অমনি তিনি চমকিয়া উঠিলেন; দেখিলেন, তাঁহারই কনিষ্ঠ কালীমোহন অপর দরজা দিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে। স্মৃতিগিরির অন্তরাত্মায় কে যেন একটা মুগুরের আঘাত করিয়া তাহার হর্ষোদ্দীপ্ত মুখে এক ভাড় কালি ঢালিয়া দিল। দুই ভায়ে পরস্পর আলাপ বন্ধ, তাই তিনি সহসা কালীমোহনকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না। কালীমোহন ও অবজ্ঞাভরে চোরের মত বাহির হইয়া গেল। একরক্তে গড়া ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি আজি আচারে ব্যবহারেও বিভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। কনিষ্ঠের শত্রুতা বুঝি এতই প্রবল! শত্রুতা যে শুধু এইখানেই শেষ হইল, তাহা নহে; ঘটক মহাশয়ের সহিত সাক্ষাতের পর স্মৃতিগিরি যখন জানিতে পারিলেন পাত্রী সুদক্ষিণার যত নম্বর দোষ না আছে, পাত্রীর মাতামহ বংশে নাকি তার চেয়ে ও বেশী নম্বর দোষ রহিয়াছে; অথচ পাত্রীর পিতা স্বয়ং একজন ঘোর দাগাবাজ, ধড়ীবাজ, মৎলববাজ ইত্যাদি, তখন পাত্রীর পিতা মূর্চ্ছা সামলাইতে পারিলেন না, ফরাসের উপর চলিয়া পড়িয়া গেলেন। একেত পূর্ব্বদিবসের একাহারে ও অল্পাহারে দুর্ব্বল শরীর, তদুপরি অদ্যকার সমগ্র দিনের অনাহার, তাহার উপর দীর্ঘ রাস্তা পরিভ্রমণ।

(ঋ)

তিন দিবস পরে বাড়ীতে আসিয়া মনো ভট্টাচার্য্য দেখেন এক তুমুল কাণ্ড উপস্থিত। সর্ব্ব কনিষ্ঠ রাসমোহন টেলিগ্রাম পাইয়া বাড়ী আসিয়াছে, বাট বণ্টনের লেখাপড়া হইবে। চতুর্থ ব্রজমোহন বড় বৌদির প্রেরিত লোকমুখে সমস্ত সংবাদ শুনিয়া কংগ্রেসের কার্য্য হইতে পাঁচ দিনের ছুটি লইয়া বাড়ীতে আসিয়াছে। ভায়ে ভায়ে ঘোরতর দ্বন্দ্ব উপস্থিত। একা ব্রজমোহন একদিকে আর অপর তিন ভাই একদিকে। ব্রজমোহন ও রাসমোহন উভয়েই অবিবাহিত। চব্বিশ বৎসর পূর্ণ না হইলে ব্রজমোহন বিবাহ করিবে না এই হেতুতে জ্যেষ্ঠের বিবাহের দায়ে কনিষ্ঠ রাসমোহনের বহু বিবাহ-প্রসঙ্গ বাতিল হইয়াছে, তাহাতে অনেক লাভেরও আশা ছিল। ব্রজমোহনের শরীরে অসুরের বল। কংগ্রেসে বক্তৃতাকালে সে প্রায়ই ফাঁক বুঝিয়া ভারতীয় আশ্রম ধর্ম্মের বর্ণনা প্রসঙ্গে ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্মের অশেষ প্রশংসা করে। ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা, সত্য ও অস্তেয় না থাকিলে যে আমাদের জাতির উদ্ধার কখনও হইবে না এই কথাই সে লম্বা গলায় বলিয়া থাকে। আর ঐ অহিংসা কথাটি যে মহাত্মা গান্ধী পাতঞ্জল দর্শন হইতেই সংগ্রহ করিয়া যোগধর্ম্ম ও যুগধর্ম্মের ইঙ্গিত করেন, তাহাও সে সুন্দর রকমেই ব্যাখ্যা করে। মুক্তি, মোক্ষ, স্বরাজ, আত্মলাভ ও নির্ব্বাণ প্রভৃতি যে একই পর্য্যায়ভুক্ত এবং স্বরাজলাভ যে চঞ্চলমতি যুবকদের অধিগন্তব্য নহে তাহাও ব্রহ্মচর্য্যের বক্তৃতা প্রসঙ্গেই বর্ণনা করে। আজ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃ-পত্নীর প্রতি কনিষ্ঠের কটূক্তি শুনিয়া ব্রজ-শার্দ্দূলের রক্ত পিপাসা বর্দ্ধিত হইয়াছে। কংগ্রেসের বক্তাকেও আজ আত্মরক্ষাচ্ছলে প্রকাণ্ড এক লগুড় দণ্ড গ্রহণ করিতে হইয়াছে। ব্রজমোহন ক্রোধারক্ত নয়নে অপর তিন ভাইর প্রতি তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছে, এমন সময় মনোভট্টাচার্য্য বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। একা আসিলে তত কিছুই লজ্জার কারণ ছিলনা, কিন্তু সঙ্গে যে বিদেশীয় দুইটি ভদ্রলোক এই বিসদৃশ ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছেন, ইহা ভাবিয়াই স্মৃতিগিরি মহাশয় থ বনিয়া গিয়াছেন। মাতৃ-পিতৃ-বিয়োগের পর যে রাসমোহনকে তিনি পুত্রাধিক স্নেহে প্রতিপালন করিয়া তাহার বি, এস্ সি পাঠ পর্য্যন্ত সর্ব্বপ্রকার খরচ জোগাইয়াছেন, চাইকি, পত্নীর একমাত্র স্বর্ণালঙ্কার মোহনমালার ছড়াটি পর্য্যন্ত বন্ধক রাখিয়া নিজে ঋণী হইয়াছেন, আজ সেই রাসমোহন কি না কালীমোহনের সঙ্গে সঙ্গে মাতৃসমা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃ বধূর অঙ্গে পাপহস্ত উত্তোলনে উদ্যত! ধিক তাহার শিক্ষায়। শিক্ষা যদি সুকোমল চরিত্রকে ভদ্র করিয়া গড়িয়া না তুলিয়া উহাকে লোহার মত দৃঢ় করিয়া দেয়, তবে সে শিক্ষার মর্য্যাদা কোথায়?

ভাস্করের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ প্রয়াসের পূর্ব্বেই যে চিত্রকরের কল্পনা সফলতা লাভ করিবে, এই অনুমানের মূলে কোন সন্দেহের সূত্র নাই। কেননা, মূর্ত্তিটী কল্পনা না করিয়া ভাস্কর তাহা খোদাই করিতে পারে না। ইহা সভ্যতার ক্রম বিকাশের ধারার একটী অভ্রান্ত সত্য সিদ্ধান্ত। সুতরাং যে স্থলে ভাস্করের মূর্ত্তি শিল্পের নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়, সে স্থলে যে আলেখ্য অঙ্কন বিদ্যা উন্নতি লাভ করিয়াছিল, তাহা রামায়ণে মনুষ্য অঙ্কনের কোন উল্লেখ না থাকিলে ও অনুমান করা যায়।

তাহা হইলে এখন জিজ্ঞাস্য—রামায়ণে কোন মনুষ্য মূর্ত্তি অঙ্কনের আভাস বা উল্লেখ নাই কেন? সেকালে কি মনুষ্য মূর্ত্তি অঙ্কিত হইত না? যাহারা রামায়ণকে বৌদ্ধ যুগের কাব্য গ্রন্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে চান, তাঁহাদিগের পক্ষে এ বিষয়টী বিশেষ আলোচনার বিষয় বলিয়া মনে করি। বৌদ্ধ যুগে ভারতে ভাস্কর্য্য অসাধারণ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। মূর্ত্তি-চিত্রাঙ্কন রীতিও প্রসারতা লাভ করিয়াছিল। বৌদ্ধ যুগের পূর্ব্বের গ্রন্থ পাণিনিতেও প্রতিকৃতি শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়।

পাণিনির একটী সূত্রে আছে "ইবে প্রতিকৃতৌ" ৫।৩।৯৬

রামায়ণে ভাস্কর্য্য নির্দ্দেশক 'প্রতিমা' শব্দ আছে কিন্তু চিত্র শিল্পের আভাস দ্যোতক প্রতিকৃতি বা এইরূপ অর্থ নির্দ্দেশক কোন শব্দ নাই। তবে কি সেই সুপ্রাচীন যুগে চিত্র শিল্পে লতা, পাতা, ফুল পক্ষী ও নানারূপ আলিম্পন ব্যতীত মনুষ্য চিত্র অঙ্কনের নিয়ম ছিলনা?

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ঠিক তাহাই বলেন। "বিষ্ণু-ধর্ম্মোত্তর" গ্রন্থেও কতকটা এই ভাবের আভাস আছে। অতি প্রাচীন কালে আর্য্য জাতির মধ্যে মনুষ্য মূর্ত্তি চিত্রণ প্রথা প্রচলিত ছিলনা। পরে মনুষ্য মূর্ত্তি অঙ্কন বিধি প্রবর্ত্তিত হয়, কিন্তু তখনও মূর্ত্তির চক্ষুদান বিধি শাস্ত্র বিরুদ্ধ ছিল। ক্রমে প্রতিকৃতি অঙ্কিত হইত বটে কিন্তু সকল স্থানেই যেকোন মূর্ত্তি বা চিত্র অঙ্কিত হইতে পারিত না। বাস গৃহে যাহা অঙ্কিত হইতে পারিত, রাজ সভা গৃহে তাহা পারিত না; রাজ সভা গৃহে যাহা অঙ্কিত হইতে পারিত, চৈত্য গৃহে তাহা রাখা যাইতে পারিত না। এইরূপ ক্রম বিকাশের পথে আসিয়া অন্যান্য যাবতীয়চিত্রের ন্যায় মনুষ্য চিত্রও উন্নত পর্য্যায়ে পঁহুছিয়াছিল। ইহার পর বৌদ্ধ যুগে পাশ্চাত্য প্রভাবের সংস্পর্শে ভারতীয় চিত্র-শিল্পের গতি পরিবর্ত্তিত হয়।

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য সম্বন্ধে কিন্তু তাহা নহে। এ বিষয় আর্য্য ভারতের সুনাম সভ্যতা গর্ব্বিত প্রতীচ্যেরাও স্বীকার করিয়া থাকেন।

রামায়ণের রচণাকাল যে পাণিনি রচনারও বহু পূর্ব্বের পরন্তু পাশ্চাত্য শিল্প প্রভাবে সমুন্নত বৌদ্ধ যুগের নয়, রামায়ণে ভাস্কর্য্যের প্রভাব ও প্রতিকৃতি চিত্রন নৈপুণ্যের অভাব—তাহা স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিতেছে বলিয়া আমাদের মনে হয়।

এই প্রসঙ্গে আমরা ভারতীয় চিত্র শিল্প সম্বন্ধে "The Oracle Encyclopædiaর" মতটী পাঠকগণের আলোচনার জন্য নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি: চিত্র সম্বন্ধে সুপ্রাচীন বৈদিক যুগে যে নিষেধ-বিধি ছিল, তাহাই যে ভারতীয় শিল্পকে মনুষ্য প্রতিকৃতি চিত্রাঙ্কন বিষয়ে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছিল এবং তাহাই যে বাল্মীকির ন্যায় মহাকবির কল্পনাকেও মূক করিয়া দিয়াছিল, তাহা অনুমান করা যায়। উক্ত গ্রন্থের Painting প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে—"of the Arts of India, China, Persia and Japan it is unnecessary here to speak as they are sculptural and archetectural or decorative, rather than pictorial."

আমাদের মনে হয় বৈদিক যুগের সন্নিহিত সেই সুপ্রাচীন রামায়ণী যুগেও প্রতিকৃতি চিত্রনের বিধি ছিল না; সেই জন্যই আমরা কোন চিত্র গৃহেই মূর্ত্তি চিত্রনের উল্লেখ দেখিতে পাই না।

চিত্রলিপি পৃথিবীর অতি প্রাচীন লিপি। পৃথিবীর অন্যান্য প্রাচীন জাতির ন্যায় ভারতীয় আর্য্যেরাও এই লিপি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। রামায়ণে চিত্র-লিপির আভাস আছে; লিপি বিজ্ঞান প্রসঙ্গে আমরা তাহার আলোচনা করিব।

সাহিত্য সংবাদ।

গত ১লা ও ২রা আষাঢ় কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিম-ভবনে বঙ্কিম-সম্মিলন এবং ৮ই ও ৯ই আষাঢ় নৈহাটীতে বঙ্গীয় চতুর্দ্দশ সাহিত্য সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। পঞ্চদশ সাহিত্য সম্মিলন রাঁধানগর রামমোহন-ভবনে হইবে।

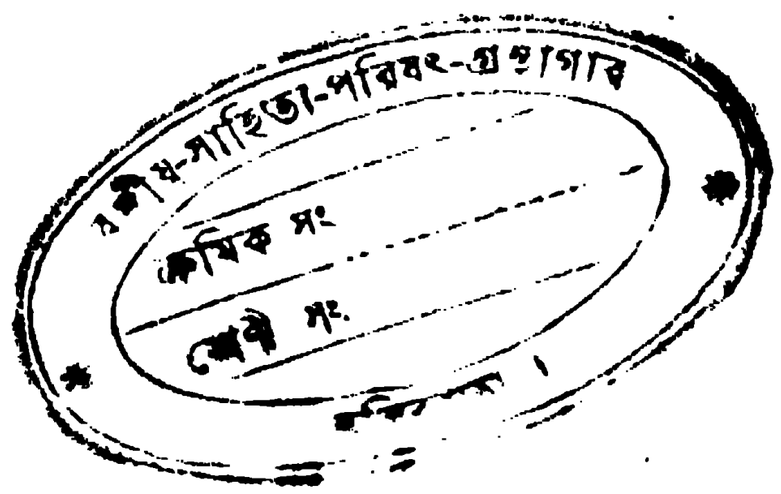
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং.

'ডুব দিয়ে এই প্রাণ সাগরে
নিতেছি প্রাণ রক্তভরে
আমায় ঘিরে আকাশ ফিরে
বাতাস বহে যায়'।

ইহাই গীতাঞ্জলির গীতাভাস। কবি এই বিশ্বযোগে নূতন প্রাণ লাভ করিয়াছেন। তাঁহার মুখের পুরাতন ভাষা নবীন হইয়া গুঞ্জরিয়া উঠিয়াছে। বলিতেছেন—

"পুরাতন পথ শেষ হয়ে গেল যেথা
সেথায় আমারে আনলে নূতন দেশে।'

ইহা যেন 'নিষ্ক্রমণের'ই পুরাতন রাগিণী। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের" মতো আবার তিনি নূতন আবেগে গাহিয়া ছুটিয়াছেন। নিষ্ক্রমণের উদ্যম আবার তাঁহার মাঝে যেন ফিরিয়া আসিয়াছে। কবি-জীবনে প্রভাতের অরুণরাগের আভাস সন্ধ্যার রক্তিম আভায় যেন পাইতেছি। তাই মনে হয়, কবি-জীবনের এই বিবর্ত্তন অতি স্বাভাবিক।

রাত্রির সৌন্দর্য্যেই কবিজীবন এখন উদ্ভাসিত। তাহার বর্ণনা অবকাশ পাইলে আর একদিন করিব। আজ কথান্তরে কবি-প্রভাব সম্বন্ধে একটু বলিয়াই প্রবন্ধ শেষ করিব।

দেশকালপাত্রভেদে কবি-প্রভাব এক এক ভাবে অনুভূত হয়। উপস্থিতকালে আমাদের এই বাঙ্গালী কবির কোন্ প্রভাব বা কিরূপ প্রভাব বাংলা দেশে, বিশেষতঃ বাঙ্গালী যুবককে উদ্‌বোধিত করে ও করিবে, তাহার আলোচনা এ প্রবন্ধে করিলে অসঙ্গত হইবে না।

আমরা দেখিয়াছি, কবি রবীন্দ্রনাথে একটা জিনিষ খুব স্পষ্ট হইয়াছে উহা তাঁহার প্রাণের আবেগ। তদীয় কাব্যজীবনের প্রথম অবস্থা হইতে এই পরিণত অবস্থা পর্য্যন্ত উহা সমভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমাদের এই জীবনকে আমরা উপেক্ষা করিব না—সংসারের—নানা বাধা বিঘ্ন ব্যর্থতার মাঝেও জীবনানুভূতিকে কখনও ভুলিব না—সকল দীনতা হীনতার উপর জীবনের, শুধু জীবন পাইবার, শুধু জীবনপথে চলিবার আনন্দকেই বুকিয়া লইব—সমস্ত পরিবর্ত্তন আবর্ত্তনের মধ্যে, জরামৃত্যুর বন্ধনে জীবনকে জীবন বলিয়াই মানিব—বিশ্বাস রাখিব, উহা, অজর, অমর, অচঞ্চল—অসীম মহত্ত্ব, অপরিসীম সৌন্দর্য্য উহাতে নিহিত—উহাই আমাদের সত্য; ধ্রুব; আমাদের এ বিশ্বাসের আবেগ আমাদের পরস্পরকে নিকটতর করিয়া তুলিবে—আমাদের সহিত আমাদের পারিপার্শ্বিকের একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্বন্ধ স্থাপন করিবে—প্রাণের উচ্ছ্বাসে বাতাসে আকাশে পৃথিবীতে আমরা ছুটিয়া ফিরিব—আলোর গীতে আঁধারের গমকে আমরা গাহিয়া উঠিব আমাদের জীবনগান,—বিস্ময়মুগ্ধ সমগ্রবিশ্ব আমাদের গান শুনিয়া আত্মহারা হইবে;—কবি ইহাই গাহিতেছেন।

আমাদের দৈন্যজীর্ণ সঙ্কীর্ণ অবস্থার গণ্ডীকে ঘৃণাভরে অবহেলা করিয়া কখনো তিনি বলিয়া উঠিয়াছেন

ইহার চেয়ে হতেম যদি
আরব বিদুয়িন!
চরণতলে বিশাল মরু
দিগন্তে বিলীন!
ছুটেছে ঘোড়া উড়েছে বালি
জীবনস্রোত আকাশে ঢালি
হৃদয়তলে বহ্নি জ্বালি
চলেছি নিশিদিন
বর্ষা হাতে ভরসা প্রাণে, সদাই নিরুদ্দেশ
মরুর ঝড় যেমন বহে
সকল বাধাহীন।

কখনো বা মত্ত উল্লাসে তিনি গাহিয়াছেন

নিমেষতরে ইচ্ছাকরে
বিকট উল্লাসে,
সকল টুটে যাইতে ছুটে
জীবন উচ্ছ্বাসে।
শূন্যব্যোম অপারমনে
মন্থসম করিতে পান
মুক্ত করি রুদ্ধ প্রাণ
ঊর্দ্ধনীলাকাশে।

অনেকে বলিয়া থাকেন রবিবাবুর আজকালিকার কবিতাসমূহে একটী উদাসীভাব—একটা "যাই যাই" ভাব—জীবনের একটী পরিসমাপ্তি হোক, এমন কোনও ভাব যেন ফুটিয়া থাকে; এবং এতে যেন তাঁহার জীবনাবেগ

কমিয়া আসিতেছে বলিয়াই বোধ হয়। আমি বলিব, এই লোক হইতে লোকান্তরে যাইবার ইচ্ছায়, জীবনের পরিসমাপ্তির কথায়, কবির জীবনাবেগ একটা নূতনত্ববোধের অন্বেষণেই উদ্দাম গতিতে ছুটিতেছে। ইহা তাঁহার জীবনেরই একটা নূতন বৃহৎ অনুভূতি।

আর আমি দেখিতেছি, এই যে ব্যগ্র জীবনানুভূতি, উচ্ছ্বসিত প্রাণের আবেগ, যাহা কবির যাত্রাপথে 'নিষ্ক্রমণ' হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত বন্যার প্লাবনে বহিয়া চলিয়াছে—ইহার প্রভাবই বাঙ্গালী জাতীয় ইতিহাসের বর্ত্তমান নবযুগে বাংলার যুবক সম্প্রদায়ের উপর সর্ব্বাপেক্ষা বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে ও করিবে। জীবন বোধের যে চাঞ্চল্য আমাদের বর্ত্তমান জাতীয় জীবনের অংশে অংশে সাড়া দিতেছে, তাহার সহিত কবির কাব্য জীবনের এই প্রধান সুর মিলাইয়া দেখিলেই উল্লিখিত মতের যথার্থতা উপলব্ধি হইবে। বর্ত্তমান যুগ বাংলার নব জাগরণের যুগ। রবীন্দ্রনাথ এই নবজাগরণেরই প্রধান কবি।

শ্রীসুধীরচন্দ্র ভাদুড়ী এম, এ,

"বউ কথা কও"

দজ্জাল শাশুড়ী ওই ফিরিছে ডাকিয়া!
কেন সাধো এবে "বউ কথা কও" বলি'?
ছিল না কি পূর্ব্বে মনে? মরমে মরিয়া
নিয়ত কেঁদেছে বধূ! তাই গেছে চলি'!
মিছাই চেঁচাও, পাখী; বৃথা ও কাকলি!
আর না আসিবে ফিরি'! জ্বালা না সহিবে
আর! সাধো না সতই কেন, না কহিবে
কথা পুনঃ! চলে' গেছে সহিয়া সকলি,
ননদ শাশুড়ী-জ্বালা নিশিদিনমান!—
ওলো বধূ, কোথা একা কাঁদো অনিবার!
গলা ছেড়ে গাহো, দেশ শুনুক সে গান!
ননদ-শাশুড়ী করে বড় অত্যাচার!
তোর সম ঘরে ঘরে বঙ্গকুলবালা
সহিতেছে প্রতিদিন কত শত জ্বালা!

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

স্নেহের দান।

(১১)

মণির মা প্রথম যখন শুনিলেন, মণি স্বামীজীর সহিত 'কারণ' নাম করিয়া মদ ও সিদ্ধির নাম করিয়া গাঁজা খায় এবং আশ্রমের শিষ্যা স্ত্রীলোকদিগের সহিত নিঃসঙ্কুচে চলা ফিরা করে, তখন তিনি তাহা ছেলের চোখ মুখ ফুটিবার লক্ষণ বলিয়া মনে করিলেন; এবং ছেলের যে স্বর্গীয় কর্ত্তাদের হাব্‌ভাব অল্পে অল্পে আয়ত্ব হইতেছে, তাহা ভাবিয়া গর্ব্ব অনুভব করিলেন। তিনি ভাবিলেন মন্দ কি? জমিদারী চাল চলন বজায় রাখিতে হইলে লোক দেখানো সব পদই আয়ত্ব থাকা চাই। হয়ত এইরূপে মাখনের ক্ষুদ্র দৃষ্টির প্রভাবটা কাটিয়া যাইবে। এইরূপ আশ্বাসের ভাবের ভিতরও একটু চিন্তার ভাব যে তাঁহার মনে না আসিত, তাহা নহে। কিন্তু মণি কি তেমন মানুষ! সে কি মাতাল হইয়া স্বর্গীয় কর্ত্তার ন্যায় অচেতন হইয়া পড়িয়া থাকিবে? তেমন মানুষ যে মণি কোন দিনই নয়!

স্বর্গীয় কর্ত্তার অবস্থা মনে হইলেই মণির মার মন সিহরিয়া উঠিত। ছেলের স্বভাবের প্রতি মায়ের মন কিছুতেই এতখানি অগ্রসর হইতে পারিত না।

মণির মা'র মনে এইরূপ দ্বন্দের ভাব সময় সময় হইত এবং তাহা তাঁহার ভাবের অনুকূলেই মীমাংসা হইত।

অবশেষে এক দিন এই দ্বন্দ ভাব কাটিয়া গেল, মা ছেলের অবস্থা দেখিয়া আকুল হইয়া পড়িলেন।

জমিদার বাড়ীর প্রায় অন্দর বাড়ীর ভিতরই স্বামীজীর শ্রীপাট স্থাপিত হইয়াছে। মণিমোহন সারাদিন মদে বিভোর থাকিয়া তাহার গুরুভ্রাতা ও ভগ্নী দিগের সহিত আহার বিহার, শয়ন উপবেশন ও কীর্ত্তনাদি করিয়া থাকে। স্বামীজী এই পন্থাই মণির ধর্ম্মজীবন লাভের প্রকৃষ্ট পন্থা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মণির জমিদারী শাসন করেন স্বয়ং স্বামীজী। মণি স্বামীজীকে তাহার স্থলবর্ত্তী করিয়া দিয়া নিজে গুরুর আদেশে ভোগের পথে সিদ্ধির দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে।

কি আর সংবাদ পাঠাইবার লোক আছে? আমি যে আজ আপন ঘরে কাঙ্গালিনী। তুমি কবিরাজ মহাশয়কে একবার না ডাকিয়া দিলে হইবে না। আমার যে আর পরামর্শেরও স্থান নাই।"

গোপী দুই হাত জোড় করিয়া বলিল—"যান মা, আমি কবিরাজ ঠাকুরকে লইয়া আসিতেছি—আমার ভাতটা....."

কর্ত্রী বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন -'তুমি রাধিতেছ রামুর বাপ, রমার মা, বউ—তারা সব কোথায়?

গোপীর অন্তরে তুফান ছুটিল, চক্ষে পুনরায় জলধারা বহিল। সে বলিল—"কি আর বলিব মা—মণি আমার কুলে কলঙ্ক দিল; মা, সকলেই স্বামীজীর শিষ্য হইয়াছে—বার চৌদ্দ বছরের মেয়ে, আঠার বছরের বউ—আমার সে দিকে যাইবার হুকুম নাই। আজ চার দিন তারা বাড়ী ছাড়া। মণি—মা—মণি ....

"বলিতে বলিতে বৃদ্ধ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

কর্ত্রী বলিলেন—"কোথায়, আমি তো মামুর মাকে রামুর বৌকে বা ক্ষেমিকে আমাদের বাড়ীতে দেখি নাই।

গোপী—"আপনি কি আর বাহিরে যাইতে পারেন মা? বাহের খণ্ডে, মধ্য খণ্ডে, পূজার খণ্ডে, কাছারী খণ্ডে, বাগান বাড়ীতে, পুকুর পাড়ে, অতিথি খণ্ডে—ঘরে ঘরে কীর্ত্তন—ঘরে ঘরে মাগি মর্দ্দে লাফাইতেছে—দশা পড়িতেছে। কি বিতিগিচ্ছা কাণ্ড—মা জাত আর রইল না? বুড়ী মাগিটা পর্য্যন্ত ঘরের বাহির হইয়া গেল। স্বামীজী বলিতেই অজ্ঞান—পাড়াকে পাড়া উজার। কত বদমাহেশ যে জুটিয়াছে মা, সে কি আর বলিব? মণি সর্ব্বনাশ করিল ম, দেশের কুল মজাইল। খাল কাটিয়া কুমীর আনিয়া নিজেরও সর্ব্বনাশ করিল—পরের...

কর্ত্রী বিস্ময়ের সহিত বলিলেন "কাছারী খণ্ডে, পুকুর পাড়ে নাচ হয়, তবে কাছারী জমে কোথায়?"

গোপীও বিস্ময়ের সহিত বলিল—"মা আপনি কি কিছুই জানেন না? কাছারী কবে এখান হইতে সরান হইয়াছে! কাছারী হয় সেই জীবানন্দ আশ্রমে, এখানে বাহিরের জন মানব আসিবার উপায় নাই। ছোট হিস্তার ম্যানেজারও দুই হিস্তার পথঘাট-সংস্রব সব বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের কোন লোকও এবাড়ীতে আইসে না। মণি অধঃপাতে গেল মা! নিজেতো গেলই, দেশের মুখে কলঙ্ক দিয়া গেল। মা. মদ, গাঁজা, সন্দেশ, লুচি, মাংস-জীবাশ্রম হইতে অনবরত আসিতেছে—এসংসার কি আর থাকিতে পারে মা? বড় কুঠি হইতে রোজ হণ্ডিতে টাকা কর্জ্জ হইতেছে।"

বৃদ্ধ গোপীর দুঃখের কথা শুনিয়া প্রথমে কর্ত্রীর মনটা কিছু পাতলা হইয়াছিল। গোপীর দীর্ঘ নিশ্বাসের অভিসম্পাত ভয়ে ও প্রত্যক্ষ বিপদ গুলির কথা শুনিয়া কর্ত্রী পুনরায় বিচলিত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু উপায় কি?

কর্ত্রী গোপীকে ভরসা দিয়া বলিলেন— রামার বাপ মণিকে তুমি অভিসম্পাত করিও না; আশীর্ব্বাদ কর, ভগবানের ইচ্ছায় তাহার সুমতী হউক; তুমি কবিরাজ মহাশয়কে লইয়া আইস। মণি আমার এমন ছেলে নয়। আমি একবার তাহাকে পাইলেই হইত।"

কর্ত্রী গোপীকে শীঘ্র যাইতে অনুরোধ করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া আসিলেন এবং আসিয়া নিজ দালানের কান অংশে কাহাকেও অধিকার দিবেন না সঙ্কল্প করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

বৃদ্ধকবিরাজ মহাশয় গ্রামের মধ্যে বয়সে ও বুদ্ধিতে প্রবীন লোক। তিনি রাজবাড়ীর গৃহ চিকিৎসক। সুতরাং তাঁহার ভিতর বাড়ীতে যাইবার দ্বারা মুক্তছিল। গোপী ভাণ্ডারী তাঁহাকে লইয়া ভিড় ঠেলিয়া ভয়ে ভয়ে যাইয়া ভিতর বাড়ীতে উপস্থিত হইল। পথে এদিক সেদিক চাহিয়াও বারে বারে দেখিল বাড়ীর মেয়ে গুলিকেনি সে কোথাও দেখিতে পায়—তাহা সে পাইল না।

কবিরাজ মহাশয় আসিয়াছেন জানিয়া কর্ত্রী দ্বার খুলিয়া তাঁহাকে বসিতে দিলেন। তিনি বারান্দার চেয়াতে উপবেশন করিলে ভিতর হইতে গোপীকে মধ্যে উপলক্ষ্য রাখিয়া কবিরাজ মহাশয় শুনিতে পারেন এমন ভাবে কর্ত্রী তাঁহার নিজের দুর্দ্দশার কথা এবং স্বামীজীর অন্যকার দালান পরিত্যাগের আদেশ—তাহাকে সব বলিলেন এবং শেষ কাঁদিয়া কাটিয়া তাঁহার নিকট সদোপদেশ চাহিলেন।

আজ কর্ত্রীর নিকট "দরবার অসাধ্য, পুত্র অবাধ্য" তাই যাহার সহিত কোন দিন কখনও কোন কথা

সিদ্ধান্ত রহস্যের সূত্রানুসারে গণনা করিলে নিম্নলিখিত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শাকং ১৮৪১

একাঙ্কিবেদোনং ৪২১ (অঙ্কস্য বামাগতিঃ)

শাকমেকাঙ্কিবেদোনং ১৪২০ ; দ্বিঃ কৃত্বা ১৪২০

দশভির্হরেৎ ১৪২০ + ০

=১৪২

লব্ধেনচ পুনর্হীনং ১৪২

৬০) ১২৭৮

ষষ্ট্যাপ্তং ২১ (১৮=২১।১৮।০ (অয়নাংশ)

এই সূত্রানুসারে লব্ধ ফল ডাইরেক্টরী পঞ্জিকার প্রদত্ত ফলের সহিত ঐক্য হইতেছে। কিন্তু শুধু ঐ প্রক্রিয়াতে কোন প্রকৃত জ্যোতির্ব্বিদ বা গণিতজ্ঞ সন্তুষ্ট হইতে পারেন না। মূলে প্রবেশ করিতে হইবে।

প্রত্যেক পঞ্জিকারই ভূমিকায় বা "জ্যোতিষ বচনার্থে" লগ্ননিরূপণ সম্বন্ধে নিজেদের ভূয়সী কৃতিত্বের কথা উল্লেখ থাকে। কিন্তু ৫।৭।১০ বৎসরের পঞ্জিকা একত্র মিলাইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে ১০।১২ বৎসরের মধ্যে হয়ত একবারও লগ্ন মানের পরিবর্ত্তন করা হয় নাই।

যাহা হউক ; আমরা অয়নাংশ গণনার প্রকৃত নিয়ম ব্যাখ্যা সহ প্রদান করিতে চেষ্টা করিব।

প্রায় সকল পঞ্জিকায়ই জ্যোতিষ বচনার্থে "অয়নাংশ প্রকরণং" নাম দিয়া আরও কয়েক পংক্তি লিখিত থাকে। তথায় লিখিত আছে যে "সূর্য্য সিদ্ধান্ত মতে বার্ষিক অয়ন গতি ৫৪ বিকলা। "মেষের আদি বিন্দু হইতে সম্পাতের দূরত্বকে অয়নাংশ বলে"।

সুতরাং ৫৪ বিকলা $=\frac{৫৪}{৬০}$ কলা $=\frac{৫৪}{৬০\times৬০}$ অংশ $=\frac{৫৪}{৩৬০০}$ অংশ। ৪২১ শকের অন্তে অয়নাংশ শূন্য হইয়াছিল। তখন মেষ রাশির আদি বিন্দুতে বা মীন রাশির অন্ত্য বিন্দুতে অয়ন ছিল। অর্থাৎ তখন ৩০শে চৈত্র ও ৩০শে আশ্বিন দিবা রাত্রি সমান হইত। অয়নবিন্দু ৪২২ শকাব্দে ৫৪ বিকলা, ৪২৩ শকে ৫৪×২ বিকলা, ৪২৪ শকে ৫৪×৩ বিকলা, ইত্যাদি নিয়মে পশ্চাতে পড়িয়া গিয়াছিল। (১৮৪১—৪২১)=১৪২০ বৎসরে অয়ন বিন্দু কতদূর পশ্চাৎগামী হইয়াছিল তাহা অনুপাত দ্বারা বাহির করিতে হয়। এক বৎসরে ৫৪ বিকলা বা $\frac{৫৪}{৩৬০০}$ অংশ হইলে শাকমেকাঙ্কিবেদোন (১৮৪১—৪২১) বৎসরে কত হইবে ?

$$১ : (১৮৪১-৪২১) :: \frac{৯}{১০\times৬০} : ক ::$$

$$\therefore ক = \frac{১৪২০\times৯}{১০\times৬০}$$

$$= \frac{১৪২০\times৯}{১০} \times \frac{১}{৬০} = ১৪২০\times\frac{১}{১০}\times\frac{১}{৬০} \quad (১)$$

$$= ১৪২০\times\frac{(১০-১)}{১০}\times\frac{১}{৬০}$$

$$= ১৪২০\times(১-\frac{১}{১০})\times\frac{১}{৬০} \quad (২)$$

$$= (১৪২০-\frac{১৪২০}{১০})\times\frac{১}{৬০} \quad (৩)$$

$$= (১৪২০-১৪২)\frac{১}{৬০}$$

$$= ১২৭৮\times\frac{১}{৬০} = ২১।১৮।০$$

উল্লিখিত (১) চিহ্নিত স্থানে ১৪২০কে ১০ দ্বারা ভাগ করিয়া তৎপর ৯ দ্বারা গুণ করা অপেক্ষা (২) ও (৩) চিহ্নিত স্থানে ১৪২০ হইতে ১৪২০ এর এক দশমাংশ বিয়োগ করা অপেক্ষাকৃত সহজ। এই সহজ প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়াই মহামহোপাধ্যায় রাঘবানন্দ অয়নাংশ আনয়ণের শ্লোক রচনা করিয়াছেন। উল্লিখিত প্রক্রিয়া হইতে সহজেই অয়নাংশের মূল সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায়। মূল সিদ্ধান্তের বিষয় পূর্ব্বে লিখিয়া পরে সূত্র বা formulaর অবতারণা করিলে ভাল হইত। কিন্তু গ্রন্থকার, ভাষ্যকার, বা পঞ্জিকাকার কেহই তাহা করেন নাই। এই জন্যই গণিত জ্যোতিষ সর্ব্বাপেক্ষা দুরূহ শাস্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা যদি একটী একটী করিয়া এই সূত্রগুলির প্রকৃত অর্থ বাহির করিতে পারি, তবে জ্যোতিষ শাস্ত্র পুনর্জ্জীবন লাভ করিতে পারে। কিন্তু এরূপ কাজ বড়ই কঠিন। শিক্ষিত মহোদয়গণের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইলে সুফল লাভের আশা করা যায়। ভারতীয় জ্যোতিষে এইরূপ বহুমূল্য প্রচ্ছন্ন সত্য অনেক নিহিত আছে।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

ধাতু নির্ম্মিত পশুমূর্ত্তি (অ ১৫), কনক নির্ম্মিত মূর্ত্তি (অ ১৪), কাঞ্চন নির্ম্মিত মণি খচিত সিংহাসন (অ ২) স্বর্ণ ও রৌপ্য বেদিকা (অ ১০). সুবর্ণের ভদ্রাসন (অ ২৬), স্বর্ণমঞ্জরীপূর্ণ স্ফটিক ধবল চামর (ল ১১), (অ ২৬), স্বর্ণময় রথ (বা ৫৩), হস্তীও অশ্বের লৌহ বর্ম্ম (ল ৭৪), স্বর্ণরজ্জু (ল ১২০), কাঞ্চন কবচ (আ ৬৪), স্বর্ণমুষ্টি খর্গ (আ ৪৩), স্বর্ণ কিরিট (সু ১০), স্বর্ণ ও রজত মুদ্রা (অ ৩০), স্বর্ণ কমণ্ডলু (সু ১), স্বর্ণ কলসি (সু ১১), স্বর্ণ পত্র (সু ১), স্বর্ণ প্রদীপ (সু ১১), স্বর্ণখট্টা (অ ৯১), স্বর্ণ ময় হস্ত প্রক্ষালন পাত্র (অ ৯১). রজত নির্ম্মিত ভোজন পাত্র (বা ৫৩) কাংস্যময় দোহন পাত্র (বা ৭২), স্বর্ণাসন (সু ১), ভৃঙ্গার (অ ১৪), রৌপ্য পঞ্জর (ল ৬৫) ইত্যাদি।

স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্ম্মিত দ্রব্যাদির উল্লেখ ব্যতীত রামায়ণে অন্য হীন ধাতু-দ্রব্যের উল্লেখ বেশী দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার প্রধান কারণ এই যে রামায়ণ রাজ পরিবারেরই ইতিহাস। অযোধ্যা, লঙ্কা ও কিষ্কিন্ধ্যার বিভব বর্ণনায়ই রামায়ণ পূর্ণ; দারিদ্র-জীবনের কথা ইহাতে নাই। যুদ্ধাস্ত্র গুলি বোধ হয় সকলি লৌহ নির্ম্মিত ছিল; সে গুলির বিষয় যন্ত্র-বিজ্ঞান অধ্যায় বর্ণিত হইল।

রামায়ণী যুগে এক ধাতুর সহিত অন্য ধাতুর মিশ্রন দ্বারা যৌগিক ধাতু প্রস্তুত করিবার রীতি প্রচলিত ছিল কি না তাহা স্পষ্ট অবগত হওয়া যায় না। আমরা উপরে যে সকল ধাতু নির্ম্মিত দ্রব্যের উল্লেখ করিয়াছি তাহাতে কাংস্য দোহনার উল্লেখ আছে। কাংস্য একটী যৌগিক ধাতু। বালকাণ্ডের ৭২ সর্গে আছে—

" সুবর্ণ শৃঙ্গাঃ সম্পন্নাঃ সবৎসাঃ কাংস্যদোহনাঃ।
গবাং শত সহস্রাণি চত্বারি পুরুষ র্ষভ ॥২৩"

অর্থ—পুত্রাদির বিবাহ অন্তে গৃহে যাইয়া রাজা দশরথ চারিজন ব্রাহ্মণকে বৎস ও কাংস্য দোহন ভাণ্ডসহ গাভী দান করিয়াছিলেন। সুতরাং এই যৌগিকধাতুটীর কথা আমরা রামায়ণে পাই।

কোন বৈদিক সাহিত্যে কাংস্যের উল্লেখ নাই। বুদ্ধদেবের সমসাময়িক সুশ্রুতের নামে যে আয়ুর্ব্বেদের প্রাচীন গ্রন্থ প্রচলিত আছে, সেই সুপ্রাচীন "সুশ্রুতে" কাংস্যের উল্লেখ আছে। (১)

(১) সুশ্রুত সূত্রস্থান ৪৬অঃ ৩৩৩ শ্লোক।

প্রাচীন ভারতে তাম্র ও টিন (ত্রপু) যে পরিচিত ছিল, তাহার উল্লেখ আমরা করিয়াছি। স্মৃতি শাস্ত্রে এই দুটী ধাতুর পরস্পর যোগে যে কাংস্য উৎপন্ন হয় তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা—

ত্রপুতাম্রয়োঃ সংযোগে ধাত্বন্তরস্য কাংস্যস্যোৎপত্তি।"

স্মৃতির ব্যবস্থা যুগে যুগে প্রয়োজনানুসারে পরিবর্ত্তিত হইতেছে বলিয়া তাহার কথা কোন নির্দ্দিষ্ট কালের ঐতিহাসিক কথা বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না; সে জন্য আমরা ও এস্থলে এই উক্তিকে খুব বিধস্ত প্রাচীন প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেছি না।

পিত্তল আর একটী যৌগিক ধাতু। তাহা দস্তা ও তামার মিশ্রণে প্রস্তুত হয়। আরণ্য কাণ্ডের ২৯ সর্গে রূপক ভাবে পিত্তলের উল্লেখ এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

নিশাচর খর ক্রুদ্ধ হইয়া রামকে যে প্রত্যুত্তর দিয়াছিল, তাহার এক অংশে আছে :—

"সর্ব্বথা তু লঘুত্বং তে কথনেন বিদর্শিতম্।
সুবর্ণপ্রতিরূপেন তপ্তেনেব তুষাগ্নিনা ॥ ২০ "

অর্থ—তুষাগ্নির উত্তাপে স্বর্ণ প্রতিরূপ পিত্তলের যেমন মালিন্য লক্ষিত হয়, সেইরূপ আত্মশ্লাঘায় কেবল তোর লঘুতাই দৃষ্ট হইতেছে।"

সুবর্ণপ্রতিরূপ অর্থে তান্ত্রিক যুগে আধুনিক পিত্তলকে বুঝাইত। সেজন্য পিতলও রামায়ণী যুগে আবিষ্কৃত হয় নাই বলিয়াই মনে হয়।

রামায়ণে পারদের উল্লেখ আছে বটে কিন্তু তাহার কোন ব্যবহারের পরিচয় পাওয়া যায় না। পারার সংযোগে আধুনিক কালে সিন্দুর প্রস্তুত হয়; রামায়ণে সিন্দুরের উল্লেখ নাই। তখন মহিলারা সিন্দুর ব্যবহার করিত না; আধুনিক যাত্রাগানের শ্রীকৃষ্ণের মত গণ্ড পার্শ্বে রক্তবর্ণ মনঃশিলার তিলক ব্যবহার করিত। সীতা হনুমানকে বলিতেছেন :—

মনঃশিলায়াস্তিলকো গণ্ডপার্শ্বে নিবেশিতঃ।
ত্বয়া প্রনষ্টে তিলকে তং কিল স্মর্ত্তুমর্হসি ॥৫। সু ৪০

অর্থ—রাম যে মনঃশিলা দিয়া আমার গণ্ডপার্শ্বে তিলক করিয়া দিয়াছিলেন এই কথাটী রামকে স্মরণ করাইয়া দিও।

*মনঃশিলা ও একটী রক্তবর্ণ গিরিজ-ধাতু বিশেষ।

জন্য মনোনীত হইয়া থাকে। ৫ বৎসর মৌলিক গবেষণা করিয়া ছাত্রগণকে এক একটি প্রবন্ধ লিখিতে হয়। এই প্রবন্ধ কর্ত্তৃপক্ষের নিকট সন্তোষ জনক বিবেচিত হইলে ছাত্রগণ "হাকুসি" (Hakushi) অথবা "গাকুসি" (Gakushi) অর্থাৎ পি এইচ্ ডি, কিংবা এম. এ, উপাধি পাইয়া থাকেন। জাপানের শিক্ষা বিভাগের সর্ব্বোপরিকর্ত্তা —একজন কেবিনেট মন্ত্রী। একজন সম্পাদক কয়েকজন আইন পরামর্শ দাতা ও পরিদর্শন কর্ম্মচারী মন্ত্রী মহাশয়কে শিক্ষাবিভাগের কার্য্য পরিচালনে সাহায্য করিয়া থাকেন।

জাপানে যাহারা শিক্ষা মন্ত্রীর নিকট হইতে শিক্ষকতা করিবার সনন্দ না পায়, তাহারা শিক্ষক হইতে পারেন না! ভারতের ন্যায় জাপানে বি, টি, অথবা এম, টি পরীক্ষার প্রথা প্রচলিত নাই। উচ্চ নর্ম্মাল স্কুলের বি এ, উপাধী ধারী শিক্ষকগণ ললিতকলা ও সঙ্গীত বিদ্যালয়ের অধ্যাপক গণ এবং যাহারা সনদ পাওয়ার উপযোগী শিক্ষাবিভাগের পরীক্ষা পাস করিতে পারেন—তাঁহারা হাইস্কুলে শিক্ষকতা করিবার সনদ পাইয়া থাকেন। জাপানের প্রায় প্রত্যেক জেলাতেই একটা নর্ম্মাল স্কুল আছে। কয়েক বৎসর হইল সমগ্র জাপানে ৫৭ টা নর্ম্মাল স্কুল ছিল। আমাদের বাঙ্গালায় কেবল মাত্র ৫ টি নর্ম্মাল স্কুল। তার উপর আবার ব্যয় সংকোচ কমিটির তীব্র কটাক্ষ নিপতিত হইয়াছে। ভারতের নর্ম্মালস্কুলের ন্যায় জাপানের নর্ম্মাল স্কুলের ছাত্রগণকেও বেতন দিতে হয়না। তাঁহাদের খোরাক পোষাকের ব্যয় নর্ম্মাল স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ বহন করিয়া থাকেন। নর্ম্মাল স্কুলে পুরুষদের ৪ বৎসর ও মেয়েদের তিন বৎসর পড়িতে হয়।

উচ্চ নর্ম্মাল স্কুলের ব্যয় ভার জাপান গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং বহন করিয়া থাকেন। সেখানে মেয়ে পুরুষ সকলকেই ৪ বৎসর পড়িতে হয়।

ভারতের ন্যায় জাপানেও শিক্ষকতার আদর নাই। অন্য কাজের সুবিধা না হইলেই মানুষ গুরুগিরি খুঁজিয়া লয়। সেখানে শিক্ষকগণ এক স্কুলে বেশী দিন কাজ করেন না! যদি কেহ ১৫ বৎসর শিক্ষকতা করেন এবং তাঁহার বয়স ৬০ বৎসর হয়, তবে তিনি পেন্‌সন্ ভোগ করিতে পারেন। জাপানে শিক্ষকগণের পারিবারিক পেন্‌সনের প্রথা প্রচলিত আছে। দীর্ঘকাল শিক্ষকতার পর কোন শিক্ষকের মৃত্যু হইলে তাঁহার স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি পরিজনবর্গ পেন্‌সন্ ভোগ করিতে পারে। জাপানে হাইস্কুলের শিক্ষকের মাসিক বেতন ১ হইতে ৭ পাউণ্ড পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। কলেজের অধ্যাপকের মাসিক বেতন ৫ হইতে ২০ পাউণ্ডের বেশী হয় না।

জাপানের শিক্ষা অবৈতনিক নহে কিন্তু বাধ্যতা মূলক। মার্কিন যুক্তরাজ্যে কানাডায় ও ফ্রান্সে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতা মূলক ও অবৈতনিক। জার্ম্মেনিতে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতা মূলক কিন্তু অবৈতনিক নহে জাপান এবিষয়ে জার্ম্মেনির নীতি অনুসরণ করিতেছে। জাপানে গবর্ণমেণ্ট প্রতিবৎসর গড়ে একজনের শিক্ষার জন্য ৸৮ আনা ব্যয় করেন কিন্তু ভারতগবর্ণমেণ্ট মাত্র ৵০ আনা ব্যয় করিয়াই শিক্ষাবিভাগের ব্যয় সংকোচ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন।

জাপানে ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড অথবা গবর্ণমেণ্ট হইতে বিদ্যালয়ে সাহায্য দেওয়ার রীতি নাই। দুই একটা সরকারী বিদ্যালয় ব্যতীত প্রায় সকল স্কুলই সর্ব্ব সাধারণের ব্যয়ে পরিচালিত হয়। সেখানে ছাত্রগণকে বৃত্তি অথবা পুরস্কার দেওয়া হয় না। মাঝে মাঝে একান্ত প্রয়োজন হইলে দরিদ্র মেধাবী ছাত্রগণকে অর্থ সাহায্য করা হয়। কিন্তু ঐ সকল সাহায্য প্রাপ্ত ছাত্র কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে ঐ টাকা পরিশোধ করিতে বাধ্য হয়।

ভারতের ন্যায় জাপানী বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরাট লিখিত পরীক্ষা প্রণালী নাই। ছাত্রগণের প্রমোশন পরীক্ষার ফলের উপর নির্ভর করিলেও সেখানে হাতে কলমে লিখিয়া পরীক্ষা দিতে হয় না। সকল পরীক্ষাই মৌখিক; ছাপান প্রশ্নপত্র নাই পরীক্ষার ফিসও নাই। জাপানী ছাত্রগণ পরীক্ষায় নম্বর কম পাইলে অথবা ফেইল হইলে আত্মহাত্যা পর্য্যন্ত করিয়া থাকে। শিক্ষক ছাত্রগণকে কড়া শাসন করিলে তাহারা ধর্ম্মঘট করিয়া বসে। জাপানে শাসন শৃঙ্খলা রক্ষা করা বড়ই দুষ্কর।

রাজবিধি অনুসারে জাপানের ছোট বড় সকলকেই ৬ হইতে ১৪ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিতে হয়; ভারতে কিন্তু এমন কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই

এ ব্যাপারে গিন্নির জয় হইবে বুঝিয়া আমি কিরণকে বলিলাম—"মা, দেখ পাগল কেমন পরিষ্কার খাইয়াছে, একটী ভাত মাটীতে পড়ে নাই। তুমি থালা খানা ধুইয়া স্নান করিয়া ফেল। ওতে আর কি আসে যায়?"

কিরণ তাহাই করিল। পাগল তাহার ইচ্ছা পূর্ণ হইল দেখিয়া যেন মনে মনে প্রীতি অনুভব করিল।

আমি বলিলাম—"এখন তুমি বসো, আমি যাইয়া খাই; তার পর একত্র কলেজে যাইব। তুমি ততক্ষণ গান গাও।"

পটলা স্কুলে চলিয়া গিয়াছিল; সুতরাং খুব ভাল করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া আমি আহারে গেলাম।

গৃহিণীর মেজাজ তখন সপ্তমে চড়া তিনি কিরণকে সারা বাড়ীতে গোবর ছড়া দিতে আদেশ করিয়াও নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই।

গৃহিণীর কথায় কোন রূপ প্রতিবাদের আঁচ্ না দেখাইয়া তাড়াতাড়ি আহার করিতে লাগিলাম। কেবল মাঝে মাঝে দু একটা উপদেশ কথা মিজাজ বুঝিয়া সংক্ষেপে বলিয়া গেলাম।

আমি বলিলাম—"ছেলেটার চেহারায়ই দেখা যায়, ভদ্রলোকের ছেলে—মাথার বিকার হইয়াছে বোধহয়। ঘরে বিমাতা অথবা ঘরে একেবারেই কেউ নাই। অথবা যা তার কথার ভাবে, গানের ভাবে বুঝা যায়—প্রেমে নিরাশা; কিন্তু বেশ গায়! সুরটা আমার কানে হটাৎ যেন মধু ঢালিয়া দিয়াছে। কলেজ আজ একটায়, তাই লোকটার সুরটা একটু হারমোনিয়ামের সহিত মিলাইয়া নিব বলিয়া ডাকিয়াছি। তার পর, মানুষের অবস্থা দেখিয়া ঘৃণা করিতে নাই। ভগবান ঐরূপ কাঠামের ভিতরই নিয়ত বাস করেন। তাই লোকে বলে ভিক্ষুক ভগবান, দরিদ্র নারায়ণ।

গৃহিণীও বলিলেন, আমিও বলিলাম। কথার মাঝে মাঝে আমি এই কথা গুলি বলিয়া গেলাম।

আহার করিয়া আসিয়া দেখি, সেদিনকার দৈনিক বাঙ্গালা কাগজ খানা পাগল খুব মনোযোগের সহিত দেখিতেছে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "লেখা পড়া জান কি?"

পাগল প্রশ্ন করিল—"কিরণ কোথায়?

আমি—"খাইতে বসিয়াছে।"

পাগল—"বিবাহ হইয়াছে?"

আমি—"হইয়াছে।"

পাগল—"কত টাকা দিলে?"

আমি—"আমি গরীব মাষ্টার, টাকা কোথায় পাইব?"

পাগল—"ফল ভোগ করিতে হইবে।"

বলিয়াই পাগল গাইয়া উঠিল—

"ইহার লাগিয়া গেল গো চলিয়া,
পোষা পাখী খাচা হতে।"

রাগিণী থামাইয়া পাগল উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল "আমি আর আসিবনা, আমি আর আসিবনা; জীবনের ফল করিব সফল, এমনি করিয়া ঘুরিয়া। তোমাদের মনে যা ছিল বাসনা, যা ছিল কামনা, সকল তোমরা সফল—আর না"—বলিয়া দৈনিক খানা ঘরের কোণায় ছুড়িয়া ফেলিল।

দেখিলাম পাগলের কথা ও গান সকলি এক মিলের। অথচ কোন চরণের সহিত কোন চরণের মিল নাই। গদ্য কথা গুলিই যেন সুর করিয়া গাহিয়া যায়। তাহাতে মিল না থাকিলেও আছে--হৃদয়ের জমাট দুঃখের অভিব্যক্তি—দুঃখ প্রকাশের উদগ্র চেষ্টা!

আমি হারমোনিয়মে সুর ধরিতে চেষ্টা করিলাম। পাগল তাহার দিকে লক্ষ্য করিল না। আমি বলিলাম—"গাও'। পাগল নিরুত্তর।

জিজ্ঞাসা করিলাম "বাড়ী কোথায় তোমার?

"ভগবানের উদার উন্মুক্ত রাজ্যে।"

"পিতামাত বর্ত্তমান আছেন কি?"

"আপনার আছেন?"

"আছেন।"

"তবে আমারও আছেন।"

"বিবাহ করিয়াছ?"

পাগল গান ধরিল—

"আমি তোমার লাগিয়া দেশে দেশে যাব
ফিরিব কানন বন।"

আমি হারমোনিয়াম টিপিলাম। গান বন্ধ হইল।

পাগল চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "কি চাই?"

সম্প্রতি পুলিশ-তদন্তে যে বিবরণ বাহির হইয়াছে তাহা অতি শোচনীয়, অতি মর্ম্মান্তিক। আমরা নিম্নে তাহা প্রদান করিলাম। ইহা পাঠ করিয়া এই ধ্বংশোন্মুখ সমাজের চক্ষু ফুটিবে কি?

পাগলের নাম কমলাকান্ত ঘোষ। সে বি, এ, পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া ক্লাইভ ষ্ট্রীটে এক ব্যবসায়ীর ফার্ম্মে কাজ করিত। ছেলেকে বিবাহ করাইয়া পিতা মাতা যথেষ্ট প্রাপ্তির আশা করিয়াছিলেন। ছেলে পিতা মাতার সে আশা নির্ব্বাণ করিয়া দেয়। পাত্রী দেখিয়া কমলাকান্ত মুগ্ধ হইয়া যায়। তখন, অবস্থা বুঝিয়া পাত্রীর দরিদ্র পিতা, পাত্র পক্ষের উচ্চ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে সম্মত হন না। কমলাকান্তের আগ্রহে বিবাহ হইয়া যায়। ফলে নববধূ শ্বশুর ও শাশুড়ীর চক্ষের শূল হইয়া পড়েন। প্রবাসী কমলাকান্ত এ ব্যাপার কিছুই জানিত না।

কমলার স্ত্রীর নাম ছিল কিরণ। কিরণ যখন শুনিল, তাহার শাশুড়ী তাহার স্বামীর জন্য অন্য এক অবস্থাপন্ন ঘরে প্রচুর অর্থ লইয়া দ্বিতীয় পাত্রী মনোনীত করিয়াছেন; এবং স্বয়ং কমলাকান্তও সেই বিবাহে সম্মতি দিয়াছে এবং কেবল ঘরে দ্বিতীয় পত্নী আছে, এই অজুহাতে এই বিবাহ হইতে পারিতেছে না; তখন কিরণ স্বামীর ও শ্বশুর শাশুড়ীর অবস্থা বুঝিয়া স্বামীর আশা আকাঙ্ক্ষা ও সুখের পথ হইতে দূরে সরিয়া গেল। সে আত্মহত্যা করিয়া সকল জ্বালা জুড়াইল (?)।

মৃত্যুর পূর্ব্ব সময়ে কিরণ স্বামীকে যে চিঠি লিখিয়াছিল, এ সকল কথা তাহাতেই প্রকাশ। পাগল এ চিঠিখানা কবচরূপে আপনার শরীরে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল।

এই চিঠি পাঁইয়া কমলাকান্ত উন্মাদ হইয়া বাহির হয়। তখন পিতা পুত্রের জন্য সংবাদ পত্রের আশ্রয় গ্রহণ করেন।

কমলাকান্তের পরিণাম—নিষ্ঠুর সমাজ চক্ষু মেলিয়া দেখুন শিক্ষিতা নারী-সমাজও দেখুন! নারীর প্রতি নারীর কি নির্য্যাতন! সেই নির্য্যাতনের কি ভীষণ পরিণাম।"

* * *

গৃহিণী ও কিরণকে ডাকিয়া সেই করুণ কাহিনী পড়িয়া শুনাইলাম। পড়িতে পড়িতে চক্ষুর পাতা ভিজিয়া উঠিল, গৃহিণীর কঠিন প্রাণ সহানুভূতিতে দ্রব হইয়া পড়িল; কিরণের চক্ষু হইতে ধারা বহিয়া ছুটিল।

আমার কেবলি তখন মনে পড়িতেছিল সেই গানটী—

"সুধু সে রেখে গেছে আখর ক'টী গো।
রক্তে রাঙ্গাইয়া প্রাণের ব্যথা গো॥"

সাহিত্য সংবাদ।

পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানী ঢাকা হইতে "প্রাচী" নামে একখানা সচিত্র মাসিক পত্র গত আষাঢ় হইতে বাহির হইতেছে। আমরা নবীন সহযোগীর দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

বিগত ২০শে শ্রাবণ রবিবার বেলা ৫ ঘটিকার সময় সৌরভ কার্য্যালয়ে সৌরভ সম্মিলনের এক অধিবেশন হইয়াছিল। বৃদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সেন কবিরত্ন মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সহরের বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণ প্রায় সকলেই উপস্থিত ছিলেন। সুকবি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য "সুসং পাহাড়" ও "শিব-তাণ্ডব" এবং শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র কবিভূষণ-তত্ত্বনিধি ও শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র রায় যথাক্রমে "সুনিয়া রমনী" ও "কৃষ্ণানুসন্ধান" শীর্ষক কবিতাদ্বয় পাঠ করেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এস সি, বি, টি, "কালচক্র" নামক জ্যোতিষ বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করিলে সাহিত্য বিষয়ক নানা কথা আলোচনার পর সভার কার্য্য শেষ হয়।

সাহিত্য-সুহৃদ নীরব কর্ম্মী কামিনী কুমার সেন এম, এ বি এল মহাশয় গত ২০ শ্রাবণ রবিবার ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। "আরতি" পরিচালনে কামিনী বাবু আমাদের সাহায্যকারী ছিলেন, তখন তিনি এখানে তৎকালীন সিটী কলেজে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। ভগবান তাঁহার স্বর্গীয় আত্মার শান্তি বিধান করুন।

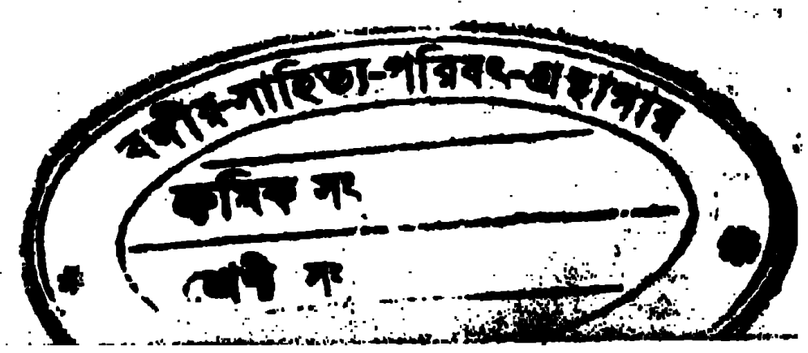

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
তালিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

সৌরভ

একাদশ বর্ষ। | ময়মনসিংহ, আশ্বিন, ১৩৩০। | নবম সংখ্যা।

ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যের পরিণাম।

কোনও জাতি কেবল মাত্র আত্ম সম্পদে সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। জাতির বিবিধ প্রকার অভাব মোচন করিতে হইলে বৈদেশিক পণ্যের উপর অনেকাংশে নির্ভর করিতে হয়। বৈদেশিক পণ্য ক্রয় করিতে হইলে নিজের প্রয়োজনাতিরিক্ত উৎপন্ন দ্রব্য রপ্তানী করিতে হয়। অবশ্য কোনও দেশ তাহার উৎপাদনী শক্তির সীমা অতিক্রম করিলে ঋণগ্রস্ত হইবে। প্রায় সমস্ত দেশই, যে সমস্ত পণ্য উৎপন্ন করে, তাহা দ্বারা তাহার অভাব নিবৃত্তি করিয়া অতিরিক্ত পণ্য সামগ্রী বিদেশে রপ্তানী করে। এই বৈদেশিক রপ্তানীর বিনিময়েই বিদেশ হইতে অন্যান্য অভাব নিবৃত্তির উপযোগী পণ্য সামগ্রী স্ব স্ব দেশে আমদানী হয়।

বাস্তব জগতে আমরা দেখিতে পাই যে কোনও দেশের অভাব নিবৃত্তির উপযোগী পণ্যগুলি সমস্তই কেবল নিজে উৎপাদন করিতে পারে না। অনেক ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক শক্তিগুলি বিরুদ্ধগামী হইয়া তাহার চেষ্টাকে বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলে; সুতরাং সেই ক্ষেত্রে প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া—যে সমস্ত পণ্যের উৎপাদন করিলে তাহার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা লাভজনক হয়—সেই সমস্ত পণ্যের উৎপাদনই সে করিবে এবং সেই সমস্ত পণ্যের প্রয়োজনাতিরিক্ত পণ্য দ্বারা অন্যান্য অভাব নিবৃত্তির উপযোগী দ্রব্য সম্ভার বিদেশ হইতে আমদানী করিবে। অনেক ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক শক্তি বিরুদ্ধগামী না হইলেও পণ্য বিশেষের উৎপাদনে দেশ বিশেষ ক্ষান্ত হয়—যদি উক্ত দেশ তদপেক্ষা লাভজনক অন্য কোন পণ্যোৎপাদনে তাহার সমস্ত শক্তি নিঃশেষিত করিতে সুবিধা পায়। মোট কথা যে ক্ষেত্রে লাভ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলিয়া প্রতীত হয়, সেই ক্ষেত্রেই উৎপাদনী শক্তির চালনা হয়। ইহাই উৎপাদনের মূল রহস্য। ইহা মনুষ্য স্বভাবের সনাতন নীতির উপরই প্রতিষ্ঠিত—যাহাকে আমরা ইংরেজীতে বলি—"Maximum of gain and minimum of labour." ধরুন, বাঙ্গালা দেশের চাষী যদি পাট উৎপাদন করিয়াই বেশী লাভ পায়, সেই ক্ষেত্রে সে কখনও তৎস্থলে তুলা কিংবা রেশম উৎপাদন করিতে যাইবে না। আবার দক্ষিণাত্য তুলা ছাড়িয়া পাট কিংবা রেশম, তথা আসাম রেশম ছাড়িয়া তুলা কিংবা পাট উৎপাদন করিতে কখনও প্রয়াসী হইবে না। বাস্তবিক, এই ভাবেই বিভিন্ন পণ্য স্ব স্ব উৎপত্তি স্থান বাছিয়া লয়: এই ভাবেই ইংলণ্ডে লৌহজাত দ্রব্য, কয়লা, কাপড় ইত্যাদি, ফ্রান্সে রেশম, মদ, ইত্যাদির, জাপানে রেশম, দেশলাই, প্রভৃতি, তথা ভারতে ধান, গম, পাট, তুলা, রেশম, পশম, কাপড়, চট প্রভৃতির উৎপাদন সম্ভাবনীয় হইয়াছে। ইহাকেই ইংরেজীতে "Geographical division of labour" বলে। এইরূপেই আমরা বেশ বুঝিতেছি যে পণ্যোৎপাদনের মূলতত্ত্বই হইতেছে—"Maximum of gain and minimum of labour. অর্থাৎ কোনও দেশ বিশেষের অর্থ (Capital) ও শ্রম (labour) সেই পরিমাণেই পণ্য সকল উৎপাদনে ব্যয়িত হইবে যে পরিমাণে শ্রম ও অর্থ ব্যয়ের সার্থকতা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী লভ্য দ্বারা উপলব্ধি করা যাইতে পারে।

উপর্য্যুক্ত আলোচনা হইতে আমরা আমদানী রপ্তানী বাণিজ্যের মূলতত্ত্ব কোথায়? তাহা বেশ বুঝিতে

ছোট কর্ত্রী—"আচ্ছা—পরীক্ষা শেষ হইলে একবার আসিতে লিখিব। সে স্বামীজীর কীর্ত্তি নীর্ত্তি সবই শুনিয়াছে, মণির গুণাগুণও সব জানিয়াছে। তুমিও একটা চিঠি লিখ। তোমার চিঠির আমার চিঠি অপেক্ষা একটু বেশী জোড় হইবে।"

বড় কর্ত্রী—"বোন, মণিকে একেবারে ভেড়া বানাইয়াছে ;শুনিতেছি, লোকটা কামরূপের সন্ন্যাসী ; সঙ্গেও অনেকগুলি ডাইনি পরী আছে—সব কামরূপের। আমার মণির কি হবে গো ?"

বড় কর্ত্রী কাঁদিতে লাগিলেন।

ছোট—"কাঁদিলে কি হইবে দিদি, সব কপালের লেখা। তুমি মাথনকে চিঠি লিখ। পারিলে যে নিশ্চয় আসিবে."

বড়—"আমাকে কে চিঠি লিখিয়া দিবে বোন্; আমি এখন কাঙ্গালের অপেক্ষাও কাঙ্গাল। আমার যে—আমার বলিতে কেউ নাই। নিজ বাড়ীতে আমার স্থান নাই ; পুত্র অবাধ্য, আমি যে শত্রু পুরীতে বাস করিতেছি। রাত যায় তো দিন যায় না, দিন যায় তো রাত যেন যায় না। এমন একটা লোক নাই, যাহাকে বলি—তুমি আমার এই কাজটা কর।".....

ছোট—"সে বন্দোবস্ত আমি করিয়া দিব দিদি ; আমার গোমস্তা তোমার চিঠি লিখিয়া দিবে। আর তোমার কাজের জন্য তুমি পচি, রামী, উমা যাহাকে ইচ্ছা, লইয়া যাও।"

কথায় কথায় রাত্রি হইয়া গেল দেখিয়া বড় কর্ত্রী বলিলেন—"তবে আজ যাই বোন্। বাড়ীতে মন টিকেনা, কাল আবার আসিব।"

"খালিমুখে যাইতে নাই দিদি! সেখানে তোমার কখন কি হবে ; কে কি দিবে ; যখন আসিয়াছ, আর একটু... .." বলিয়া ছোট কর্ত্রী উঠিয়া গেলেন।

ঠাকুর ঘরের বিকালী-প্রসাদ আসিয়াছিল। ছোট কর্ত্রী তাহাই বড় কর্ত্রীকে পরিবেশন করিলেন। বড় কর্ত্রী নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত তাহা হইতে মাত্র দুই টুকরা সন্দেশ লইলেন।

সন্দেশ খাইতে খাইতে বড় কর্ত্রী বলিলেন—"আমাদের তরফে এখন লক্ষ্মীনারায়ণের ভোগ উঠিয়া গিয়াছে। স্বামীজীর আহারের সময় ভোগের বাজনা বাজে। তাঁহার সম্মুখে দ্বিপ্রহরে ও সন্ধ্যায় ধূপ দীপে আরতি হয়। স্বামী সিল্কের ধুতি পরিয়া চেয়ারে বালাপোষের আসনে বসিয়া থাকেন। চারিদিকে নৃত্য হয়। দ্বিপ্রহরেও রাত্রিতে শয়ন করিলে মেয়েরা পা টিপিয়া দেয়। স্বামীজী শুইয়া শুইয়া গুড়গুড়িতে খাসিয়া তামাক মিশ্রিত গাঁজা ও চরস টানেন। বোন্, স্বর্গীয় কর্ত্তা যে এত করিতেন, তাহাতেও এগুলি দেখি নাই। মণি অবাক্ কাণ্ড সব দেখাইল।"

ছোট—"স্বামীজী খান্ কি দিদি ?"

বড়—"খান যে না কি, তাহাই বুঝিলাম না। রোজ একটী পাঁঠা তাহার নিজেরই বরাদ্দ। দোকানের সন্দেশ তিনি নাকি খান না ; সে জন্য ঢাকার বাঙ্গালা বাজারের আমির্ত্তিওয়ালা ও কলিকাতার ভীম নাগের বাড়ীর সন্দেশ ওয়ালা আনাইয়া জীবাশ্রমে বসান হইয়াছে। রোজ নাকি এক মণ সন্দেশ হয়। তাহাতে স্বামীজীর প্রাতে ও বৈকালে ভোগ হয়। রাত্রিতে লুচি মাংস, দ্বিপ্রহরে ঘৃত পক্ক আতপান্ন, পায়েস ইত্যাদি—রামার বাপ আরো কত বলিল। ভোগের পর ছোট সাধুরা প্রসাদ খান। শীতের সময় তিন শত টাকায় একখানা কাবুলী আলোয়ান ও আড়াই শত টাকায় এক জোড়া লেপ আসিয়াছে। সে লেপের কি খোল—কি ঝালর—দেখ্‌লে তুমি অবাক্ হইবে। স্বর্গীয় কর্ত্তা বেজায় বাজে খরচ করিয়াও বোন আড়াই শত টাকার লেপ দেখান নাই—মণি তাহা দেখাইল।..."

বড় কর্ত্রী উঠিলেন। ছোট কর্ত্রী উমাকে বলিলেন—"যা উমা, তুই-ই দিদির সঙ্গে থাক্ গিয়া। এখানে থাকিলে দিদি, তোমার ভাণ্ডার নিরাপদে থাকিবে না ; নতুবা তোমাকে এই নরকে আর কখনই যাইতে দিতাম না।

ছোট কর্ত্রীর সহানুভূতি পূর্ণ ব্যবহারে গলিয়া গিয়া বড় কর্ত্রী আর একবার চক্ষু জল ফেলিলেন। তারপর ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন। উমা লেণ্টার্ণ ধরিয়া আগে আগে চলিল।

খিরকী দরজা বন্ধ। উমা বলিল—"ও মা, উপায় ?"

কর্ত্রী বলিলেন—"জোরে ধাক্কা দে।"

উমা জোরে ধাক্কাইতে আরম্ভ করিল। একজন দরজা খুলিয়া বলিল—"স্বামীজীর হুকুম নাই—এ বাড়ী হইতে কেহ রাত্রিতে যায়, কি এখানে আসে।"

শিব তাণ্ডব।

(১)

একি উচ্ছল আলো উজ্জ্বল কালো-কজ্জল সঙ্গে !
দেখি দিনরাত চলে সঙ্ঘাত, নাশে উৎপাত রঙ্গে !
লহু-কর্দ্দম ছোটে হর্দ্দম, শিঙা বম্‌বম্ গর্জ্জে !
বহু সংসার হোলো সংহার, বীণা-ঝঙ্কার বর্জ্জে !
সহ দলবল জাগে দুর্ব্বল, সদা টলমল বিশ্ব !
কর সোম্‌সুৎ—কোথা প্রেত-ভূত ? এযে অদ্ভুত দৃশ্য !

(২)

বাজে গর্জ্জন করি' বর্জ্জন করো অর্জ্জন শক্তি !
কাজে উচ্ছ্বাস দৃঢ় বিশ্বাস আনো উল্লাস ভক্তি।
সহা বায় কই ? তাতা থৈথৈ নাচো নিত্যই বন্দী !
মহাদেব্ সাথ, করো দৃক্‌পাত, রাখো দিনরাত সন্ধি !
নিজে দুর্ব্বার, জাগো এইবার ! বসো দেব্‌তার অঙ্কে !
কিযে শঙ্কার ! করো হুঙ্কার ! ফোটো নিন্দার পঙ্কে !

(৩)

ওগো নির্ভয়, তুমি দুর্জ্জয় ! তব সব সয় বক্ষে !
ভোগো দুখ সুখ, ছাড়ো কৌতুক, রাখো তেজ টুক্ চক্ষে !
রহ আটপ'র সারা দিনভর অতি ঘৃণ্‌কর কর্ম্মে !
বহ চিন্তার বোঝা এন্‌তার ! মাতো বাঁচবার ধর্ম্মে !
তাঁবে দিনরাত সহ উৎপাত, অভিসম্পাত্-উক্তি !
যাবে যাক্ প্রাণ, রাখো সম্মান ; এযে নির্ব্বাণ মুক্তি !

(৪)

ধূধূ প্রান্তর, ধূধূ অন্তর ! জপো মন্তর চিত্তে !
শুধু মঙ্গল করো সম্বল ; বলো কোন্ ফল বিত্তে ?
করো হাঁসফাঁস্, ফ্যালো নিশ্বাস ! কোথা বিশ্বাস-লক্ষ্য ?
গড়ো আস্‌মান্ জোড়া উদ্যান ! কোথা প্রাণ্‌বান্ সখ্য ?
মিছে বোল্‌চাল্ শুনি আজকাল ! করো জ্ঞান বৃদ্ধি !
পিছে রইলেই ! তার ছুটছেই ! তোরা জাগলেই সিদ্ধি !

(৫)

জাগো ধার্ম্মিক ! জাগো ঋত্বিক ! এযে সাত্ত্বিক যুদ্ধ !
জাগো ঘর্ ঘর্ প্রীতি-নির্ঝর নাথো শঙ্কর বুদ্ধ !
বলে ভূলোক খোলে নির্ম্মোক কাঁপে স্বলোক-বংশ !
চলে মন্থন, গীতি-বন্ধন, সুধা-বণ্টন্-অংশ !
ধরো মর্ম্মর-দেহ বিস্তর ! জাগো সুর্-নর্-ত্যাজ্য !
করো বিষপান ! গাহো সামগান ! লভো সম্মান গ্রাহ্য !

(৬)

ওরে নির্লাজ, তোরা কই আজ ! সদা যমরাজ-ভক্ষ্য !
জোরে ক্রন্দন জানো ক্রন্দন ! শুধু নিন্দন্-দক্ষ !
নারী-অঞ্চল ছাড়ো চঞ্চল ! করো শৃঙ্খল ছিন্ন !
ভারী দিক্‌দার জাতি-উদ্ধার ! মোছো ধিক্কার-চিহ্ন !
হেসে খিলখিল চলো একদিল্ ভেঙে লাল নীল হর্ম্ম্য !
শেষে শূরবীর নব সৃষ্টির করো তদ্বির কর্ম্ম !

(৭)

গত গৌরব আনো বৈভব ! সাথে ভৈরব রুদ্র !
যত হাঁক্-ডাক করো নির্ব্বাক্ মিলে লাখ লাখ ক্ষুদ্র !
লাগে ভাই বোন ! আনো যৌবন ! হবে নন্দন তৈরী !
জাগো এক্‌জাই, ভীতি নাই নাই, নাশো এক্‌লাই বৈরী !
এযে প্রেতভূম্ ! নিশা নিঝ্‌ঝুম্ ! বাজে গুম্ গুম্ ডঙ্কা !
সেজে আয় সব জাতি-সম্ভব ! নাশি' বিপ্লব-শঙ্কা !

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রেম ধর্ম্ম ও তাহার ব্যভিচার।

আধুনিক বৈষ্ণব সমাজের নিম্নস্তরে যে সমস্ত বৈরাগী ও বৈষ্ণবী দৃষ্ট হয়, তাহাদের প্রতি সর্ব্বসাধারণের তেমন শ্রদ্ধা নাই। অনেক ক্ষেত্রে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুর মধ্য হইতে দূষিত চরিত্রের অনেক স্ত্রীলোক ও পুরুষ ভেক লইয়া বৈষ্ণবী বা বৈরাগী হয়। ফলে আখ্‌রাধারী বৈরাগী সম্প্রদায় একটী ব্যভিচারী সমাজে পরিণত হইয়াছে বলিয়া অনেকের ধারণা। অন্যদিকে আধুনিক বৈষ্ণব সমাজে, তথা-কথিত ভদ্র, ব্রাহ্মণ, এবং গুরু শ্রেণীতে একপ্রকার নূতন সাধন পদ্ধতির কথা শ্রুত হয়, তাহার নাম "কিশোরী ভজন"। তন্ত্রে স্ত্রীলোক লইয়া সাধনার কথা আছে। ইহারা বোধহয় তাহারই অনুসরণ করিয়া এই সাধন প্রণালীর আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহাদের এই কিশোরী ভজন গুপ্তভাবে বিশ্বস্ত শিষ্য মণ্ডলী লইয়া গভীর রাত্রিতে অনুষ্ঠিত হয়। কাজেই সাধারণে ইহার বিবরণ ঠিকভাবে জানিতে পারে না।

ব্রহ্মচর্য্যশীল উগ্রতেজা বৈষ্ণবদের নিকট গৃহস্থগণ অপরাধ করিয়া প্রায় অভিশাপগ্রস্ত হইত। কোন বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে বীরভদ্র দেব সেই সমস্ত উগ্রতেজা দাম্ভিক বৈষ্ণবদের তেজ বিনষ্ট করার জন্য তাঁহাদিগকে প্রকৃতি গ্রহণে বাধ্য করেন। সেই সময় হইতেই এই কুপ্রথার সৃষ্টি হইয়াছে। চণ্ডীদাসের সহজ সাধনার প্রচারও এই কুপ্রথার অন্যতম প্রধান কারণ।

কাহারও মতে কোনও কবিরাজ গোসাই ইহার প্রবর্ত্তন করেন। এ বিষয়ে কেহ আলোচনা করিলে অর্থাৎ বৈষ্ণবী গ্রহণের প্রথা কাহার দ্বারা প্রবর্ত্তিত হয়, তাহ নির্ণয় করিলে লেখক অনুগৃহীত হইবেন।

আধুনিক বৈরাগীরা প্রকৃতি সংসর্গ রূপ হীনাচার করিয়াও কি প্রকারে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের নাম উচ্চারণ করিয়া "মচ্ছপ" করে তাহা বুঝা যায় না। শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের আদর্শ হইতে তাঁহার অনুবর্ত্তিগণ কতদূর অধঃপতিত হইয়াছে, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র কাব্যতীর্থ-জ্যোতিঃসিদ্ধান্ত।

পল্লি চিত্র।

(১)

রামশরণ চক্রবর্ত্তীর আজ স্ত্রীবিয়োগ হইয়াছে। বিকালে বাল্যবন্ধু ঈশ্বরচন্দ্র গিয়া বলিলেন "রামশরণ দাদা, শীঘ্র শীঘ্র সে কর্ম্মটা শেষ করিয়া ফেলুন"।

রামশরণ হাসিয়া উত্তর করিলেন—"কি ভাই, কাম্য বৃষোৎসর্গ না কি?"

"আরে না, একটা বিবাহ আর কি।" ঈশ্বরচন্দ্রের বিরাট হাস্যে ঘরখানা যেন কাঁপিয়া উঠিল। উপস্থিত একজন বলিল 'উনি যে এত হটাৎ মারা যাইবেন আমার এ ধারণা মোটেই ছিল না'

কেহ বলিল "বলিষ্ঠ লোক একবার পড়িলে উঠেনা, ও আমার জানা কথা। সেইদিন পাঁচকড়ির বৌটী জাননা—দুইদিনের জ্বরে মারা গেল।"

কেহ বলিল "আপনার কোষ্ঠিখানা দেখুন দেখি কয় বিবাহ লেখা আছে।"

কেহ বলিল—যাহা হউক কোন মতে বৃষোৎসর্গটা সারিয়া একটা সকাল সকাল"—

রামশরণ শেষোক্ত ব্যক্তিকে বাধা দিয়া বলিলেন "অমর, তুইও কি পাগল হইলে"? অমরনাথ বলিল "কি মামা, পাগলের কথা আমি কি বলিলাম? বিবাহ না করিলে আপনার কি করিয়া সংসার চলিবে'? রামশরণ বলিলেন "কেন? রামরতনকে বিবাহ করাইলেইত চারিটা অন্নের সংস্থান হইতে পারে?" অমরনাথ বলিল তা পারে বটে, তবু সংসারে থাকিতে হইলে আপনারও নিশ্চেষ্ট থাকিলে চলিবে না। একটু অধিক বয়স্কা দেখিয়া"—রামশরণ 'রাখ রাখ' বলিয়া গর্জ্জিয়া উঠিয়া কহিলেন "অমরনাথ, বিজ্ঞতাও অর্জ্জন করিয়াছ চুল কয়গাছিও পাকাইয়াছ, কিন্তু তোমার মুখে এই বালকোচিত কথা শুনিয়া আজ অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। তুমি জান না আমার বয়স কি হইয়াছে"? অমরনাথও ছাড়িবার পাত্র নহে, সে তৎক্ষণাৎ বিশ পঁচিশটী নজির দেখাইয়া রামশরণকে আক্রমন করিল। উপস্থিত সকলেই সেই সুরে সুরে ধরিল। ভাব গতিক দেখিয়া রামশরণ মৌনাবলম্বনই শ্রেয় বোধ করিলেন। পরের দিন পাড়ায় পাড়ায় রাষ্ট্র হইল রামশরণ চক্রবর্ত্তী আর বিবাহ করিবেন না, বাকি জীবন কুক্রিয়াসক্ত হইয়া থাকিবেন।

(২)

রামশরণ চক্রবর্ত্তীর প্রধান যজমান ব্রজ বিদ্যারত্ন বৈঠক খানা ঘরে বসিয়া আছেন। এই সময় সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় সেখানে উপবিষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একটা বিস্ময়ের ভাব মুখে চোখে উদ্রেক করিয়া—"শুনছ বিদ্যারত্ন, হুঃ, কিসে কি!" বলিয়া দক্ষিণ হস্তের বক্র তর্জ্জনীটীর উপর ওষ্ঠের অধোভাগ স্থাপন পূর্ব্বক মস্তিষ্ক ঘূর্ণণ সহকারে ঠোঁট দুইটীর বিচিত্র ভঙ্গী প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

বিদ্যারত্ন জিজ্ঞাসা করিলেন "সিদ্ধান্তবাগীশ দাদা, হইয়াছে কি?" সিদ্ধান্তবাগীশ কৃত্রিম কোপসহ মুখ ভঙ্গী করিয়া কহিলেন "আরে যাও গাঁ খানা তোলপাড় হইতেছে, তুমি এখনও সংবাদ পাও নাই"?

"বাস্তবিকই না"।

"আরে তুমি বল কি"?

"ধর্ম্মতই না"।

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের "আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ" গ্রন্থের তৃতীয় ও চতুর্থ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে :—"গণিত হোরা ও সংহিতা এই তিন শাখায় আমাদের জ্যোতিষ শাস্ত্র বিভক্ত। যে শাস্ত্রে গ্রহগণের গতি আলোচিত হয়, তাহার নাম গণিত। × × × গণিতজ্যোতিষ বিষয়ক গ্রন্থের সামান্য নাম তন্ত্র হইলেও তাহা সিদ্ধান্ত ও করণ ভেদে দ্বিবিধ। সিদ্ধান্তে যাবতীয় গণনার উপপত্তি (যুক্তি) থাকে, কিন্তু করণে উপপত্তি থাকেনা ; গণকসুখার্থ কেবল গণনার সংক্ষিপ্ত নিয়মাদি থাকে। কিন্তু কোন সিদ্ধান্ত আশ্রয় না করিয়া করণ হয়না। সিদ্ধান্তের আবার দুইভাগ আছে ; একভাগে গণনাক্রম এবং অন্যভাগে গণনার উপপত্তি থাকে। প্রথম ভাগের নাম "গ্রহ গণিত" এবং দ্বিতীয় ভাগের নাম ' গোলগণিত।"

সিদ্ধান্ত শিরোমণিকে রায় মহাশয়ের উল্লিখিত গ্রন্থে সিদ্ধান্ত জ্যোতিষের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। কারণ সিদ্ধান্ত শিরোমণিতে উক্ত গ্রহ গণিত ও গোলগণিত উভয়ই আছে। চক্রবর্ত্তী মহাশয় যে "কেন" প্রশ্নের উত্তর চাহিয়াছেন, তাহাও উল্লিখিত "সিদ্ধান্ত শিরোমণি" প্রভৃতি গ্রন্থে লিখিত আছে। তিনি একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া গোলগণিত পড়িবেন। উক্ত রায় মহাশয়ের গ্রন্থে সিদ্ধান্ত ও করণের অধ্যায়ে বহু "সিদ্ধান্ত" গ্রন্থের এবং বহু "করণ" গ্রন্থের নাম চক্রবর্ত্তী মহাশয় দেখিতে পাইবেন।

রায় মহাশয়ের গ্রন্থে সিদ্ধান্ত রহস্যকে "করণ" গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। "করণ" কাহাকে বলে তাহা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে সুতরাং সিদ্ধান্ত রহস্যকে সিদ্ধান্ত শিরোমণির এক পর্য্যায়ভুক্ত করা কিরূপ অসমীচীন কার্য্য তাহা পাঠক মাত্রই বুঝিতে পারিতেছেন।

পাণিনি ব্যাকরণে শব্দসাধন প্রণালী আছে। গজঃ গজৌ গজাঃ—কি প্রকারে সাধিত হয় তাহার প্রণালী আছে, কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ব্যাকরণ কৌমুদীতে মাত্র শব্দরূপ আছে, শব্দ সাধন প্রণালী নাই। এখন পাণিনিও ব্যাকরণ কৌমুদীকে একপর্য্যায় ভুক্ত করিলে কেমন হয় ? সিদ্ধান্ত শিরোমণি ও সিদ্ধান্ত রহস্য ঠিক ঐ প্রকার।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় লিখিয়াছেন সিদ্ধান্ত রহস্যে অয়নাংশ আনয়ণে অঙ্কের প্রক্রিয়ায় "কেনর" উত্তর দেওয়া নাই।" করণ "গ্রন্থে উপপত্তি থাকেনা" সুতরাং সিদ্ধান্ত রহস্যে "কেন" প্রশ্নের উত্তর নাই কিন্তু তিনি ভাষ্যকার শব্দে কি বুঝাইতে চাহেন ? সিদ্ধান্ত রহস্যের কাহার রচিত ভাষ্য তিনি পাঠ করিয়াছেন, জানাইলে কৃতার্থ হইব। আমরাতো এ পর্য্যন্ত সিদ্ধান্ত রহস্যের কোন ভাষ্যের নাম জানিনা। যদি সিদ্ধান্ত শিরোমণির ভাষ্যে তিনি উপপত্তি না পাইয়া থাকেন, তবে তাঁহাকে অনুরোধ করিতেছি তিনি নৃসিংহের "বাসনাবার্ত্তিক" এবং মুণীশ্বরের "মরিচি" নামক ভাষ্য ও টীকা পাঠ করুন, বহু উপপত্তি ও সব "কেন"র উত্তর পাইবেন।

অমরকোষে সিদ্ধান্ত শব্দের অর্থে লিখিত হইয়াছে "কৃত নিশ্চয়তা"। পূর্ব্ব পক্ষ নিরসন পূর্ব্বক যথার্থ পক্ষের স্থাপনকেও সিদ্ধান্ত বলা হয়। প্রথমোক্ত অর্থে শুধু Conclusion এবং দ্বিতীয়ার্থে Conclusion by reasoning বলা যাইতে পারে। Theory অর্থে সিদ্ধান্ত শব্দের প্রয়োগ কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। Final conclusion or Decision অর্থে সিদ্ধান্ত শব্দের বহু প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। করণ গ্রন্থে শুধু মীমাংসিত ফল ও তাহা আনয়নের প্রক্রিয়া লিখিত থাকে ; সুতরাং করণ গ্রন্থ—সিদ্ধান্ত রহস্যকে চক্রবর্ত্তী মহাশয় যে ঠাট্টা করিয়াছেন তাহা অত্যন্ত অসমীচীন। তিনি লিখিয়াছেন—"সুতরাং দেখা যাইতেছে সিদ্ধান্তরহস্যে সিদ্ধান্ত নাই, কেবল রহস্যটুকু আছে।" এরূপ উক্তি শুধু অজ্ঞের পক্ষেই শোভা পায়।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় লিখিয়াছেন "মূল সিদ্ধান্তের বিষয় পূর্ব্বে লিখিয়া পরে সূত্র বা Fonmulaর অবতারণা করিলে ভাল হইত কিন্তু গ্রন্থকার বা পঞ্জিকাকার কেহই তাহা করেন নাই।" আসল সিদ্ধান্ত গ্রন্থে উপপত্তি ও Fonmula দুই ই আছে, তাহা পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে ; কিন্তু পঞ্জিকাকার কেন উপপত্তি দেখাইতে যাইবেন তাহাতো আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝিলাম না। পঞ্জিকা কি সিদ্ধান্ত জ্যোতিষ ?

চক্রবর্ত্তী মহাশয় অঙ্ক করিয়া অয়নাংশ আনয়নের প্রক্রিয়ায় যে "কেন"র উত্তর দিয়া একটা কিছু করিয়াছেন বলিয়া শিক্ষিত মহোদয়গণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন, তাহা কিরূপ উপহাস্যাস্পদ তাহা না বলিলেও চলে।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র কাব্যতীর্থ জ্যোতিঃ সিদ্ধান্ত।

নিউগিনির পূর্ব্বাঞ্চলে কৃষিকার্য্য বেশ ভাল হয়। ঐ অঞ্চলে মিষ্ট আলু, সুমিষ্ট আঁখ প্রভৃতি শস্যই লোকে করিয়া থাকে। মৎস্য ও সাগুই ইহাদের প্রধান খাদ্য। সৌভাগ্যের বিষয়—এই দ্বীপে কোন প্রকার মাদক দ্রব্য আজ পর্য্যন্ত প্রচলিত হয় নাই। ইউরোপীয় স্ত্রীলোকগণ যেমন কুকুর বিড়াল প্রতিপালন করে এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকেরা সেইরূপ শূকরের ছানা পোষণ করিয়া থাকে। এমন কি তাহাদিগকে স্তনের দুগ্ধ পর্য্যন্ত পান করাইয়া থাকে।

ইহারা আত্মায় বিশ্বাস করে। ইহাদের কোন আত্মীয়ের মৃত্যু হইলে, তাহার আত্মার আশ্রয় জন্য তাহারা একটী

নিউগিনি যুবক।

কাঠের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করে। তাহাদের বিশ্বাস এই মৃত ব্যক্তির আত্মা অনাশ্রিত ভাবে চতুর্দ্দিকে না ঘুরিয়া এই মূর্ত্তির মধ্যে আশ্রয় লইলেই আর ব্যারাম পীড়ার সৃষ্টি হইবে না।

এই সমাজে স্ত্রীলোকগণের উপদেশেই সংসার পরিচালিত হইয়া থাকে। তাহারাই পুরুষদিগকে অন্যের সঙ্গে লড়িবার জন্য উত্তেজিত করে; এমন কি খুন ও হত্যা করিতেও পরামর্শ দেয়।

পুরুষ পরিণত বয়সে পৌঁছিলেই এখানে জীবন সঙ্গিনী পাওয়া যায় না। অনেক অনুসন্ধান করিয়া জীবন সঙ্গিনী মিলাইতে হয়। এই সঙ্গিনী সংগ্রহ করিবার সময় কন্যার পিতা বা অভিভাবককে বহু উপঢৌকন প্রদান করিতে হয়। শূকর, খাদ্য দ্রব্য, অলঙ্কার, এবং অন্যান্য ইয়োরোপীয় সৌখিন দ্রব্য যাহা তাহাদের দেশে পাওয়া যায়—এইরূপ বহু জিনিষই উপহার স্বরূপ দিতে হয়। প্রচলিত প্রথানুসারে বিবাহের সময় স্ত্রীলোক গণ হয় চুল না হয় অলঙ্কার হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকে। বিবাহিত জীবনের চিহ্ন স্বরূপ তাহারা মুখে উল্কী পরিধান করিয়া থাকে। মুখমণ্ডলে উল্কী বিবাহিতা মেয়েদের চিহ্ন। অবিবাহিতা যুবতীরা সর্ব্বশরীর চিত্রিত করিয়া থাকে। বিবাহ না হইলে মুখ চিত্রিত করিবার নিয়ম নাই।

বিবাহের দিন একটা বড় ভোজ হয়। ঐ ভোজ সুসম্পন্নের নিমিত্ত সমাগত নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণই দায়ী। তাহারাই নানা খাদ্য দ্রব্য উপহার লইয়া আসিয়া থাকেন।

বর ও কন্যা সে দিন বেশ সুন্দর পোষাকে সজ্জিত হয়। কোমল পুষ্প পল্লবে ও শাখায়, বর কন্যাকে সজ্জিত করা হয়। বিবাহে কোন পুরোহিত প্রয়োজন হয় না।

স্ত্রীলোকগণকে এক জীবনে ইচ্ছামত বহু স্বামী পরিবর্ত্তন করিতে দেখা যায়; সুতরাং ইহাদের পরিবারিক জীবন খুব সুখের বলিয়া মনে হয় না।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

আরতি।

আরতি করিছে তপন ইন্দু,
নীল অম্বর ফেনিল সিন্ধু,
বিশ্ব দেবের মন্দিরে;
বিশ্ব মায়ের ভরে অঞ্চল,
শ্যামল নীলিম কুসুম কোমল,
কত সুমধুর গন্ধী রে!

কখনই অপরের ভাব সংযত করিয়া তান-লয়-মানের সহিত তাহা প্রকাশ করিতে পারেননা। তাই নারী ভাবের পরিণত সঙ্গীতকে শান্ত সংযত সমাহিত চিত্তে আপন হৃদয়ে ধারণ করিয়া তাহার অনুরূপ অনুভূতি কণ্ঠস্বরের ভিতর দিয়া ততটা প্রকাশ করিয়া উঠিতে পারেনা। নারী অন্যের সুর ও ভাবভঙ্গী অনুকরণ করিতে পারে কিন্তু কোন মৌলিক সুর আবিষ্কার বা উচ্চাঙ্গের মৌলিক সংঙ্গীত রচনা করিয়া তাহাতে অভিনব সুর সংযোজনা করিতে নারী বোধহয় তেমন পারেনা। ঠাকুরবাড়ীর নারীদের মধ্যে দুই এক জনের মৌলিক সঙ্গীত রচনা করিবার ক্ষমতা অনেকটা আছে। শ্রদ্ধেয়া সরলা দেবী গভীর ভাবোদ্দীপ কয়েকটি মৌলিক সঙ্গীত রচনা করিয়া নিজেই তাহতে সুর সংযোজনা করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু এইরূপ দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল বলিয়াই আমাদের মনে হয়।

সঙ্গীত প্রিয় পুরুষ আমরণ গতিবাদ্য ভালবাসেন। কিন্তু বয়স একটু বেশী হইলেই নারীর সঙ্গীত স্পৃহা একেবারে লোক পাইতে চায়। কাজেই নারী প্রকৃতি সঙ্গীতের খুব অনুরূপ বলিয়া মনে হয়না। এইজন্য নারী সংগীতবাদ্যে আজও খুব একটা গৌরবের আসন অধিকার করিতে পারেনাই, যদিও আধুনিক নারী সমাজ গীতবাদ্যের প্রতি খুব আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন।

ধর্ম্মের দিক দিয়াও নারীর অধিকার খুব বেশী নাই। ধর্ম্মের প্রতি পুরুষের চেয়ে নারীহৃদয় সহজেই অকৃষ্ট হয়। কিন্তু ধর্ম্ম জগতে আজও নারী এমন কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই যাহার জন্য নারী বুদ্ধ, নামক, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ, প্রভৃতির ন্যায় একটা অমরত্বের দাবী করিতে পারে। মিরাবাই ধর্ম্ম প্রাণ রমণী ছিলেন, কিন্তু ধর্ম্ম জগতে তাঁহার স্থান কোথায়, ইহা বিচার্য্যবটে! দর্শন শাস্ত্রে নারীর অধিকার কত টুকু ও বিশ্ব বিখ্যাত নারী দর্শনিক কয়জন, তাহা চিন্তনীয়! মণ্ডন মিশ্রের পত্নী সরস্বতী শঙ্করাচার্য্য ও মণ্ডল মিশ্রের মধ্যে ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ক বিচারে মধ্যস্থতা করিয়াছিলেন বটে কিন্তু তিনি বাস্তবিক দর্শনিক কিনা বিচার্য্য। গীতার অনুবাদক এনিবেসান্ত ও মাতাজী তপস্বিনীর বক্তৃতার সময় সময় দার্শনিক ভাব খুব ফুটিয়া উঠিয়াছিল বটে কিন্তু এরূপ লোক নারী সমাজে খুব বিরল।

সাহিত্যে নারীর অধিকার খুব সাবধাণতার সহিত বিচার করিতে হইবে। কেহ কেহ বলেন, কবিত্বের বীজ প্রথম নারী হৃদয়েই উপ্ত হইয়াছিল। কবিতায় নারীর অধিকার নেহাত কম নহে। নারী কবিদের মধ্যে ইংলণ্ডের মিসেস্ ব্রাউনিং, মিসেস্ হিমেনস্, বঙ্গের শ্রীমতী কামীনী রায়, শ্রীমতী মানকুমারী বসু, শ্রীমতী তরু দত্ত প্রভৃতি ও প্রবাসিনী বঙ্গ মহিলা শ্রীমতী সরোজিণী নাইডুর নাম উল্লেখ যোগ্য। তাঁহারা সকলেই মৌলিক কবিতা লিখিয়া যশ অর্জ্জন করিয়াছেন। কিন্তু এপর্য্যন্ত কোন সাহিত্যে, নবযুগ প্রবর্ত্তক কোন মহিলা কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া আমরা জানি না।

কবিতার চেয়ে উপন্যাসে আমরা নারীদিগের কৃতিত্বের বেশী পরিচয় পাই। উপন্যাসে নারীর স্থান পুরুষের চেয়ে নেহাত নীচে নহে।

জেইন অষ্টিন, চারলটি, ইমিলি ব্রন্টি. জর্জ্জ ইলিয়ট, মেরি কেরোলি, স্বর্ণকুমারী, অনুরূপা, নিরুপমা, সীতা-শান্তা প্রভৃতি বিদূষী মহিলাগণ উপন্যাস জগতে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন। কি চরিত্র অঙ্কনে, কি ঘটনাবৈচিত্র্যে, কি মনোভাব বিশ্লেষণে, কিভাব গাম্ভীর্য্যে; কি ভাষার মাধুর্য্যে ইঁহারা উচুদরের লেখিকা। সাহিত্য জগতে ইঁহাদের স্থান নিতান্ত নগণ্য নহে।

সাহিত্যের ন্যায় নারীর রাঙ্গাভিনয়নের কথাও অবশ্যই উল্লেখ যোগ্য। কারণ রঙ্গমঞ্চের অভিনয়ে নারীর আসন চিরকালই পুরুষের অনেক উপরে। পুরুষ এবিষয় নারীর সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া আঁটিয়া উঠিতে পারিবে না। পুরুষের, চেয়ে নারীর ভাব তরঙ্গ অধিকতর চঞ্চল। তাই ইঙ্গিত মাত্রই অপরের ভাবভঙ্গী অনুকরণ করিবার ক্ষমতা নারীর বেশী। আবার নারীর অঙ্গ স্বভাবতঃ কোমল ও নমনীয়। কাজেই পরের হাব ভাব অনুকরণ করিয়া যথাযথ-রূপে প্রকাশ করা তাহার পক্ষে যত সহজ, পুরুষের পক্ষে তত নহে। শারীরিক গনের জন্যই বোধ হয় নারী নৃত্যাদিতে পুরুষের চেয়ে বেশী কৃতিত্ব দেখাইতে পারে।

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই যে নারী সমাজের কোন বিষয়ে কতটুকু ন্যায্য অধিকার পূর্ব্বে ছিল বা এখন আছে, তাহা আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করিলাম। এই

ন্যায্য অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করিলে স্বাধীনতা লোলুপ নারী সমাজের পরিণাম কি হইবে মিঃ লায়ড্ জর্জ্জের প্রতি নারীগণের দুর্ব্ব্যবহারেই কিছুদিন পূর্ব্বে তাহার কতকটা আভাস পাওয়া গিয়াছিল।

ইহা এখন আমাদের জননী-ভগিণী-কন্যাগণের পক্ষে বিশেষ ভাবিবার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। *

শ্রীগৌরচন্দ্র নাথ।

স্বর্গীয় সুকুমার রায় চৌধুরী।

মসুয়ার অন্যতম জমিদার বিখ্যাত চিত্রশিল্পী স্বর্গীয় উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র চিত্রশিল্পী ও শিশু সাহিত্য রচনায় সিদ্ধহস্ত "সন্দেশ" সম্পাদক সুকুমার রায় চৌধুরী সকলকে শোক সাগরে ভাসাইয়া দুর্জ্জয় কালা জ্বরে বিগত ২৪শে ভাদ্র অনন্তের কোলে আশ্রয় লইয়াছেন।

বাল্যকাল হইতে সুকুমারের প্রতিভা পিতার পদানুসরণ করিয়া চলিয়াছিল। সুকুমার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সম্মানের সহিত বি, এস, সি পরীক্ষা পাশ করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুপ্রসন্ন ঘোষ বৃত্তি লাভ করেন এবং ফোটোগ্রাফী ও ব্লক প্রস্তুত করিবার প্রণালী সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞান লাভের জন্য মানচেষ্টার গমন করেন। তথায় কৃতিত্বের সহিত সফলতা লাভ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়া ব্যবসায় নিযুক্ত হন। ফটোগ্রাফী ও ব্লক নির্ম্মান সম্বন্ধে তাহার বহু গবেষণা পূর্ণ প্রবন্ধ নানা পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল; তাহার কালে তিনি রয়েল ফটোগ্রাফীক সোসাইটীর সদস্য মনোনীত হইয়াছিলেন ফটোগ্রাফীও ব্লক প্রস্তুত সম্বন্ধে এদেশে তিনি বিশেষেজ্ঞ ছিলেন।

সুকুমার শিশুদের জন্যে বিমল হাস্যোদ্দীপক ও শিক্ষা-প্রদ কবিতা প্রণয়ণে এবং তদোপযোগী চিত্র অঙ্কনে সিদ্ধ হস্ত ছিলেন। সুকুমার বাল্যকাল হইতেই ধর্ম্মপ্রাণ তেজস্বী ও সদালাপী ছিলেন। ৩৭ বৎসর মাত্র বয়সে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তাহার এইরূপ অকাল মৃত্যুতে বাঙ্গলা দেশ একজন অদ্বিতীয় প্রতিভাশালী শিল্পী হারাইল। ময়মনসিংহের যে ক্ষতি হইল তাহার পূরণ হইবার নহে। ময়মনসিংহ তাঁহার প্রতিভা গৌরবে গৌরব অনুভব করিত। সাহিত্য শিল্পকলায় সুকুমার যে সম্পদ রাখিয়া গিয়াছেন তাহার তুলনা নাই। তাহার যশোদীপ চিরদিন তাহার নাম স্মরণ করাইয়া দিবে। তাহার শোকার্ত্ত মাতা, পত্নী, শিশু, পুত্র ও ভ্রাতাগণের সহিত আমরা সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি। প্রার্থনা করি, যিনি সকল শোকের হরণ কর্ত্তা, তিনি তাঁহাদের প্রাণে শান্তি বিধান করুন। সুকুমারের স্বর্গীয় আত্মা তাঁহারই শান্তিময় ক্রোড়ে স্থান লাভ করুক।

* এই প্রবন্ধ সংকলনে আমরা হেভেলক ইলিয়সের (*Havelock Ellis*) *Man & Woman* গ্রন্থ হইতে সাহায্য লইয়াছি।

অঞ্জলি।

অপূর্ব্ব গণিতজ্ঞ।

কিছুদিন পূর্ব্বে 'London Lancet' নামক পত্রিকায় এক আশ্চর্য্য জন্মান্ধ গণিতজ্ঞের আখ্যান বাহির হইয়াছে জন্মান্ধ সত্বেও এই লোকটী তাহার আশ্চর্য্য গণনা শক্তিদ্বারা সকলকে স্তম্ভিত করিয়াছেন। তিনি ৪ সেকেণ্ডে ৪ সংখ্যা বিশিষ্ট যে কোনও অঙ্কের বর্গমূল ও ৬ সেকেণ্ডে ৬ সংখ্যা বিশিষ্ট যে কোনও অঙ্কের ঘনমূল বাহির করিতে পারেন। পরীক্ষা স্বরূপ তাহাকে ৪৬৫৪৮৪৩৭৫ এর ঘনমূল বাহির করিতে বলা হইয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই ১৩ সেকেণ্ডের মধ্যেই তিনি ইহার প্রকৃত উত্তর দিতে পারিয়াছিলেন। ইহা হইতেও আরও একটী কঠিন বিষয় দ্বারা তাহার এই শক্তির পরীক্ষা করা হয়। ১ম বাক্সে ১টী, ২য় বাক্সে ২টী, ৩য় বাক্সে ৪টী, ৪র্থ বাক্সে ৮টী এইরূপ ভাবে ক্রমান্বয়ে বীজের সংখ্যা দ্বিগুণিত করিয়া ৬৪টী বাক্সে কতকগুলি শস্যের বীজ রাখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, ১৪শ, ১৮শ, ২৪শ, ও ৪৮শ বাক্সে ক্রমান্বয়ে কয়টি করিয়া বীজ আছে?" ক্ষণকালের মধ্যেই তিনি উত্তর দিয়া ফেলিলেন,"১৪শ টীতে ৮১৯২টী, ১৮শটীতে ১৩১০৭২টী ২৪শটীতে ৮৩৮৮৬০৮টী ও ৪৮শটীতে ১৪০৭৩৭৪ ৮৮৩৫৫৩২৮টী বীজ থাকিবে।" তারপর সব কয়টীতে মোটে কয়টী বীজ আছে জিজ্ঞাসা করায় উহারও প্রকৃত উত্তর তিনি ৪৫ সেকেণ্ডের মধ্যে দিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া কোন বৎসর 'ইষ্টার ডে' কোন তারিখে পড়িবে, তাহাও তিনি বলিয়া দিতে পারেন। দৃষ্টিহীন একব্যক্তির পক্ষে এরূপ মানসিক গণনার আশ্চর্য্য শক্তির বস্তুতঃইপ্রশংসা করিতে হয়।

সেকালের কথা ছাড়িয়া এখন একালের কথা বলি। ১৩০৮ সনের নবপর্য্যায়ের বঙ্গদর্শনে রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' উপন্যাস মুদ্রিত হয়। চোখের বালি রবীন্দ্রনাথের পাকা হাতের লেখা। কিন্তু চোখের বালি প্রকাশিত হইলে বাঙ্গালা ভাষার অধিকাংশ পত্রিকায় উহার তীব্র সমালোচনা বাহির হইল। ইতঃপূর্ব্বে কোন পুস্তকের এরূপ কঠোর সমালোচনা হইয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। বঙ্কিম বাবুর কাচা হাতের লেখা প্রথম উপন্যাস খানি সেকালের গোঁড়া পণ্ডিত সমাজে যে আদর পাইয়াছিল 'চোখের বালি' আধুনিক উদার পাশ্চত্য শিক্ষা প্রাপ্ত সাহিত্যিকদিগের নিকট সেইরূপ আদর পাইল না কেন? রবীন্দ্রনাথের লিখিত 'রাজর্ষি', বৌঠাকুরাণীর হাট' প্রভৃতি উপন্যাস যে প্রশংসা পাইয়াছিল 'চোখের বালি' তাহা হইতে বঞ্চিত হইবার কারণ কি?

যাহারা 'চোখের বালির' কঠোর প্রতিকূল সমালোচনা করিয়াছেন তাহাদের বক্তব্য সংক্ষেপতঃ এই যে—'চোখের বালির আদর্শ লোক শিক্ষার অনুকূল নহে। ইগা দ্বারা সমাজে দুর্নীতি বৃদ্ধি পাইবার আশঙ্কা আছে। বিধবা বিনোদিনীর চরিত্র এইরূপ ভাবে চিত্রিত হইয়াছে যে তাহাতে পাপের প্রতি লোকের ঘৃণা না হইয়া আসক্তি জন্মিবে।' 'চোখের বালি' যখন রচিত হয় তখন রবীন্দ্র নাথ নোবেল (Nobel) পুরস্কার পাইয়া জগদ্বিখ্যাত না হইলেও তিনি সাহিত্যের নানা বিষয়ে অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। তাহার শিষ্যের অভাব ছিল না। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ 'চোখের বালির সমর্থন করিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "উপন্যাস পাঠে যদি সমাজে পাপ-স্রোত বৃদ্ধি পায়, তাহাতে উপন্যাস লেখকের কি? আর্ট বা কলা সৃষ্টি করিতে পারিলেই উপন্যাসের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। কলা-সৌন্দর্য্য-জাত আনন্দ প্রদান ছাড়া উপন্যাস লেখকের অন্য উদ্দেশ্য নাই।"

কলা-সৃষ্টিযোগে কেবল আনন্দ প্রদান করাই সাহিত্যের একমাত্র উদ্দেশ্য ইহা সম্পূর্ণ নূতন কথা। ইয়ুরোপের কোন কোন লেখকের আদর্শ "Art for Art's sake" ইহা সত্য বটে কিন্তু ভারতীয় সাহিত্যে এই আদর্শ কখনও বিকাশ পায় নাই। লোক শিক্ষার উদ্দেশ্যেই সাহিত্যের সৃষ্টি, সাহিত্যই জাতীয় জীবন সুগঠিত ও সুনিয়ন্ত্রিত করে। এই সনাতন সত্য এ দেশের সাহিত্যের অস্থি মজ্জাগত। যুগযুগান্তর হইতে এই সত্য, সাহিত্যে ও কলায়, নিত্য অনুসৃত হইয়া আসিতেছে। দুর্গেশনন্দিনীতে লোক শিক্ষার উপাদান অধিক নাই সত্য কিন্তু উহার কোথাও ভোগলালসার তীব্র আকাঙ্ক্ষা সংযমের সীমা অতিক্রম করে নাই। উহার কোথাও অপবিত্র প্রেমের উৎকট অভিব্যক্তি নাই। তাই সংস্কৃত সাহিত্য রসজ্ঞ রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ও রমণীরত্ন আয়েষার চরিত্র আলোচনা করিয়া বলিয়াছিলেন,—"আয়েষা যথার্থই দেববন্যারূপিণী।" বিমলার কথা লিখিয়াছেন,—"বিমলার চরিত্র গ্রন্থকার আদ্যোপান্তই এইরূপ মনোহরভাবে চিত্রিত করিয়াছেন যে উহাকেই সময়ে সময়ে গ্রন্থের নায়িকা বলিতে আমাদের ইচ্ছা হয়।" বীরেন্দ্র সিংহের কঠোর সংযমের কথা উল্লেখ করিয়া ন্যায়রত্ন মহাশয় বলিয়াছেন—"আয়েষা পরম সুন্দরী, বুদ্ধিমতী, অসাধারণ গুণশালিনী, যুবতী রাজকন্যা। তিনি বিপদ সময়ে রাজ পুত্রের যেরূপ শুশ্রূষা করিয়াছিলেন, তাহা না করিলে হয় ত তাঁহার আরোগ্য লাভই দুর্ঘট হইত কিন্তু সেই আয়েষাও মুক্তকণ্ঠে অনুরাগ প্রকাশ করিলেও রাজপুত্রের মনে তাঁহার প্রতি এক নিমেষের জন্যওঅন্য ভাব জন্মে নাই, ইহা নায়কের পক্ষে সাধারণ গুণ নহে।"

আমরা সেকালের কথা উল্লেখ করিলাম এই জন্য যে সেই গোঁড়ামীর দিনেও সম্পূর্ণ নূতন ধরনের উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনী জাতীয় আদর্শে লিখিত হইয়াছিল বলিয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নিকটও প্রশংসিত হইয়াছিল। আবার জাতীয় আদর্শ হইতে পার্থক্য হেতু নব্য ইংরজী শিক্ষিত সমাজেও "চোখের বালি" সাদরে গৃহীত হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের ন্যায় কোন কলা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ধর্ম্ম ও নীতিকে উপেক্ষা করেন নাই।

চোখের বালির পর রবীন্দ্রনাথের ঐ ছাচে ঢালা নৌকাডুবি বঙ্গদর্শনে বাহির হইল। তখনও কলা সৃষ্টিই উপন্যাসের একমাত্র উদ্দেশ্য, Art for art's sake এই নীতি দুই চারজন ইংরেজী শিক্ষিত পাশ্চাত্য সভ্যতানুরাগী লেখকের মধ্যেই সীমা বদ্ধ ছিল। ১৩২০সনে

রবীন্দ্রনাথ 'নোবেল' পুরস্কার প্রাপ্ত হইলেন। সেই অবধি পাশ্চাত্য সাহিত্যের সংবাদ অধিক পরিমাণে বাঙ্গলা সাহিত্যে আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল। পূর্ব্বে যাহারা বাঙ্গালা সাহিত্যে কলা-কৌশলের কথা বলিতেন তাঁহারা সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী ঔপন্যাসিক এমিলি জোলার (Emile Zola) প্রতিভা ও সৌন্দর্য্য সৃষ্টির দৃষ্টান্ত দিতেন। এই সময়ে 'ইবসেন,' 'পিয়ের লোটি,' 'আনাটোল ফ্রান্স,' 'মেটারলিঙ্ক' 'বর্নাডশ' প্রভৃতি সাহিত্যিকদিগের নাটক ও উপন্যাস ইংরেজী সাহিত্যানুরাগিগণ সাদরে পাঠ করিতে লাগিলেন। ইহাদিগের মধ্যে ইবসেনই বাঙ্গলা সাহিত্যে অধিকতর প্রভাব বিস্তার করিল। ইবসেনের আদর্শ সকলে গ্রহণ করিবে না সত্য কিন্তু ইবসেনের প্রতিভা ও নাট্যকলা সৃষ্টি অসামান্য। কলা-কৌশলে তিনি Sophocles, Shakespeare, Goethe ও Molliereএর পরেই স্থান পাইবার যোগ্য। কোন কোন মাসিক পত্রিকায় 'আর্টের' নূতন আদর্শে গল্প ও উপন্যাস প্রকাশিত হইতে লাগিল। 'নারায়ণ' ও 'সুবজ পত্র' গল্প এবং প্রবন্ধ মুদ্রিত করিয়া আর্টবাদীদিগকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। তখন 'আর্টের' নামে উচ্ছৃঙ্খল ভোগলালসার চিত্তাকর্ষক বিশ্লেষণই কোন কোন গল্প ও উপন্যাস লেখকের একমাত্র উদ্দেশ্য হইয়া উঠিল। ধর্ম্ম ও নীতির সহিত উপন্যাসের কোন সম্বন্ধ নাই, ইহাই এই নব গঠিত দলের প্রতিপাদ্য বিষয় হইল। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল ও নারায়ণে প্রবন্ধ লিখিয়া এই মতই সমর্থন করিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ 'নোবেল' পুরস্কার পাইবার প্রায় এক বৎসর পরে সবুজ পত্রে প্রথমে তাঁহার পূর্ব্বোক্ত আর্ট সঙ্গত কয়টী গল্প এবং পরে 'ঘরে বাইরে' উপন্যাস প্রকাশিত হয়। 'ঘরেবাইরে' উপন্যাসের তীব্র প্রতিবাদ দীর্ঘকাল চলিয়াছিল। 'চোখের বালি' প্রকাশিত হইবার পর সাহিত্যে যে নৈতিক আন্দোলনের সূত্রপাত হইয়াছিল 'ঘরে বাইরে' প্রকাশিত হইলে উহা প্রবলতর হইল। বাঙ্গলা সাহিত্যের পাঠক পাঠিকাগণ তাহা অবগত আছেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইবসেনের কলা সৃষ্টির আদর্শের প্রভাবই বিশেষভাবে বাঙ্গালা সাহিত্যে নূতন দলের সৃষ্টি করিয়াছে। এমন কি 'ঘরে বাইরের' সহিত ইবসেনের A dolls house এর অসামান্য ভাব সাদৃশ্য রহিয়াছে। প্রচলিত বিবাহ পদ্ধতি নারীর ব্যক্তিত্ব বিকাশের অনুকূল নহে, স্বামী স্ত্রীকে পুতুলের মত নিজ ইচ্ছামত পরিচালন করেন ইহাই ইবসেনের প্রতিপাদ্য বিষয়। পত্নী "নোরা হেলমার" (Nora Helmer) তাহার স্বামীকে বলিতেছেন "When I was at home with papa he told me his opinion about every thing and so I had the same opinion; he called me his doll-child and he played with me just as I played with my dolls and when I come to live with you I was simply transferred from papas hands i to yours."

'নোরা হেলমারের' মুখে যাহা শোভাপায়, তাহা একজন অন্তঃপুরবাসিনী বঙ্গ মহিলার মুখে শোভা পায় না। তাই রবিবাবু স্ত্রীর অধীনতার দার্শনিক তথ্যটী স্বামী নিখিলেশের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন :—"আমার স্ত্রী অতএব ও আমারই! স্ত্রী! ওটা কি একটা যুক্তি? ওটা কি একটা সত্য? ঐ কথাটার মধ্যে একটা আস্ত মানুষকে আগা গোড়া পুরে ফেলে কি তলা বন্ধ করে রাখা যায়?" সমগ্র গ্রন্থেই এই ভাবটী ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ ইবসেনের এই ভাবটী 'ঘরে বাইরেতে' ব্যক্ত করিতে গিয়া সতীধর্ম্মকে খর্ব্ব করিয়া ফেলিয়াছেন। বাস্তবিক 'ইবসেনের' 'নোরার' আদর্শ বঙ্গালায়ত দূরের কথা জগতের কোন সমাজেই স্থান পায় নাই। রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য দেশে ভ্রমণ করিয়া স্বচক্ষে সমাজের অবস্থা দেখিয়া আসিয়াছেন। বোধ হয় তিনি স্বীকার করিবেন, দাম্পত্য জীবনে সুখ শান্তি এখনও যাহা কিছু ভারতবর্ষেই আছে। পাশ্চাত্য দেশে ভোগ লালসা পরিতৃপ্তির জন্য নর নারীগণ উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। তথায় সতীত্বের গৌরব পরিহাসের বিষয় হইয়াছে বর্ত্তমানে এক আমেরিকায় প্রতিবৎসর লক্ষ লক্ষ বিবাহ বিচ্ছেদের মোকদ্দমা হইতেছে। ইহার মূলে কেবল উদ্দাম ইন্দ্রিয় সুখের দুর্জ্জয় আকাঙ্ক্ষা। পাশ্চাত্য দেশে বিবাহ বন্ধনে কেহ আর বড় আবদ্ধ হইতে চায় না; অবাধ প্রেমই স্পৃহণীয়। সুতরাং তথায় নারীর ব্যক্তিত্ব অর্থ উচ্ছৃঙ্খলতার নামান্তর মাত্র। এখনও আমাদের দেশে বিবাহ একটী

enemy of the people প্রভৃতি নাটক লোক-শিক্ষার জন্য লিখিত হইয়াছিল। প্রকৃত পক্ষে জোলা ও ইবসেন প্রমুখ মনীষীগণ Realistic বা বাস্তবতামূলক উপন্যাস এবং নাটক রচনা করিয়াছেন। সমাজের সংস্কার করিয়া মানবের কল্যাণ সাধন করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল। তবে তাঁহারা টলষ্টয়, হিউগো প্রভৃতির ন্যায় সামাজিক ব্যাধির প্রতিকারের উপায় বলেন নাই।

আর্ট বা কলা, কবির উদ্দেশ্য সিদ্ধির একটী উপায় বা কৌশল মাত্র (Means to an end)। কিন্তু ইহা যথার্থ যে আর্ট বা কলা কৌশল ব্যতীত কোন উৎকৃষ্ট উপন্যাস হইতে পারে না। আর্টই কাব্য ও উপন্যাসের এক মাত্র আশ্রয়। আর্ট অবলম্বন করিয়াই কবি আপনার হৃদয়ের রস বা উচ্ছ্বাস অন্যের হৃদয়ে ঢালিয়া দেন। তাই টলষ্টয় বলিয়াছেন "Art is a means of union among men joining them in the same feeling." আর্টের কৌশলেই কবি আপনার ভাবে অন্যকে মাতোয়ারা করিয়া তোলেন। সত্য বা স্বাভাবিকতা এবং সৌন্দর্য্য আর্টের প্রাণ। যাহা স্বাভাবিক নয় এবং সুন্দর নয়, তাহা চিত্তাকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় না। যাহা আমরা সর্ব্বদা চারিদিকে দেখি, তাহাই পুনরায় যথাযথ গ্রন্থে বা চিত্রে দেখিলে হৃদয়ে আনন্দ হয় না বরং বিরক্তি জন্মে. তাই কবি এবং চিত্রকর সমাজের অথবা স্বভাবের photograph মাত্র অঙ্কিত না করিয়া প্রয়োজনানুসারে সুন্দর পদার্থ গুলি বাছিয়া সংগ্রহ করিয়া লন। এই বাছাই কার্য্যেই কবি এবং চিত্রকরের কলা প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।

কবি ধর্ম্ম প্রচারকের ন্যায় উপদেশ দেন না, গুরু মহাশয়ের ন্যায় নীতি শিক্ষাও দেন না। নৈয়ায়িকের ন্যায় তর্ক করিয়াও কাহাকে কোন কথা বুঝাইতে প্রয়াস পান না। করিলে তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হইত। কবি তাঁহার প্রয়োজন অনুসারে আদর্শ নরনারীর চরিত্র অঙ্কিত করিয়া স্বীয় উদ্দেশ্য সাধন করেন। The business of art lies in this—to make that understood and felt which in the form of an argument, might be incomprehensible and inaccessible" (What is art—Tolstoi)।

তাই বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন "কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নহে কিন্তু নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য কাব্যের ও সেই উদ্দেশ্য।"

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার।

রামায়ণ-যুগের যন্ত্র-বিজ্ঞান।

ভারত অধ্যাত্ম বিজ্ঞানে উন্নতির উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছিল। তখন বিজ্ঞান বলিতে অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের উচ্চ জ্ঞান চিন্তাকেই বুঝাইত। "সাইন্স" বলিতে আধুনিক কালে যে জড় বিজ্ঞান শাস্ত্রকে নির্দ্দেশ করে, আর্য্য-ভারতে তাহা বোধ হয় তেমন উন্নত পর্য্যায়ে ছিল না। তবে জড় বিজ্ঞানের চিন্তায় যে প্রাচীন ভারতীয়েরা একেবারেই বিমুখ ছিলেন, তাহা বলা যায় না।

রামায়ণের নানাস্থানে যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রশালার উল্লেখ আছে। যন্ত্রবিজ্ঞানে আর্য্যভারতের সভ্যতার কেন্দ্রভূমি অযোধ্যা অপেক্ষা অনার্য্য সভ্যতার কেন্দ্রস্থল লঙ্কাই অধিক উন্নত ছিল। মানবী জ্ঞান অপেক্ষা দানবী জ্ঞানে বৈচিত্রের পরিচয় অধিক প্রদত্ত হইয়াছে।

অযোধ্যা ও লঙ্কা—উভয় স্থানের বর্ণনায়ই দুর্গাদির ও যন্ত্রাদির উল্লেখ আছে। উভয় স্থানের দুর্গশীর্ষেই লৌহ নির্ম্মিত শত শত শতঘ্নী নামক যন্ত্র রক্ষিত হইত। কিন্তু ঐ যন্ত্র যে কি পদার্থ, তাহা এখন অনুমানে অবগত হইবার চেষ্টা ব্যতীত, মহর্ষির বর্ণনায় তাহার কোন কার্য্যতার পরিচয় পাওয়া যায় না। শতঘ্নী যে মারাত্মক যন্ত্র এবং তাহার আত্ম প্রকাশে যে শত সংখ্যক প্রাণের অনিষ্ট বা নাশ হইতে পারিত, তাহা এখন নামের অর্থ দ্বারা ব্যতীত বুঝিবার অন্য উপায় নাই। এরূপে অর্থ গ্রহণেও যথেষ্ট মতভেদ আছে। (১)

রামায়ণের টীকাকার রামানুজ শতঘ্নীকে নালীক আগ্নেয়াস্ত্র বলিয়া লিখিয়াছেন, রামায়ণে আগ্নেয়াস্ত্র ও নালীক অস্ত্রের বহুল উল্লেখ দৃষ্ট হয়; সুতরাং শতঘ্নীকে আধুনিক কামান তুল্য আগ্নেয় অস্ত্র বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

(১) শতঘ্নীর উল্লেখ কালিদাস করিয়াছেন। কিন্তু জিনিসটীর স্বরূপ-পরিচয় তিনিও প্রদান করেন নাই। কালিদাসের টীকাকার মল্লিনাথ টীকায় লিখিয়াছেন—শতঘ্নীতু চতুস্তালা লৌহ কণ্টক সঙ্কিত যষ্টি।" অর্থাৎ লৌহ কণ্টক কীলিত যষ্টি।

যে কালের যে বস্তু, সে কালের লোকে তাহার পরিচয় না লিখিয়া রাখিলে; বস্তু পরিচয়ে এরূপ মতভেদ অবশ্যম্ভাবী; সে জন্যই এখন বেদের অর্থ করিতে অনুমানের প্রশ্রয় দিতে হয় এবং শেষ ভোটের আশ্রয় লইয়া মীমাংসার পথে অগ্রসর হইতে হয়।

যবদ্বীপের মহাভারতীয় কথা।

অতি প্রাচীন কালে ভারতীয় হিন্দুদিগের এক শাখা সাগর অতিক্রম করিয়া যবদ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। ইহারা পুণ্যভূমি ভারতের সনাতন সভ্যতা ও সাধনার ন্যায় রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি ধর্ম্ম গ্রন্থও সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারা কিরূপ মহাভারত নিয়াছিলেন, তাহা এখন জানিবার উপায় নাই। কিন্তু বর্ত্তমানে যবদ্বীপে যে মহাভারত পাওয়া যায়, তাহার সহিত ব্যাসদেবের মহাভারতের অনেক পার্থক্য আছে। কাশীদাস যদি দিল্লীবাসী পঞ্চপাণ্ডবের চরিত্রে এতটা বাঙ্গালীত্বের আরোপ করিতে পারেন, তবে যবদ্বীপের কবিভাষার কবি তথাকার মহাভারতীয় চরিত্র অঙ্কনে যবদ্বীপের তুলি ব্যবহার করিতে পারিবেন না কেন? কবিগণ এই রূপ নিরঙ্কুশ বলিয়াই আসল ও নকল মহাভারতের পার্থক্য বুঝিয়া উঠা কঠিন হইয়াছে।

যবদ্বীপের মহাভারতের নাম ব্রত যুদ্ধ বা ব্রাত যুদ্ধ। বোধ হয়, ভ্রাতৃ যুদ্ধের অথবা ভারত যুদ্ধের নাম হইতেই তথাকার কবিরা ইহার ব্রত যুদ্ধ বা ব্রাত যুদ্ধ নামকরণ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ মহাভারত নামটি যবদ্বীপ বাসীর নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। আমাদের মহাভারতের ন্যায় ব্রাতযুদ্ধেও অষ্টাদশ পর্ব্ব আছে। কিন্তু প্রসিদ্ধ নায়ক নায়িকা ও স্থান বিশেষের নাম ব্রাতযুদ্ধে ভিন্ন রূপে বর্ণিত হইয়াছে। ব্যাসদেবের মহাভারতে সব্যসাচী, ধনঞ্জয় প্রভৃতি অর্জ্জুনের দ্বাদশটি নাম আছে; কিন্তু ব্রাতযুদ্ধে জনক, বর্দ্দিনিংসি ও অজ্জুন এই তিনটি নামই বিশেষভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। মূল মহাভারতের সহিত ব্রাতযুদ্ধের কোথায় কতটুকু সামঞ্জস্য রহিয়াছে, তাহা বুঝিবার জন্য ব্রাতযুদ্ধে উল্লিখিত নাম গুলির পাশে ব্রেকেটের ভিতর আমাদের মহাভারতীয় নামগুলি দেওয়াগেল। এই সামঞ্জস্য বিধানের ও সত্যাসত্য নির্ণয়ের ভার পাঠকগণের উপর অর্পণ করিয়া আমরা মূল বিষয়ের অবতারণা করিতেছি।

পুরাকালে গজাহ্বয় (হস্তিনাপুর) নগরে দশবাহু নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র সৌন্তান (শান্তনু) রাজা হইলেন। দেবব্রত নামে সৌন্তানের এক পুত্র জন্মিল। পুত্র প্রসব করিয়াই দেবব্রত-জননী ইহলোক ত্যাগ করিলেন। স্নেহবৎসল পিতা শিশু পুত্রের স্তন্য পানের জন্য প্রসূতীর অনুসন্ধানে লোক পাঠাইলেন।

এদিকে পলাসরের (পরাশরের) পত্নী অম্বুসারী অবি-আসকে (ব্যাসকে) প্রসব করেন। ব্যাস-জননী অম্বুসারী পুত্রকে কোলে করিয়া বসিয়াছেন, এমন সময় শান্তনু-প্রেরিত লোক প্রসূতীর অনুসন্ধানে সেখানে উপস্থিত হইল। তখন ত্রিতুষ্টির বংশধর হৃতরাজ্য এবং সৌন্তান সেখান কার রাজা। ব্যাসকে মাতৃক্রোড়ে উপবিষ্ট দেখিয়া মাতৃহীন শিশু দেবব্রত কাঁদিয়া উঠিল ও স্তন্য পানের জন্য ব্যাকুল হইল। কিন্তু অম্বুসারী স্তন্যদানে স্বীকৃত হইলেন না। অপত্য স্নেহের অনুরোধে রাজা সৌন্তান স্বয়ং সেখানে উপস্থিত হইয়া অম্বুসারীকে অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন, তথাপি অম্বুসারী স্তন্যদানে সম্মত হইলেন না। সৌন্তানের আগ্রহ দেখিয়া স্বদেশ প্রেমিকা অম্বুসারী পতিবংশের হৃতরাজ্যের প্রার্থনা করিয়া বলিলেন, "মহারাজ সৌন্তান, আপনি আমাদের রাজ্য আমাদিগকে ফিরাইয়া দিন, আমরা ইহা ভোগ দখল করি। যদি আপনি ইহাতে রাজী হন, তবে আমি এখনই দেবব্রতকে আপন পুত্রের ন্যায় স্তন্যদান করিব।" সৌন্তান অনন্যোপায় হইয়া অম্বুসারীর কথায় সায় দিলেন। অম্বুসারীর বুদ্ধি বলে তাহার পতি হৃতরাজ্য ফিরিয়া পাইলেন। ব্যাস বয়ো প্রাপ্ত হইলে, পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিয়া কুণ্ডিল নায়ক স্থানে রাজ্য স্থাপন করেন। তারপর ব্যাস এক বায়োধিকা রমণীর পাণি গ্রহণ করিলেন। তাহার গর্ভে তিনটি পুত্র জন্মে। প্রথম পুত্র—ধৃতরাষ্ট্র—জন্মান্ধ; দ্বিতীয় পুত্র—পাণ্ডুদেব নাথ—পরম সুন্দর পুরুষ; তৃতীয় পুত্র—রাম বিদুর—খঞ্জ। বারবৎসর রাজ্য ভোগের পর দ্বিতীয় পুত্র পাণ্ডুকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া ব্যাসদেব বানপ্রস্থ অবলম্বন করিলেন। পাণ্ডুদেব চৌদ্দ বৎসর বয়সে রাজা হইলেন। তিনি মদুরার (মথুরার) রাজা বসুকেতুর কন্যা কুন্তী দেবীকে বিবাহ করেন। কুন্তীর তিন পুত্র——কুন্তদেব, সেন ও জনক। পাণ্ডু দেবের দ্বিতীয়া মহিষী—মাদ্রী। তাহার পিত্রালয় ছিল মদ্রদেশে। মাদ্রী যখন গর্ভবতী তখন পাণ্ডুর মৃত্যু হইল। নকুল সহদেব নামক দুইটি যমজ পুত্র প্রসব

করিয়াই মাদ্রীপতির অনুসরণ করিলেন। পাণ্ডব পুত্রগণ তখন অপ্রাপ্ত বয়স্ক ; সেইজন্য ধৃতরাষ্ট্র তাহাদের অভিভাবক হইলেন। তাহারা বড় হইয়া পিতার রাজ্য দাবী করিল। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র আপন পুত্র সুযোধনকেই রাজ্য দিলেন। পাণ্ডবগণ পিতার রাজ্য হইতে বঞ্চিত হইয়া অমরাবতীতে (ইন্দ্রপ্রস্থে) নূতন রাজ্য স্থাপন করিলেন।

মদ্রদেশের এক রাজকন্যা সুযোধনের মহিষী। তাহার একপুত্র। সুযোধনের প্রতাপ দিন দিন বেশ বাড়িতে লাগিল। সুতরাং কর্ণ, দেবব্রত, জয়পথ. (জয়দ্রথ) জয়কর সেন ও শল্যরাজ প্রমুখ তখনকার শক্তিশালী রাজন্য বর্গ সুযোধনের পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন।

এদিকে কুন্তদেব (যুধিষ্ঠির) অমরাবতীতে শক্তি সঞ্চয় করিতে লাগিলেন। তিনি প্রথমে সুযোধনের নিকট অর্দ্ধ রাজ্য প্রার্থনা করিলেন। ইহাতে দ্বারাবতীর রাজা কৃষ্ণ স্বয়ং দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। সুযোধন বিনাযুদ্ধে সূচ্যগ্র পরিমাণ ভূমিও দিতে চাহিলেন না। কাজেই ব্রতযুদ্ধ (ভ্রাতৃযুদ্ধ) বা ধর্ম্মযুদ্ধের সূত্রপাত হইল। যুদ্ধে কতলোক মরিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। সুযোধন নিজেও নিহত হইলেন। পাণ্ডবেরা জয়লাভ করিল।

কুন্তদেব হস্তিনার সম্রাট হইলেন। তৎপর অর্জ্জুনের পৌত্র পরীক্ষিৎ ও তৎপুত্র জয়ধর্ম্ম রাজা হন। ইহাই যবদ্বীপের মহাভারতের স্থূলমর্ম্ম।

ব্রাতযুদ্ধের বর্ণিত পাণ্ডবগণের মধ্যে অর্জ্জুন চরিত্র বড়ই বিচিত্র ও বৈশিষ্ট্যময়। ভারতের পার্থ—স্থির-ধীর, গাণ্ডীব ধারী মহাবীর ; তিনি শান্ত, সৌম্য, প্রিয়—দর্শন। তাঁহার চরিত্রে যাদু মন্ত্র বা মায়া-মোহের কোন প্রভাব নাই। কিন্তু যবদ্বীপের অর্জ্জুন কবিকল্পনার এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি তাঁহার মায়া মোহ আছে ; অলৌকিক মোহিণী শক্তি আছে ; তাঁহার কথায় ও কাজে যেন যাদু মন্ত্রের এক অপূর্ব্ব প্রভাব। এই অর্জ্জুন চরিত্রের কথা আমরা এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

অর্জ্জুন সারাটিদিন লোকলোচনের আগচরে থাকেন ; সন্ধ্যার অন্ধকারে কি এক অপূর্ব্ব সাজ সাজিয়া লোক সমাজে অবতীর্ণ হন। তাঁহার মোহিণী শক্তির প্রভাবে মানুষ সুখদুঃখের অতীত স্থানে পৌঁছিতে পারে ; মানুষ যর প্রাণে অনন্ত সুখের ফোয়ারা ফুটিয়া উঠে। তাঁহার হৃদয়ে শোক দুঃখের স্থান নাই ; সদাই যেন ভূমানন্দ বিরাজমান এই টুকু হইল অর্জ্জুন চরিত্রের অলৌকিকত্ব।

লৌকিক শৌর্য্য বীর্য্য হিসাবেও অর্জ্জুন চরিত্রের বিশেষত্ব আছে। ধনুর্ব্বিদ্যায় কেহই তাহার সমকক্ষ নহে। বরং বীরত্ব গৌরবে তিনি ব্রাতযুদ্ধের ভীমের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। তাহার বীরপনায় দেবগণ মুগ্ধ। বাতরগুরু পশুপতি (পাশুপতাস্ত্র) ও বাতরব্রহ্ম ব্রহ্মাস্ত্র অর্জ্জুনকে পুরস্কার দিলেন। আমাদের মহাভারতেও মহাদেবের নিকট হইতে অর্জ্জুনের পাশুপতাস্ত্র লাভের বিবরণ আছে। তবে কি যবদ্বীপের বাতরগুরু ও আমাদের মহাদেব এক ? খুব সম্ভব ইহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য আছে।

ব্রাতযুদ্ধ ও ভারতীয় মহাভারত—এই উভয়গ্রন্থে ইন্দ্রকীল পর্ব্বতে অর্জ্জুনের তপস্যার বিবরণ পাওয়া যায়। আমাদের অর্জ্জুন মহাদেবের আরাধনা করিয়াছিলেন। যবদ্বীপের অর্জ্জুন ও বোধহয় সমর বিজয়িণী শক্তিলাভের জন্য শক্তিপতি শিবের আরাধনায় ব্রতী ছিলেন। যদি আমাদের এই অনুমান সত্যহয় তবে বাতরগুরু ও মহাদেব এক হইতে পারেন।

দ্বপরযুগে ইরাং বায়ুর নিবাত কবচনামে এক দুরন্ত পুত্রছিল। একদিন ইরাং বায়ু নিবাত কবচকে স্বর্গ হইতে তুরঙ্গ জাতিনামক পুষ্প আনিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। নিবাত কবচ স্বর্গে যাইয়া অপূর্ব্ব রূপলাবন্যবতী বিদাদরী (বিদ্যাধরী) সুপ্রভাকে দেখিয়া তাহার রূপে মুগ্ধ হইলেন। দুরন্ত দৈত্য সুপ্রভাকে আপন করিয়া লইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু সুপ্রভা কিছুতেই সম্মত হইলনা। কাজেই নিবাত কবচ তাহাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিতে উদ্যত হইল। বিপন্ন সুপ্রভা পিতার নিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত নিবেদন করিল। পিতা বর গর্ব্বিত দানবের পৈশাচিক অত্যাচার কাহিনী শ্রবণ করিয়া নিতান্ত মর্ম্মাহত হইলেন। তিনি ঋষি নারদকে ডাকিয়া বলিলেন, আপনি দয়া করিয়া ইন্দ্রকীল পর্ব্বতে তপস্যা নিরত বাদ্দিনিংসির (অর্জ্জুনের) সাহায্য প্রার্থনা করুণ ; কারন আমার বড় আদরের কন্যা সুপ্রভা আজ বিপন্ন।" নারদ পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন, অর্জ্জুন জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষ ; তাহার আধ্যাত্মিক শক্তি

দেখাইতে পারে, তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই।

দেশে ঘোর দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে; এই সময় দরিদ্র নারায়ণের সেবা—যাহার অর্থ আছে, তাহার পক্ষে পরম কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কিন্তু তোমরা যাহা লিখিয়াছ—প্রতি দিন সন্দেশ, মাংস, পায়েস, পিষ্টক, গাঁজা, মদ · ইহা বড়ই লজ্জার কথা। বড়ই পরিতাপের বিষয়।

জ্যেঠিমার জন্য দুঃখ হয়। কিন্তু আমি তাঁহার কি করিতে পারি? মণি দশের পরামর্শে অনায়াসে আমাকে বিপন্ন করিতে পারে। সে মণি কি আর এখন আছে? কিন্তু আমি বিপন্ন হইয়াও যদি তাহাকে রক্ষা করিতে পারি, তাহা আমি করিতে সর্ব্বদা মুক্ত-হৃদয়। আমার পরীক্ষা শেষ হইয়াছে। বেশ ভালই লিখিয়াছি। কলিকাতায় বসন্তের ধুম পড়িয়াছে; সেজন্য নৌহাটী আছি। এম, এ, পরীক্ষার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বোধ হয় এই খানেই থাকিয়া পড়িব। নিতান্ত প্রয়োজন বুঝিলে লিখিও, আসিব। মণির জন্য সব করিতে পারিব এবং করিব।

মাসী মা, তুমি মাসে মাসে টাকা পাঠাইয়া আমাকে লজ্জিত করিয়া ফেলিতেছ। আমার বৃত্তিতেই প্রায় চলে; তার উপর ৫০৲ টাকা অনাবশ্যক। টাকা গুলি জমাইয়া রাখিতেছি, উহা তোমার নামে দুর্ভিক্ষে দান করিব। বড় ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে; কলিকাতায় বসিয়া আমরা তাহা অনুভব করিতেছি না বটে কিন্তু গ্রামে গ্রামে যে লক্ষ লক্ষ লোক অনসনে মরিতেছে, তাহার সংবাদ পাঠ করিতেছি। এই সময়ই অর্থ থাকিলে মহত্ব ও মনুষ্যত্ব দেখানের সময়।

আমি পরীক্ষা দিয়াই জ্যেঠা মহাশয়ের অনুসন্ধানে ঘুরিব। এই সময় কনকের জন্যও পাত্র দেখিব। এবং আমার পছন্দ মত যে কয়েকটী আছে, তাহাদের পারিবারিক অবস্থাদির অনুন্ধান করিব। মণির বিবাহের কি হইল?

মণিকে পূর্ব্বে বিবাহ করাইলেই ভাল হইত। হয়ত বা জ্যেঠিমাকে বালিকা বধু লইয়া এখন বিপদেও পড়িতে হইত। ভগবানের রাজ্যে সবই সম্ভব এবং সকলি মঙ্গলময়। ইতি

স্নেহের—মাখন।

কনকের পত্রের উত্তরে কনকের নিকট মাখন লিখিয়াছে—

স্নেহের বোন, তোমার চিঠি যখনি পাই, প্রাণ ভরিয়া আনন্দ উথলিয়া উঠে; পত্র পড়িতে থাকি, আর তার প্রতি ছত্রে, প্রতি কথায় তোমার প্রেম ও প্রীতির অনাবিল উৎসের ধারা অনুভব করি। যত বার পড়ি, চিরনূতন। কিন্তু দিদি, তুমি যেন আমাকে একটু ভিন্ন ধারায় টানিয়া নিতেছ। সেদিকে তোমার টানিয়া নিবার চেষ্টা, আমার মনে হয়—তোমার পক্ষে ঠিক নয়। আমার পক্ষেও সেরূপ ভাব হৃদয়ে পোষণ করা বিশ্বাস ঘাতকতা ও অকৃতজ্ঞতার পরিচায়ক। আমাকে যদি তুমি তোমার আপন মার পেটের ভাইটীর মত দেখ তবেই আমি নিজকে পরম গৌরবান্বিত মনে করিব। তোমারও সহোদর নাই, আমারও সহোদরা নাই; আমি তোমাকে প্রাণের সহোদরা বলিয়া নিঃসঙ্কোচে আলিঙ্গন করিতে পারিলে যতটা সুখী হইব, নিজকে যত দূর নিরাপদ মনে করিতে পারিব, অন্য কিছুতেই বুঝি তাহা পারিব না। অন্য ভাব কল্পনা করিতেই আমার প্রাণ কাঁপিয়া উঠে। তোমার আমার মধ্যে একটা ভয়ানক ব্যবধান যেন আমার চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে। ভয় এবং দুরাশা এই ব্যবধান টাকে সত্যে এবং বিপুলতায় পরিণত করিয়া এই পথের ভিকারীটীকে যেন সত্যই পথ হইতেও টানিয়া নিয়া মরুভূমিতে ফেলিয়া দেয়।

তুমি আমার নিকট অনেক কথাই নিঃসঙ্কোচে লিখিতেছ। কোন দ্বিতীয় ব্যক্তির পক্ষেও যদি সে গুলি সেইরূপ নিঃসঙ্কোচে পড়িবার সামগ্রী হইত, তবে এগুলি আমার আনন্দের ধারা আরও বৃদ্ধি করিতে, পারিত। কেন না আনন্দ গোপন রাখাই আনন্দ উপভোগ নহে, বন্ধু বান্ধবকে বিলাইয়াই তাহার পূর্ণতা।

তুমি যখন এত কথা আমাকে লিখিতে পার, তখন আমিও সঙ্কোচ শূন্য হইয়া লিখিতেছি, বোনটী আমার, কিরূপ বরটী তোমার মনের মত হইবে, আমাকে তাহার একটী আভাস দিও। আমি তোমার ঠিক মনের মত কার্য্য করিতে যে এক টুও কৃপণতা করিব না, বরং সপূর্ণ রূপে তাহা করিব, এ জ্ঞান, এ বিশ্বাস, তোমার আছে! সৌন্দর্য্যে শিক্ষায়, স্বাস্থ্যে, চরিত্রে তোমার বরটী যে তোমার কল্পনার চেয়েও অনেক উপরে হইবে, সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিত থাকিও। সে ব্যক্তি পথের কাঙ্গাল, দরিদ্র ভিকারী হইবে—এ কল্পনা আমার প্রাণে কোন দিন সুখ দিবে না। ঘর জামাই রাখিয়া

আসিয়াছে; কেহ আপন সর্ব্বস্ব যাইতেছে দেখিয়া তাহা রক্ষা করিতে আসিয়াছে। কেহ কিনিয়া বড় হইবে ভাবিতেছে কেহ পথের ভিক্ষারী সাজিবে ভাবিয়া মাথা খুঁটিয়া কাঁদিতেছে। এক দিকে বিপদের করাল ছায়া, অন্য দিকে বিভব বিত্তের স্বপ্ন। কত লোক মনশ্চাঞ্চল্যে এদিক ওদিক ছুটাছুটী করিতেছে, কেহ স্থির ভাবে টাকার পুটুলি আকড়াইয়া ধরিয়া পান চিবাইতেছে। মোক্তারের দল যে দিকে অর্থের প্রলোভন দেখিতেছে, সেই দিকে দৌড়াইতেছে।

কালেক্টর সাহেব নূতন লোক, বড় কড়া মেজাজের। গত কিস্তিতে আধ আনা বাকীর জন্য একটা বড় সম্পত্তি নীলামে চড়াইয়াছিলেন। এক জন তাঁহার পায়ে পড়িয়া বাকী টাকা দিতে চাইয়াছিল, তিনি তাহাকে পদ প্রহারে বিতাড়িত করিয়াছিলেন! তাই যাঁহাদের বাকী পড়িয়াছে, তাঁহারা হতাশ হইয়াছেন। আর যাঁহারা কিনিতে আসিয়াছেন, তাহাদের মুখে আশার উজ্জ্বল দীপ্তি। এবারও দুইটা বড় জমিদারী নীলামে আছে। একটা নাছিমপুর দিগর, আর একটা ১৭ নং জমিদারী। অনেক বড় লোকের মোক্তার এই দুইটাই কিনিবার জন্য চেষ্টিত আছেন।

নীলাম আরম্ভ হইল। ২।৩ খানা তালুক নীলামের পর নাছিমপুর দিগর ডাক হইল। চৌধুরীদের পক্ষে ও অন্য দুই জমিদারের পক্ষে ডাক হইতেছিল। কালেক্টর সাহেব নীলাম খতম করিবার ইঙ্গিতে হাঁকিলেন—এক—দুই—। এমন সময় ব্যাঙ্কের সাহেব একেবারে হাজার টাকা ডাক বাড়াইয়া দিলেন। অপর পক্ষ-ত্রয় একে অন্যের মুখ পানে চাহিয়া রহিলেন। কালেক্টর সাহেব এক—দুই—তিন গণিয়া হাতুড়ীর আঘাত করিলেন। নাছিমপুরদিগর নীলাম হইয়া গেল।

* * *

নাছিমপুরের চৌধুরী দিগের দুই হিস্যাই আজ পথের কাঙ্গাল। তাহাদের বাড়ী জমি যথাসর্ব্বস্ব এই নীলামে বিক্রয় হইয়া গেল।

বৃদ্ধ প্রসন্ন চৌধুরী কয়েক মাস যাবত চলৎ শক্তি হীন। দীর্ঘ ছয়মাস ধরিয়া ভীষণ জীবন মৃত্যুর সংগ্রাম—যম ও মানবের বল পরীক্ষা চলিতেছে। এ অবস্থায় সদর খাজানা প্রেরণের ব্যবস্থা কেহই করেন নাই। দুই হিস্যার কলহে এইরূপ অবস্থা সদর খাজানার কিস্তিতে ইহাদের সর্ব্বদাই হইয়া থাকে; আজ নূতন নহে। এবার প্রসন্ন চৌধুরীর এই অবস্থায় অপর হিস্যা ষোলআনা তালুক নীলামে চড়াইয়া ডাকিবার মতলব আঁটিয়াছিলেন। এপক্ষেরও যে এক সময় এ ইচ্ছা না ছিল, তাহা নহে; কিন্তু এবার প্রসন্ন চৌধুরীর অবস্থা শোচনীয়। যাহা হউক বরাবর যাহা হয় এবারও তাহাই হইবে—শেষ তারিখে দুই পক্ষেই টাকা দিবেন বলিয়া অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। নির্দ্দয় হুজুর শেষটায় habitual defaulter বলিয়া এবার কোন পক্ষেরই আবদার রক্ষা করিলেন না। এইরূপে উভয় পক্ষেরই সর্ব্বনাশ হইয়া গেল।

(ঘ)

মাস্তুলে সাপ উড়াইয়া যখন প্রকাণ্ড বজরা আঁকিয়া বাঁকিয়া উজান বহিয়া সিংহনাদ পাড়ি দিতে ছিল। সাপের অঙ্গ ভঙ্গি ও লেজ নাড়া দেখিবার জন্য তখন গ্রামের কৌতুহলী দর্শকবৃন্দ নদীর তীরে আসিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল। সকলে বলিতে লাগিল—"এ সর্দ্দারের বজরা—"।

প্রকাণ্ড বজরা। পশ্চিম দেশীয় দ্বারবান সতর্ক-পাহারার নিদর্শন স্বরূপ দাড়াইয়া থাকিয়া তাহার গুরুত্ব বাড়াইয়া দিতে ছিল। তখন ডুবন্ত রবির লোহিত কিরণ পশ্চিম আকাশের পাটে—সন্ধ্যা দেবীর সীমন্ত রাঙ্গাইয়া সিংহনাদের জলে ঢেউ খেলিতেছিল।

বজরা নাছিমপুরের চৌধুরী বাড়ীর ঘাটে আসিয়া নোঙ্গর করিল। তারপর বজরার ভিতর হইতে, মাণিক ও তাহার পুত্র বাহির হইয়া আসিল।

উভয়েই নিঃশব্দ চরণে রোগার কক্ষে আসিয়া দাঁড়াইল। চৌধুরী মহাশয়ের জরাজীর্ণ দেহ শয্যায় বিস্তৃত। দুই মাস পূর্ব্বে মাণিক একদা রাত্রিকালে তাঁহার সহিত দেখা করিয়া গিয়াছে; তখন স্বভাব-প্রসন্ন প্রসন্ন চৌধুরীর বার্দ্ধক্য গ্রস্ত দেহ এমন জীর্ণ ছিলনা; এত অল্প দিন মধ্যে এমন ঘোর পরিবর্ত্তন মাণিক কল্পনায় ও আনিতে পারে নাই।

একটা চেয়ারে কবিরাজ মহাশয় উপবিষ্ট। মাণিক প্রাণ ভরিয়া সেই অনন্ত পথ যাত্রীর দিকে চাহিয়া দেখিল। তখন তাহার অন্তরের গভীরতম প্রদেশ হইতে বেদনার পাহাড় গলিয়া নয়ন পথে নিঃশব্দে ঝড়িয়া পড়িতে লাগিল।

মানুষকে উদর পূরণের চেষ্টায় সেকালের মত আবার ইতর প্রাণীর ন্যায় সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতে হইবে। সুতরাং আমাদের সুখ-শান্তি ও শারীরিক এবং মানসিক উন্নতির জন্য সমাজের স্থায়িত্ব একান্ত আবশ্যক। সমাজের অধিবাসীরা প্রত্যেকেই যদি স্বেচ্ছাচারী হয়, তবে সমাজ উচ্ছৃঙ্খলতার লীলা ভূমিতে পরিণত হইবে। রাজা, প্রজার বিষয় সম্পত্তি ও শরীর রক্ষার জন্য আইন প্রণয়ন করেন। কেহ সেই আইন ভঙ্গ করিলে রাজদ্বারে দণ্ডনীয় হয়। কিন্তু কয়জন অপরাধী ধরা পড়ে? আর ধরাপড়িলেও কয় জনের শাস্তি হয়? দোষী ব্যক্তি দণ্ড ভোগ করিয়া ও পুনঃ পুনঃ কুকার্য্য করিতে বিরত হয় না। আবার রাজার আইনের গণ্ডির বাহিরেও মানুষের এমন কতগুলি দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য আছে যাহা প্রতিপালন না করিলে সমাজে বাস করা অসম্ভব। ইন্দ্রিয় সংযম, মিতাচার, পিতৃ ও মাতৃভক্তি দাম্পত্য ভালবাসা, ভ্রাতৃ প্রেম, স্বজন প্রীতি, দয়া, ক্ষমা প্রভৃতি কতগুলি সদ্‌গুণ মনুষ্যত্বের প্রধান উপাদান এবং সমাজের স্থায়ীত্বের ভিত্তি স্বরূপ। কিন্তু আইনের সাহায্যে এই সকল সদ্‌গুণের অনুষ্ঠান করিতে কাহাকেও বাধ্য করা যায় না। এই জন্য মানুষের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও কল্যাণের জন্য এবং সমাজের স্থায়িত্ব ও শ্রীবৃদ্ধি সাধনের উদ্দেশ্যে সকল দেশেরই দূরদর্শী মনীষিগণ কতগুলি নিয়ম ও বিধি-ব্যবস্থার সৃষ্টি করিয়াছেন। এই সকল নিয়ম ও বিধি ব্যবস্থা মানিয়া চলিলেই মানুষ পূর্ণতা লাভ করিয়া সুখী হইতে পারে। এই বিধি নিষেধ হইতে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম পাপ ও পুণ্য সুনীতি ও দুর্নীতি জ্ঞানের উৎপত্তি হইয়াছে। ধর্ম্ম ও নীতিই মানুষের চিত্তশুদ্ধি সাধন করে। যে সকল কবি এবং শিল্পী হিতকর সামাজিক বিধি ব্যবস্থার বিরোধী আদর্শের সৃষ্টি করিয়া ধর্ম্ম ও নীতির অনুশাসন উপেক্ষা করিবার জন্য মানুষকে উত্তেজিত করে, সাহিত্যের অতি নিম্নস্তরে তাহাদিগের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

আদি কবি বাল্মীকি লোক শিক্ষার উদ্দেশ্যেই আদর্শ পুরুষ রামচন্দ্রের চরিত্র তাঁহার মহাকাব্যে কীর্ত্তিত করিয়াছিলেন। রামায়ণ রচনার পূর্ব্বে মহাকবি বাল্মীকি তাঁহার কাব্যের আদর্শের জন্য মুনিশ্রেষ্ঠ নারদকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—পৃথিবীতে এমন কোন্ ব্যক্তি আছেন যিনি গুণবান, ধার্ম্মিক, সচ্চরিত্র, সর্ব্বপ্রাণীর হিতানুষ্ঠানেরত, বিদ্বান্ ও সত্যবাদী? নারদ তখন নরোত্তম রামচন্দ্রের চরিত্র কথা বাল্মীকির নিকট বিবৃত করিলেন। বাল্মীকি তদনুসারে সেই আদর্শ চরিত্র রামচন্দ্রের পুণ্য কাহিনী বিবৃত করিতে সংকল্প করিলেন। ইহার পর তমসার তীরে বিরহবিহ্বল ক্রৌঞ্চের মর্ম্মভেদী কাতর ক্রন্দন শ্রবণে বাল্মীকির প্রাণের বীণা করুণ ঝঙ্কার দিয়া বাজিয়া উঠিল। তাঁহার কোমল হৃদয় ভেদ করিয়া কাব্যের উৎস উচ্ছ্বসিত হইল। সে-ই প্রথম ছন্দের বিকাশ। বাণীর রত্নসিংহাসন সেই শুভ মুহূর্ত্তে মহাকবির হৃদয় পদ্মে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হইল। বাল্মীকি তাঁহার মহাকাব্যে অভিনব মনোহর ছন্দে রাম চরিত্র বর্ণনা করিয়া অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। বাল্মীকির আদর্শ যেমন মহান্ তাঁহার কলা কৌশলও তেমনি অতুলনীয়। রামায়ণে পুণ্য-প্রভার সহিত কলা-মাধুর্য্যের অপূর্ব্ব সম্মিলন হওয়ায় মণি কাঞ্চন সংযোগ হইয়াছে। ভারতবর্ষে রামায়ণের প্রভাব অসামান্য। হিন্দুর জাতীয় চরিত্র ও জাতীয় বৈশিষ্ট্য রামায়ণের আদর্শেই গড়িয়া উঠিয়াছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী অতীত হইতেছে, তবুও রামায়ণের অমৃতের উৎস বিন্দুমাত্র শুষ্ক হয় নাই। প্রতিদিন পল্লীতে পল্লীতে ঘরে ঘরে রামায়ণ পঠিত ও শ্রুত হইতেছে। ধনী ও দরিদ্র, জ্ঞানী ও অজ্ঞান সকলের নিকট রামায়ণের সমান সমাদর। গার্হস্থ্য ধর্ম্মের এমন উচ্চ আদর্শ জগতে আর কোন কবিই অঙ্কিত করিতে সমর্থ হন নাই। কালিদাস-ভবভূতি হইতে কৃত্তিবাস-মধুসূদন পর্য্যন্ত কত কবি রামায়ণ হইতে রত্ন সংগ্রহ করিয়া বিচিত্র মালা রচনা করিয়াছেন। বাঙ্গলার গার্হস্থ্য জীবনে এখনও কৃত্তিবাসের রামায়ণের অসামান্য প্রভাব। এখনও মুদীর দোকান হইতে রাজপ্রাসাদ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র কৃত্তিবাসের সমান আদর। কৃত্তিবাস এখনও বাঙ্গালার নরনারীর হৃদয়ে অজস্র শান্তির অমৃত ধারা বর্ষণ করিতেছেন। ব্যাসের মহাকাব্য মহাভারতের সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে। ধর্ম্মের অবশ্যম্ভাবী জয় এবং পাপের অনিবার্য্য পতন ও প্রায়শ্চিত্ত এমন জলন্ত ভাষায় আর কোন কবিই চিত্রিত করিতে পারেন নাই।

কোন কোন আধুনিক কলাবিৎ লেখক বলিয়া থাকেন যে কালিদাস সৌন্দর্য্যের কবি। তিনি কেবল কলা কৌশল

প্রয়াস পাইতেছেন তাহারাও নিজেদের জন্য একটা ভিন্ন রকমের বাঙ্গালা ভাষা গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিবেন। এই সমস্যার সন্ধিক্ষেত্রে আমাদের পক্ষে এখন স্থান বিশেষের প্রতি পক্ষপাতিত্ব পরিহার পূর্ব্বক, এবং হিন্দু মুসলমান ভেদ ভুলিয়া যাইয়া—সকলের পক্ষে সাধারণ মাতৃভাষার মন্দিরে সমবেত হওয়াই সঙ্গত।

কাছারী ঘরের পেছনে মস্ত বড় একটা ময়দান। তাহাতে আজ মিটিং বসিবে। খুব বড় একটা সামিয়ানা টানানো হইয়াছে। গ্রামের মুন্সী মোল্লা মৌলভীগণ হাজির হইয়াছেন চৌকিদার পাহাড়ায় নিযুক্ত, পঞ্চায়েৎ ও তহশীলদারগণ দোয়াত, কলম, কালী, কাগজ লইয়া ব্যস্ত। মাঝখানে সারি সারি টুল, টেবিল, চেয়ার সাজানো রহিয়াছে। সদর হইতে খোদ ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব, দারোগা ও পুলিস সমভিব্যাহারে একটী জরুরী মোকদ্দমার তদন্তে আসিবেন। মোকদ্দমাটা ফৌজদারী। ঘড়ীতে ঢং ঢং করিয়া তিনটা বাজিয়া গেল। মটরকারে চড়িয়া সপারিষদ ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আসিয়া বৈঠকে উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে তার পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ও একজন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। চাপরাশী, আর্দ্দালী ও বেয়ারাগণ পেছনে আসিতেছে। বাবুদের জুতা, মোজা, হ্যাট্ কোট্ কলার নেকটাই, ঘড়ী, ছড়ী চেইন, চসমা প্রভৃতি পোষাকের রকমারি বাহার দেখিয়া চক্ষুতে তাক লাগিয়া যায়। চৈত্র মাসের গরম; হরদম পাখা চলিতে লাগিল, ইত্যাদি।

উল্লখিত ভাষায় দেশী শব্দ কয়টি এবং বিদেশী শব্দইবা কয়টি—হিসাব করিয়া দেখিলে চমক্ লাগিয়া যাইবে। অথচ এরূপ ভাষা এখন আমাদের দৈনিক, সপ্তাহিক, দ্ব্যাহিক ত্র্যাহিক প্রভৃতি সংবাদপত্রে এমন কি বিখ্যাত মাসিক পত্রিকাদিতে ও অহরহঃ চলিয়া আসিতেছে। ঐ প্রকারের ভাষাকে সংস্কৃতে অনুবাদ করিতে হইলে হুকার মালা ও নৈচা উভয়ই বদলাইয়া যাইবে। কিন্তু প্রয়োগ অনুসারে ঐ প্রকারের ভাষাকেও বাঙ্গালা সাহিত্যে আসন দিতে হইবেই। চতুষ্পাদিকা না বলিয়া চেয়ার টেবিল ব্যবহার করিলে, বাষ্পীয়পোত বা লৌহশকটে আরোহন না করিয়া ষ্টীমার এবং রেলগাড়ী চালাইলে, ধর্ম্মাধিকরণের দিকে না যাইয়া আদালত বা কোর্টের আশ্রয় লইলে, বঙ্গভাষার মানহানির আশঙ্কা নাই। পরন্তু স্থান বিশেষে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় না হইয়া হতভম্ব বা ভ্যাবাচ্যাকা হইয়া গেলে, দিকভ্রান্তি অবস্থায় দিশা হারা হইয়া পড়িলে, স্বকপোল কল্পিত চিন্তায় মনগড়া কথা কহিলে সংস্কৃত ব্যাকারণের নিকট জবাব দিহি করিবার দোষ ঘটিলেও উদ্ভট বাঙ্গালা ভাষার নিকট রেহাই পাওয়ার আশা আছে।

তাই বলিয়া—নেক্সট্ ইয়ারে একজামিনটা দিয়েই একছার চেঞ্জে বেরিয়ে পড়ব মনে করেছি। ইউ সি মাই ডিয়ার ফ্রেণ্ড, ডিসপেপসিয়ায় আমার জলজ্যান্ত শরীরটাকে পিষে মারবার জো করে তুলেছি। তার উপর আজকে আমাদের ফ্যামিলি ডাক্তার বল্লেন কি না কাল থেকে আমাকে ফুল ওয়ান্ আওয়ার মর্ণিং ওয়াক করতে হবে। দিন দিন যে আই সাইটটাও কমে আস্‌ছে ভায়া, তার একটা কিছু রেমেডি টেমেডি খুজে পাচ্ছিনা। পুরীর ক্লাইমেট্ আমার সিষ্টেমে সুট করবে কি না বল্‌তে পারো কি? সি-ব্রীজটার নাকি খুবই ডাইজেষ্টীং পাওয়ার আছে।

এই প্রকারের জগা খিচুরীর ভাষা কি বর্ষা কি শীত কোন কালেই মধু রোচক হইবেনা। বর্ত্তমান কালের অনেক লেখকই মাতৃভাষার ভাণ্ডারে যথাসাধ্য দান করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইতেছেন সত্য কিন্তু সংযম ও সাধনার অভাবে কেহ কেহ গল্প ও উপন্যাসাদিতে রুচিবিরুদ্ধ চরিত্র চিত্রন করিয়া কেহ বা সাম্প্রদায়িক নিন্দা কুৎসা অঙ্কিত করিয়া স্বকীয় একদেশদর্শিতার পরিচয় দিতেছেন। শুধু ইহাই শেষ নহে, এক শ্রেণীর লেখক ভাষাতে অধিকারী না হইয়াও নিজেদের ভাষাকে খাসা মনে করিয়া জন সাধারণকে হাসাইতেছেন। শুনিতে পাই বাঙ্গালা ভাষাটাকে ব্যবসা বণিজ্যের বাজারে স্বল্প কথায় চালাইবার নিমিত্ত অনেকেই নাকি ইহার পরিমিত ব্যবহার লঘু প্রচলন ও দ্রুত প্রচলন পছন্দ করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যেখানে ছোট খাট একজন মহারাজকে সম্মুখে দাঁড় করাইলেই শোভন হয়, সেই স্থানে লম্বা চওড়া সুদীর্ঘ একজন যেথাপ্পা "মহারাজাকে" প্রায়শই প্রশ্রয় দেওয়া হইয়া থাকে। বুঝিবা "হোমড়া চোমড়া অজা গজার সঙ্গে মিল খাওয়াইবার নিমিত্ত "…মহারাজা" ব্যবহার করিয়া নিজেদের ব্যবসা (:) বাণিজ্যের থিওরির ব্যত্যয় করেন।

তারপর পদ্যের দেখা দেখি গদ্যের ভাষায়ও অনেক স্থানে

বিবাহ বাড়ীতে পাত্র-পাত্রী উভয় পক্ষীয় আত্মীয় স্বজনের উপরেই অল্লাধিক পরিমাণে গালি বর্ষিত হইয়া থাকে। আগন্তুক নাপিত ধোপা এমন কি, পুরোহিত ঠাকুরকে পর্য্যন্তও ভাগ লইতে হয়। নাপিত বর কিম্বা বধুকে কামাইতে বসিল, মেয়েরা গান ধরিলেন,—

"আমার সোণার চাঁদকে কামইতে ;—
নবদ্বীপের নাপিত আইসাছে।
হাত ভালা কামাও নাপিত, হাতের দশ নৌখ রে।
পাও ভালা কামাও নাপিত, পায়ের দশ নৌখ রে।
মুখ ভালা কামাও নাপিত, পূর্ণমাসীর চাঁন্দরে।
মাথা ভালা কামাও নাপিত, ডাব নারিকলরে।
ভালা কইরা কামাইলে, পাইবে জমী বাড়ীরে।
ভালা না হইলে নাপিত, খাইবে ক্ষুতার বাড়িরে।"

পুরোহিত নান্দী-মুখ বা বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করাইতে যেই বসিলেন,—অমনি মেয়েরা গীত লইলেন,—

"বাছাই নান্দীমুখ করে,—শুভ কার্য্য কবে।" ইত্যাদি। এই গীতটি গাইয়াই ধরিলেন বামুনকে,—

"উন্দ্‌রা বান্দ্‌রা বামুনরে, কত কলা লাগেরে,
যত কলা লাগেরে, দিব জামাইর মায়েরে।' ইত্যাদি।

রসজ্ঞ সাহিত্যিক লইবেন—কবিতা কুসুমের গোলাপ-গন্ধ; অশ্লীলতার পূতি গন্ধ তাঁহাদের আঘ্রাণের বিষয় নহে। ধূলার সহিত চিনি মিশ্রিত থাকিলে, পিপীলিকা ধূলা ফেলিয়া চিনিই গ্রহণ করিয়া থাকে।

পূজার মাল্‌সী গীত হইবার সময় আজকাল মধ্যে মধ্যে আমরা অন্দর মহল হইতে কবিওয়ালাদের ডাকসুর এবং স্বর্গীয় সাধক কবি রামপ্রসাদের গলা শুনিতে পাই।

"কালিকে, ওমা ভব পালিকে, বাঙ্গালীকে নিওনা আসাম।
তুমি আদ্যাশক্তি, ভগবতী,
সন্তানের প্রতি হইওনা বাম॥" ইত্যাদি।

'মা, মা, বলে আর ডাকবনা।
ছিলাম গৃহবাসী, বানাইলে সন্ন্যাসী,
আর কি ক্ষমতা রাখ আউলাকেশী,—
দ্বারে দ্বারে যাব, ভিক্ষা মেগে খাব,
মা মৈলে কি তার ছেলে বাঁচেনা॥" ইত্যাদি।

জল ভরার গীতে বৈষ্ণব কবিদের প্রাচীন রূপানুরাগের পদই অধিক। আধুনিক পল্লী কবিদেরও রসাল রসাল অনেক পদ জল ভরায় স্থান পাইয়াছে। যথা,—

"গৌররূপ লাগিল নয়নে।
আমি কুক্ষেণে চাহিয়াছিলাম গো,—
গৌরচান্দের পানে॥
কলসীতে নাইরে পাণী, আমি গিয়াছিলাম সুরধুনী,
গৌর কেবা না শুনি শ্রবণে।
একদিন জলের ঘাটে দেখে তারে, মরেছি পরাণে॥
গৌর থাকে রাজপথে,—
তোমরা কেউ যাইওনা জল আনিতে, গো
দেখ লে তারে মরিবে পরাণে,
শেষে আমার মত ঠেক্‌বে তোরা,
গোপাল চান্দে ভণে॥" ইত্যাদি

এগুলি খাটি মেয়েলী সঙ্গীত নহে। খাটি মেয়েলী সঙ্গীত সকল বহুকাল পূর্ব্ব হইতে, পূজায়, ব্রতে, সহেলায় ও বিবাহাদিতে মন্ত্রবৎ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। তাহার কোন পরিবর্ত্তন পরিবর্দ্ধন নাই। একসুরে একটানে চলিয়াছে।

কার্ত্তিক পূজার গীতের বয়স নির্ণয় করা অসাধ্য। অতি প্রাচীন কাল হইতে যে সুরে যে ভাষায় চলিয়া আসিতেছে, এখনও সেই রূপই আছে। যথা,—

"বুলে আরে কার্ত্তিক যাইবাইন
অভিলাসে এরো, কে কে যাইবা,
সঙ্গে লো ঠমকী রাধা, কে কে যাইবা।
ঘর থাক্যা রামের পিসী বুলে—
আমি এরো আমি যাইবাম সঙ্গে লো
ঠমকি রাধা, আমি যাইবাম॥' ইত্যাদি।

সন্ধ্যা সময় হইতে আরম্ভ হইয়া পরদিন প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত সারা রাত্রি ভরিয়া নানারকমের গীত কার্ত্তিক পূজায় গীতহয়। নমুনা স্বরূপ একটা বাঘের গীত লিখিয়া দিতেছি—

"বাঘা কান্দেরে, বাঘুনীর লাগিয়া, বাঘা কান্দেরে।
বাঘা বুল বাঘুনী এই না পথে যাইও।
নবীনের গরু দেখ্যা ছেলাম জানাইও॥

এইরূপ হারুর গরুর দেখ্যা, রামনাথের গরু দেখ্যা ছেলাম জানাইও।' অর্থাৎ ব্রতে যতজন মেয়েলোক থাকেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের বাটীস্থ একজনের নামোল্লেখ করিতে

ব্রহ্মা হৈলেন পুরোহিত, রাম হৈলেন যজমান।
কও ব্রহ্মা ভগবতীর পূজার বিধান॥
শঙ্খ লাগে সিন্দূর লাগে, রজত কাঞ্চন।
ফুম্‌কুম্‌ কস্তুরী লাগে,—আগর চন্দন॥
সপ্তমী পূজিলেন ব্রহ্মা, সপ্ত উপচারে।
ভোগ নৈবিদ্যি দিলেন ব্রহ্মা, হাজারে হাজারে॥
অষ্টমী পূজিলেন ব্রহ্মা, অষ্ট উপচারে।
বিল্বপত্র দিলেন ব্রহ্মা,—হাজারে হাজারে॥
নবমী পূজিলেন ব্রহ্মা, নব উপচারে।
মেষ-মৈষ দিলেন ব্রহ্মা, হাজারে হাজারে॥"

রামের দুর্গোৎসবে মেষ-মহিষ বলি পড়িয়াছিল কি না,—তাহা রাম আর রামের আরাধ্যা দেবী মা দুর্গাই জানেন। এ সম্বন্ধে রামায়ণ রচক মহাকবি বাল্মীকি কোন সাক্ষ্য দান করিয়া যান নাই।

ময়মনসিংহ শাক্ত প্রধান স্থান! মা ভগবতীর দুয়ারে মহিষ-পাঁঠা বলি দিলে তিনি অতিশয় প্রীতিলাভ করেন, এই নিখুত খাটি বিশ্বাসের বশীভূতা আমাদের গৃহলক্ষ্মীগণ সর্ব্বদাই কাহিলে কাতরে, দেবীর দুয়ারে যোড় পাঁঠা, যোড় মহিষ মানসিক করেন। মেয়েদের এই দৃঢ় বিশ্বাসের অনুরোধ ছাড়াইতে না পারিয়া, ব্রহ্মাও রামচন্দ্রের দুর্গোৎসবে হাজারে হাজারে মেষ মহিষ বলি দিতে বাধ্য হইলেন।

"নবমী পূজেন ব্রহ্মা, নব উপচারে।
মেষ মৈষ দিলেন ব্রহ্মা হাজারে হাজারে॥"

৪নং বিবাহের গীত।

"শুভ ক্ষণে আনিল গৌরীরে ও কি ওরে,
ইন্দ্র ধরিল ছাতি, বেদপড়ে প্রজাপতি,
নটেতে মঙ্গল ধ্বনি করে॥
ওকি ওরে, অস্তম্পট করিদূর, দশ বাহু করি যোড়,
প্রণাম যে করিল বিশেষে।
ওকি ওরে, তুলাতুলি সপ্তবার, জয় ধ্বনি জোকার,
মশাল জ্বলিছে চাইরে পাশে॥
ওকি ওরে, শিবের মুকুট মাথে, ফুল ছিটায়
বাম হাতে, নামাইল, ছাঁয়া মণ্ডপ ঘরে।
কি ওরে, দেখিয়া গৌরীর মুখ, শিবের মনে
কৌতুক, পঞ্চমুখে হাসে মহেশ্বরে॥
ওকি ওরে, তবে সাত পাক ফিরি, পার্ব্বতী আর
ত্রিপুরারি, রৈল পূর্ব্ব পশ্চিম মুখে।
ওকি ওরে, জিনিয়া সে কোটি ভানু' দোঁহার
সুন্দর তনু. হেন রূপ দেব গণে দেখে॥"

৫নং বিবাহের গীত।

"পুষ্কুনীর চাইর পারে,
চাম্পা নাগেশ্বর,
ডাল ভাঙ্গ, ফুল্প তুল,
বিদেশী নাগর।
দেখা দেলো. রায়ের ভগ্নী,
দেখা দে আমারে,
কত টেকার অলঙ্কারে শোভিব তোমারে?।
লক্ষ টেকার গয়না হৈলে, না শোভে আমারে।
তোমার হাতের বাজু হৈলে, শোভিবে আমারে।"

৬নং—বর বধুর যাত্রা সময়ের গীত।

"চল কন্যা দেশে যাই, আর বিলম্বের কার্য্য নাই,
মা রৈছেন্ বৌ ঘরা পাতিয়া।
চল কন্যা দেশে যাই, আর বিলম্বের কার্য্য নাই,
ভগ্নী রৈছে ময়ুর পাখা লৈয়া।
চল কন্যা দেশে যাই, আর বিলম্বের কার্য্য নাই,
পিসী রৈছেন্ ধান্য দুর্ব্বা লৈয়া।
চল কন্যা দেশে যাই আর বিলম্বের কার্য্য নাই,
(আমার) মামী রৈছেন্ ঘৃতের বাতি লৈয়া।"

৭নং বর বধু বাড়ীতে পঁহুছিলে গীত।

"তুমি যে গেছলা রে বাছাই, নবীন শ্বশুর দেশে,
নবীন শ্বশুর দেশে।
তোমার শ্বশুর শাশুড়ীয়ে কি কি দান কর্চ্ছে?।
দিছিল একটা শালের গো ঘোড়া,
তারে থৈয়া আইছি. তারে থৈয়া আইছি,
তোমার বধুরে লৈয়া দেশে চল্যা আইছি॥" ইত্যাদি।

কন্যাকে জামাতার সঙ্গে যাত্রা করাইয়া দিবার সময় স্ত্রী-পুরুষ সকলেই এক কূল কিনারা শূন্য করুণ রসের সমুদ্রে ডুবিয়া পড়েন। তখন মেয়েরা পদ্মা পুরাণের কবি নারায়ণদেবের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক, সাহে রাজার স্ত্রী

তবে এ ছেলে যে নেহাৎ মূর্খ তাহা নহে। লেখা পড়া জানে এণ্টেন্স পর্য্যন্ত ফেল করিয়াছে।”

ছোট কর্ত্রী শ্বস্তির শ্বাস ফেলিয়া বলিলন—“না আমার আপাততঃ ছেলের দরকার হইবে না। মণির বিবাহই হউক। তারপর মণিই কনকের বিবাহ ঠিক করিবে। তখন ঘটক ঠাকুরকে আমি পুনরায় খবর দিব।”

ঘটক এখান হইতে বিদায় হইয়া মণি বাবুর উদ্দেশ্যে গেলেন।

বড় কর্ত্রী বলিলেন—“মেয়ের কি বয়স আসিতেছে, না যাইতেছে, ছোট বউ? তুমি কেমন নিশ্চিন্তি?”

ছোট কর্ত্রী বলিলেন—“কি করিব দিদি? তাই বলিয়া যারতার হাতে তো তুলিয়া দিতে পারি না।”

বড় কর্ত্রী—“তবে তুমি মাথনকেই ঠিক করিয়াছ বুঝি?” এবার বড় কর্ত্রীর স্বর ঘৃণা মিশ্রিত নহে।

ছোট কর্ত্রী বলিলেন—“একেবারে কিছুই ঠিক করি নাই; তোমাদের পরামর্শ ছাড়া কি কিছু করিতে পারি দিদি?”

বড় কর্ত্রী সহানুভূতির সুরে বলিলেন—‘অমন্দ কি? তবে কিছুই নাই—কেহ নাই—এই আর কি?’

ছোট কর্ত্রী খুব সাবধানতার সহিত বলিলেন—“দিদি ভগবান সহায় থাকিলেই সব আছে।”

রমণী।

জগতের মাঝে তুমি নারী অতি ধন্যা;
ধরণীর বরণীয়া সুন্দরী কন্যা।
প্রকৃতির শোভা তুমি রমণীয়া রমণী;
সৃষ্টিতে নারী তুমি জগতের জননী।
স্বরগের ঝড়া-ফুল নেমে এস মর্ত্তে;
মানবের মন টানো নানা মোহাবর্ত্তে।
রূপে গুণে ভরে' আছো মানবের চিত্ত;
প্রেমিকেরে ঘিরে আছো নিয়ে প্রেম-বিত্ত।
তুমি দাও ধরণীরে নিতি নব শিক্ষা;
সন্তানে দাও নীতি, ভালোবাসা দীক্ষা।
অক্ষমে দাও তুমি উৎসাহ ক্ষমতা;
লাঞ্ছিতে দাও সদা স্নেহ ও মমতা।
আনো প্রীতিভাব কভু হানো রিষ দৃষ্টি;
স্বরগের শোভা তুমি প্রলয়ের সৃষ্টি।
কভু তব রমণীয়া সুন্দর কান্তি;
ভ্রান্তিতে ডুবাইয়া দূর করে শ্রান্তি।
বিধির বিধান কভু করিয়া বিচূর্ণ;
সৃষ্টি ও প্রেমে ভরা ধরা যার জন্যে।
প্রণমি তোমারে নারী আলো-করা অবনী;
চুম্বি চরণে তব স্নেহময়ী জননী।

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ।

প্রতিবাদের প্রতিবাদ।

বিগত ভাদ্রের সৌরভে “জ্যোতিষে অয়ন সিদ্ধান্ত” শীর্ষক প্রবন্ধে একটী শ্লোকের ব্যাখ্যা করা হইয়াছিল। শ্রীযুত বঙ্কিমচন্দ্র কাব্যতীর্থ জ্যোতিঃসিদ্ধান্ত মহাশয় আশ্বিন সংখ্যায় উহার প্রতিবাদ প্রকাশ করিয়াছেন।

তাহার লেখা অনুসারে যদি “পূর্ব্ব পক্ষ নিরসন পূর্ব্বক যথার্থ পক্ষের স্থাপনকেও সিদ্ধান্ত বলা হয়” তবে আমার লিখিত সিদ্ধান্ত শব্দের অর্থেও কোন দোষ হয় নাই। Theory অর্থে যাহা বুঝায়, উহাও তাহাই। Final conclusion অথবা decision হইল গণিতের formula অথবা Æsoph's Fable এর, কিম্বা বিষ্ণুশর্ম্মার moral সিদ্ধান্ত বা Theory শব্দের পাছে স্বতই যুক্তি সূচীত হয়। যেমন theory of light, theory of heat, theory of evoiution etc. মোট কথা, এক কথায় কোন Theory বা সিদ্ধান্ত হয় না। বলিতে কি প্রাচীন “সংহিতায়” বা “সিদ্ধান্তে” বা ‘তন্ত্রে” ঐ সকল বিষয় থাকিলেও ঐরূপ কোন গ্রন্থ বঙ্গভাষায় নাই। আর ঐ সকল শব্দে প্রয়োগ বা গ্রন্থের নামাকরণ শিথিলভাবেই (loosely) করা হইয়াছিল। এত শিথিল যে এগুলি বুঝিবার জন্য গণ্ডায় গণ্ডায় ব্যাখ্যা, টীকা ও ভাষ্যের দরকার হইয়াছিল। সুধু তাহাই নহে, ভাষ্যের ও ভাষ্য করিবার দরকার হইয়াছিল। সিদ্ধান্ত শিরোমণির ভাষ্য ‘বাসনা’। আবার বাসনার ভাষ্য “বার্ত্তিক”। মূল গ্রন্থের লিখিত বিষয় পর্য্যাপ্ত হইলে টীকার টীকা বা তস্য টীকার দরকার হইত না। Theory ও Theorem শব্দের মূল এক। আর উপপত্তি শব্দ

কয়েকটি শ্লোক সর্ব্বসমক্ষে তথা প্রতিবাদকারীর সমক্ষে এই সঙ্গে স্থাপিত করিতেছি। তিনি অনেকগুলি 'কেন'র অনুসন্ধান পাইয়াছেন। উক্ত 'কেন' সমূহের ভাণ্ড খুলিয়া তিনি উক্ত শ্লোক কয়টীতে নিহিত সত্য পত্রিকায় প্রকাশ করুন।

মার্জ্জিত ভাষায় আলোচনা করাই মার্জ্জিত বুদ্ধির পরিচায়ক স্বয়ং বিজ্ঞ ব্যক্তি কখনও অজ্ঞের ভাষা প্রয়োগ করিয়া নিজের রসনাও রচনাকে কলুষিত করেন না। অথচ পুনঃ পুনঃ "উপহাস্যাস্পদ" প্রভৃতি চটপটা ব্যবহারে উপাধিহৃষ্টতার পরিচয় দিয়া পাণিনি পাঠের অপকৃষ্টতা প্রদর্শন করিতে পারেন না।

১। দিনং ন খণ্ডং রস নিঘ্ন ঘস্রাৎ নবাপ্ত গোক্ষাংশ
যুগংশকাপ্তম্। অব্দাৎ খতিথ্যংশ বিলিপ্তিকাঢ্যং
ক্ষেপাচ্যুতং স্যাৎ স্ফুটপাত এষঃ। ক্ষেপ্যো গৃহাপ্তো
দহনো হুতাশো রবির্দ্বিবাণৌ গ্রহণে রবীন্দোঃ॥

২। দ্বি নিঘ্ন ঘস্রাত্রিখসপ্ত লব্ধ
হীনাদ্দিনাৎ দ্বাদশ লব্ধ মিজ্যঃ
অংশাদিরব্ধা ন্নিগমেন নিঘ্নাৎ
খাগাত্র নেত্রাপ্ত কলান্বিতশ্চ॥

৩। যে যে মাসের যে যে রাশি।
তার সপ্তমে থাকে শশী॥
সে দিন হয় পৌর্ণমাসী।
অবশ্য রাহু গ্রাসে শশী॥

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

"প্রতিবাদের প্রতিবাদের" উত্তর।

সুরেশ বাবুর উল্লেখিত জবাব পড়িয়া মনে হয় তিনি আমার প্রতিবাদে "অজ্ঞ" শব্দ দেখিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন এবং শুধু আমাকে গালিদিবার জন্যই প্রতিবাদের প্রতিবাদ লিখিয়াছেন। নচেৎ এত অবান্তর বিষয়ের অবতারণার কোনই হেতু নাই।

তিনি প্রথমেই লিখিয়াছেন যে তিনি যে শ্লোক ব্যাখ্যা করিয়াছেন আমি তাহার প্রতিবাদ করিয়াছি। কিন্তু ইহা সত্যের সম্পূর্ণ বিরোধী। তাঁহার কৃত শ্লোক ব্যাখ্যা সম্বন্ধে বাদানুবাদের কোনও বিষয়ই নাই। কিন্তু তিনি মাত্র শ্লোক ব্যাখ্যা করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই; ঐ শ্লোক ব্যাখ্যার হেতু স্বরূপে সিদ্ধান্ত জ্যোতিষের এক ভ্রমাত্মক সংজ্ঞা দিয়াছেন এবং তাহা মূলভিত্তি করিয়া তাঁহার প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। আমি আমার প্রতিবাদে শুধু তাহাই প্রদর্শন করিয়াছি। তিনি এসম্বন্ধে একটী কথাও লিখেন নাই। তিনি সিদ্ধান্ত—শিরোমণি সূর্য্যসিদ্ধান্ত ও সিদ্ধান্ত রহস্যকে একশ্রেণী ভুক্ত করিয়া "ঐ সকল গ্রন্থে সিদ্ধান্ত নাই।" বলিয়া প্রথমে লিখিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ ভুল আমি তাহাও লিখিয়াছি। সুরেশ বাবু এসম্বন্ধেও একটী কথা প্রতিবাদে লিখেন নাই। "ঐ সকল গ্রন্থ' এরূপ লিখাতে সিদ্ধান্ত শিরোমণি প্রভৃতি গ্রন্থেও সিদ্ধান্ত নাই ইহা বুঝা যায়। সুরেশ বাবু এত বড় একটী ভ্রমকে কি ভাবে ঢাকিতে চান তাহা আমরা বুঝিনা। তিনি ভাষ্য বলিতে বাঙ্গালা ভাষ্য বুঝেন, কিন্তু শুধু সিদ্ধান্ত-রহস্য কেন এ যাবৎ কোনও সিদ্ধান্ত জ্যোতিষেরই বাঙ্গালা ভাষ্য হয় নাই। "বাসনার ভাষ্যকাৰ্ত্তিক" ইত্যাদি কথা অতিঅসতর্ক ভাবে লিখিয়াছেন। তিনি টীকা, ভাষ্য প্রভৃতির পার্থক্য বুঝিতে চেষ্টা করেন নাই; উহার প্রত্যেক শব্দ বিশেষ ২ অর্থে ব্যবহৃত হয়। দেশীয় পঞ্জিকা নাবিক পঞ্জিকা নহে। ঐ দুইয়ের তফাৎ চিরকাল থাকিবে। দেশীয় পঞ্জিকাকে সিদ্ধান্তজ্যোতিষ করার চেষ্টা বৃথা।

সিদ্ধান্ত রহস্যের নাম লইয়া তাঁহার এত আপত্তি কেন বুঝিতে পারিনা। কারণ গ্রন্থের নামে সিদ্ধান্ত শব্দ থাকিলেই কি তাহা সিদ্ধান্ত জ্যোতিষের অন্তর্ভুক্ত হইবে? সিদ্ধান্তের বা সিদ্ধান্ত বিষয়ের রহস্য বা গূঢ়মর্ম্ম অর্থ করিয়া কি করণ গ্রন্থের নাম দেওয়া যায়না? সেজন্য কি ভাষ্যের ভাষ্য টীকার টীকা আবশ্যক হয়?

কোনও বিশেষজ্ঞ মধ্যবর্ত্তী না হইলে আমাদের তর্কের সুমীমাংসা হইবে না মনে করিয়া সৌরভসম্পাদকের পরামর্শ মতে আমি প্রবীন অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রায় যোগেশ চন্দ্র রায় বাহাদুর বিদ্যানিধি এম,এ মহোদয়ের নিকট সুরেশ বাবুর মূল প্রবন্ধ, আমার প্রতিবাদ এবং সুরেশ বাবুর প্রতিবাদের প্রতিবাদ একত্রে রেজেষ্ট্রি করিয়া পাঠাইয়াছিলাম। তিনিও তাঁহার উত্তরে মাত্র সিদ্ধান্ত

উৎকর্ষ লাভ করিতে লাগিলাম। কিছু দিন এই ভাবে অতিবাহিত হইলে মনের মলা-মাটি দূর হইয়া আমার চক্ষে যেন জগৎ জুড়িয়া এক আনন্দের বাজার খুলিয়া গেল। আমি তখন নাম সঙ্কীর্ত্তনে উন্মত্ত।

কিন্তু মা'র ভাবনার বিরাম নাই। তিনি সর্ব্বদা কেবল এই কথাই ভাবেন, আমার দুর্গাচরণ না কি শেষকালে আমাকে ফাকি দিয়া পালায়। আমি পুনঃ বিবাহ করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় সংসার পাতি, আমার মায়ের ইহাই ঐকান্তিক ইচ্ছা। আমি বলি—'মা, আর এই যন্ত্রণার আবশ্যক কি? আমি নাম কীর্ত্তন করিয়াই বেশ সুখে আছি।'

কিন্তু মা এ কথা কানেই তুলেন না।

আমার প্রেম বিকার দর্শনে মা এতই উতলা হইয়া পড়িলেন যে আমাকে একা কোথাও যাইতে দেন না, আমি যেখানে কীর্ত্তন গাহিতে যাই, মাও সেখানে গমন করেন।

বলিলে পাপ হয়, মা যেন সেই ন'দের নিমাইর অবস্থাটাই আমাতে পরিকল্পনা করিতে লাগিলেন। শচী যেমন শ্রীবাস-মুরারি-গদাধরকে পাইলেই—"নিমাই যেন তার সন্ন্যাসী হইয়া না যায়' অনুরোধ করিতেন, আমার মাও আমার সঙ্গী সাথীদিগকে সেইরূপ মাথার দিব্য দিয়া বলিতেন "তোমরা দেখিও আমার দুর্গাচরণ যেন সন্ন্যাসী হইয়া না যায়।"

আমার ভক্তি রাজ্যের কোন কোন বন্ধু মা'র কষ্ট দেখিয়া আমাকে যখন বিবাহ করিতে বলিতেন, আমি বলিতাম :—

করিয়াছি হরি পদে মতি সমর্পণ,
আর কেন ভাই, আপদ বালাইর করবো আয়োজন?
ম'রে গেছে সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা হৈছে দেশ,
বুড়ো বয়সে বিয়ে ক'রে বাড়াই কেন আর ক্লেশ?

একবার চব্বিশ প্রহরিয়া কীর্ত্তনোৎসবে বিশেষ রূপে অনুরুদ্ধ হইয়া পুরালিয়া গিয়াছি। মাও সঙ্গে আছেন।

মা কীর্ত্তনস্থলীর এক পাশে বসিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে থাকেন। ভক্তেরা মনে করেন, নিমাই নীলাচলে যাওয়ার প্রাক্কালে নদীয়ার ভক্ত মণ্ডলী শান্তিপুর নাথের ভবনে যে দৃশ্য দর্শনে ধন্য হইয়াছিলেন, বুঝি তাহাদের সম্মুখেও আজ সেই দৃশ্য। তাহারা দৌড়িয়া গিয়া মা'র চরণ ধূলি গ্রহণ করেন। তাহা দেখিয়া আমার আনন্দের মাত্রাও শত গুণ বৃদ্ধি হইয়া উঠে।

কিন্তু পুরালিয়ার কীর্ত্তনই আমার কাল হইল। ভক্ত হরিপ্রসাদ পূর্ব্বেই মা'র সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়া প্রকাশ্যে কীর্ত্তনানুষ্ঠান ও গোপনে আমার জন্য মৃত্যুবাণ সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছিল।

যেদিন কীর্ত্তন শেষ হইল, সেই দিন বিবাহের ঢোল বাজিয়া উঠিল। হাঁড়ি হাঁড়ি হলুদ গুলিয়া ভক্তেরা কৌতুকানন্দ জুড়িয়া দিল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"দাদা, একি?"

হরিপ্রসাদ বলিল—"ভাই দুর্গাচরণ, মহাপ্রভুই বলিয়া গিয়াছেন কলিতে সন্ন্যাস মিথ্যা। এই বাড়ীতেই এক কুলীন বিধবা তাহার বয়স্থা কন্যাকে লইয়া বড়ই বিপদে পড়িয়াছেন। পাল্টা ঘর নাই। অকুলীনে দিলে কুল ভঙ্গ হয়। আমি তোমার সঙ্গে সেই মেয়ের বিবাহ দেওয়ার উদ্যোগ করিয়াছি। তোমার মা পূর্ব্বেই আমাকে সম্মতি দিয়া রাখিয়াছেন এবং সেই জন্যই তোমার পুনঃ পুনঃ নিষেধ সত্বেও তিনি আমাদের এখানে আসিয়াছেন। আমার এই চব্বিশ প্রহরিয়া সঙ্কীর্ত্তনের উদ্দেশ্যই এই বিপন্ন কুলীন পরিবারকে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার করা। ভাই, তুমি কি আমাকে নিরাশ করিবে?"... ইত্যাদি

ইহার পর হরিপ্রসাদ ভক্তদিগের মাঝখানেই একটী কিশোরীকে লইয়া আসিয়া তাহার মুখখানি উন্মুক্ত করিয়া ধরিল, মা বলিলেন "দুর্গারে, লক্ষ্মী না থাকিলে ঘর যে লক্ষ্মী ছাড়া হয়..."

মার সম্ভাষণে আমার দৃষ্টি হরিপ্রসাদের দিকে আকৃষ্ট হইল। ঘন ঘন হরিধ্বনির মাঝে—আমার সম্মতির অপেক্ষা না করিয়াই শুভদৃষ্টি হইয়া গেল।

শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কবিভূষণ।

রামায়ণে রত্নের ব্যবহার।

মণি-মরকত প্রভৃতি মূল্যবান পার্ব্বত্য প্রস্তর ও প্রবাল-মুক্তা প্রভৃতি বহুমূল্য জলজ দ্রব্যাদিকেই সাধারণত রত্ন বলা

হইয়া থাকে। রামায়ণে রাজগৃহাদির, পোষাক পরিচ্ছদের, তৈজস পত্রের ও অন্যান্য বর্ণনায় নানা প্রকারের রত্নাদির উল্লেখ আছে। আমরা বিভিন্ন শিল্পের আলোচনায় সে সকলের মোটামুটি উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি। এস্থলে বিশেষ ভাবে পুনরায় তাহার উল্লেখ ও ব্যবহারের আলোচনা করিব।

ভারতবর্ষে এই সকল জিনিস অতি প্রাচীন কাল হইতেই খুব সহজ লভ্য ছিল, এই কারণে ভারতীয় শিল্পীরা বিলাস প্রসাধণের বিশেষ উপকরণ রূপে মণিমুক্তার এত অধিক ব্যবহারে আনয়ন করিতে পারিয়াছিল।

রামায়ণে নিম্ন লিখিত রত্নগুলির উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। মহা নীলমণি, ইন্দ্রনীল, বারিসম্ভব মণি, নীলকান্ত, পদ্মরাগ, বিদ্রুম (প্রবাল) বৈদূর্য্য, মরকত, মুক্তা, স্ফটিক, বজ্রমণি বা হীরক, শ্বেত, রক্ত ও কৃষ্ণ শিলা ইত্যাদি।

তখন ইন্দ্রনীল নামক মূল্যবান প্রস্তর খোদিয়া শিল্পীরা মূর্ত্তি প্রস্তুত করিত। অযোধ্যার রাজ পথের পার্শ্বে পার্শ্বে ইন্দ্রনীল প্রস্তরের মূর্ত্তি (Statue) স্থাপিত ছিল।

তত্রেন্দ্রনীল প্রতিমা প্রতোলীবর শোভিতাঃ॥ ১৮।২।৮

রাবণের পুষ্পক রথে মূল্যবান ইন্দ্রনীল ও মহানীল নির্ম্মিত বেদিকা ছিল।

ইন্দ্রনীল মহানীল মণি প্রবর বেদিকাম্। ১৬।৫।৯

সীতা রামের যে চূড়ামণি সযত্নে অভিজ্ঞান স্বরূপে রাখিয়াছিলেন, সেই চূড়ামণিটী ছিল—'বারিসম্ভবঃ' অর্থাৎ সমুদ্র রত্ন (সু ৪০-৮ শ্লোক)

বিদ্রোম বা প্রবালের উল্লেখ অযোধ্যায় রাম ভবনের বর্ণনায় আমরা উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি। সে ভবনের দ্বার সমূহ ছিল—প্রবাল ও মণি মুক্তা খচিত।

" মণি বিদ্রুম তোরণম্ .. .. মুক্তামণির্ভিরাকীর্ণং

রাবণের রথ খানাও ছিল—

হেমজাল বিততং মণি বিদ্রুম ভূষিতম্। ৩।৬।১১

রাবণের সিংহাসনগুলির কোন কোনটী ছিল বৈদূর্য্যমণি খচিত, কোনটী বা ছিল মরকতময়। (ল ১১)

রাবণের শয্যাগৃহের পর্য্যঙ্কটী বৈদূর্য্য মণির সহিত হস্তী দন্তের সমারেশে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

স্তীর্ণ কাঞ্চন চিত্রাঙ্গৈ বৈদূর্য্যাশ্চ বরাসনৈঃ। ২।৫।১০

আজ কাল যেমন হীরক অলঙ্কারে ব্যবহৃত হয় রামায়ণের যুগেও তাহা সেইরূপে ব্যবহৃত হইত। হীরক খচিত অলঙ্কার, (সু ১০) হীরক খচিত বর্ম্ম (ল ৭০) প্রভৃতির উল্লেখ রামায়ণে আছে। লঙ্কার রাজ প্রাসাদগুলিও বজ্র মণিতে বা হীরক খণ্ডে শোভিত ছিল।

বজ্র বৈদূর্য্য চিত্রৈশ্চ স্তম্ভৈর্দৃষ্টি মনোরমৈঃ। ৮।৪.৫৫

লঙ্কার চতুর্দ্দিকে যে স্বর্ণ প্রাচীর ছিল, সেই স্বর্ণ প্রাচীরও ছিল—

মণি বিদ্রুম বৈদূর্য্য মুক্তা বিরচিতান্তর। ১৪।৬।৩

স্ফটিকের ব্যবহার লঙ্কায় অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। স্ফটিক যে কাঁচ নহে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি। প্রাচীন কালে কৈলাশ পর্ব্বতে, বিন্ধ্য পর্ব্বতে ও লঙ্কাদ্বীপে স্ফটিক উৎপন্ন হইত। কৈলাশ পর্ব্বতে শুভ্রস্ফটিক ছিল, দুই নামে পরিচিত। সূর্য্যকান্ত মণি ও চন্দ্রকান্ত মণি। সূর্য্যকিরণ সম্পাতে যে প্রস্তর-মণি হইতে অগ্নি নির্গত হইত, তাহার নাম ছিল সূর্য্যকান্ত মণি; আর চন্দ্রকিরণ সম্পাতে যাহা হইতে বারি নিসৃত হইত তাহার নাম ছিল—চন্দ্রকান্ত মণি। কৈলাশ পর্ব্বত এইরূপ মূল্যবান স্ফটিকের জন্ম স্থান হেতু এখনও তাহা স্ফটিকাচল বলিয়া পরিচিত।

লঙ্কার প্রাসাদ, চৈত্য, দেবায়তন- সমস্তই ছিল স্ফটিক প্রভাবে প্রভাবিত। লঙ্কার অনেক তৈজস পত্রও স্ফটিক নির্ম্মিত ছিল। মণিময় স্ফটিক পান পাত্রের উল্লেখ লঙ্কার বর্ণনায় আছে। (সু ১০) স্ফটিক খোদিয়াই বোধ হয় এই সকল পাত্র প্রস্তুত করা হইত এবং তাহাতে মণিমুক্তা বসান হইত।

আমরা বর্ত্তমানে যে সকল পাত্রকে স্ফটিক পাত্র বলিয়া অভিহিত করি, তাহা কাঁচ ঢালাই পাত্র। স্ফটিকনিভ স্বচ্ছ ও শুভ্র হেতু স্ফটিক পাত্র বলিয়া পরিচিত। স্ফটিক এখন সাহিত্য ও প্রচলিত প্রবাদের আশ্রয়ে কোন রূপে নিজ নামের অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া আছে মাত্র।

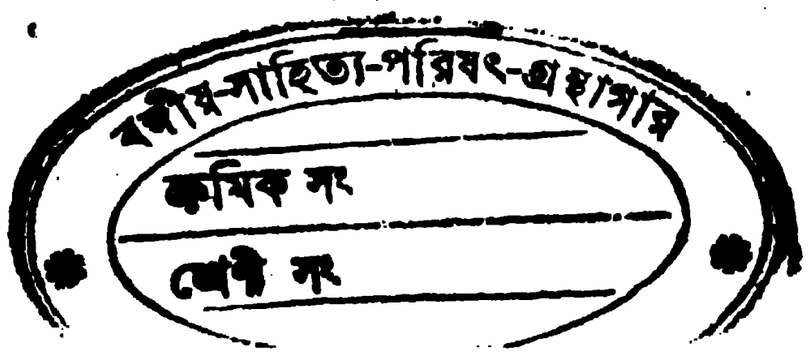
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

রামকৃষ্ণ বলিল—"নিশ্চয়। জীবানন্দাশ্রমে যে ক্ষুদ্র ডিহি কাছারী স্থাপিত হইয়াছে, তাহাই যদি বাবু মহারাজ, প্রভুর নামে দানপত্র করিয়া উৎসর্গ করেন. তবেইতো আমাদের এই আশ্রমটীর কাজ স্থায়ী রকমে চলিতে পারে। সে দান, বাবু মহারাজের লক্ষ টাকার জমিদারীর পক্ষে কিছুই না—হাজার পাঁচেক টাকা আয়ের ক্ষুদ্র ডিহি মাত্র। অথচ কাজ—একটা কাজের মত কাজ—হয়। জীবন অনিত্য, কীর্ত্তি অবিনশ্বরী। আজ চক্ষু বুঁজিলে কে খাইবে বাবু মহারাজের এই বিপুলা জমিদারী? কিন্তু জীবনন্দাশ্রম—বাবু মহারাজ মণিমোহনের নাম যাবচ্চন্দ্র দিবাকর ঘোষিত থাকিবে। কীর্ত্তির্যস্য সঃ জীবতি। আমার মেয়েদায় উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন—কৃতজ্ঞতায় আমার বুক ভরিয়া আছে, ইহারই নাম—পরোপকার; ইহারই নাম—সদাসয়তা..."

স্বামীজী বলিলেন—"মণির ন্যায় সৎকর্ম্মান্বিত যুবক জমিদার বাঙ্গলা দেশে দু'টী নাই না; হইলে, আমার কি আর কার্য্য ছিল না? ধর্ম্ম-কর্ম্ম ফেলিয়া এখন তার ষ্টেট দেখিবার কি আমার সময়? কি করি, এমন একটী সৎকর্ম্মান্বিত সংবুদ্ধি যুবকের অনিষ্ট হয়; এখন আমাকে কিন্তু তোমার ছাড়িতে হইবে বৎস! আর কত? রামকৃষ্ণ যাহা বলিয়াছে. একার্য্য সম্পাদন করা তোমার পক্ষে কিছুই না; তবু আমি বলি, একটু চিন্তা করিয়া সম্মতি দাও! এদিকে যখন তোমার ও ভাবভক্তি প্রচুরই দেখা যায়, হউক, তোমারও অল্পেতেই কীর্ত্তি হউক, আমাদেরও আশ্রয় হউক। রাম একটা মুসাবিদা প্রস্তুত করাইয়া আনুক, তুমিও এই সময় মধ্যে বিষয়টা মনে মনে পর্য্যালোচনা কর। মোট কথা—তোমার গৃহে. তোমার বিষয় আগলাইয়া বসিয়া থাকা আর আমার বিধেয় নহে, অথচ তোমাকে ত্যাগ করিয়া যাওয়াও আমার পক্ষে কর্ত্তব্য নহে।"

কথা শেষ করিয়া স্বামীজী নিকটে উপবিষ্ট মণির মস্তকে মন্ত্র পড়িয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং তাহার মাথা গাল মুখও পিঠে হাত বুলাইয়া দিলেন।"

মণি মন্ত্র মুগ্ধের ন্যায় বলিল—"যে আজ্ঞা।"

সেই দিনই বৃষ্ট বাদলের বিরাম অপেক্ষা না করিয়া কর্ত্তব্য পরায়ণ শিষ্য রামকৃষ্ণ উকীলের ফিস ও ব্যয় বিধান লইয়া মুসাবিদা প্রস্তুত করিবার জন্য জেলায় চলিয়া গেল।

রামকৃষ্ণ জমিদার সরকারের কোন বেতনভোগী উকীলের নিকট না গিয়া নগদ টাকায় সহরের শ্রেষ্ঠ মুসাবিদা কারক উকীল কুঞ্জ ঘোষ দ্বারা মুসাবিদা প্রস্তুত করাইতে গেলেন।

কুঞ্জ বাবু এখন ওকালতি করেন না। মুসাবিদা করিয়া এবং পরামর্শ দিয়াই তাঁহার যথেষ্ট আয়। রামকৃষ্ণ তিন দিন, তিন রাত্রি হাটিয়া ঘোষ মহাশয় দ্বারা অতি সঙ্গোপনে মুসাবিদা প্রস্তুত করাইলেন এবং সেই মুসাবিদা নিজ হস্তে নকল করিয়া, নাম গুলি বাদ দিয়া—যেন কেহ তার ছিদ্রাংশও জানিতে না পারে—এমন করিয়া সহরের সকল শ্রেষ্ঠ উকীলদিগকে দেখাইয়া, পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন ইত্যাদি দ্বারা তাহা যথা সম্ভব নির্দ্দোষ করিয়া লইতে লাগিল।

২০

রামকৃষ্ণ যখন এইরূপে উকীল গৃহে যাতায়াত করিতেছিল, গড়গড়ীর স্বদেশ হিতৈষী জমিদার রাজেন্দ্র বাবু তখন, তাঁহার 'উদ্দেশ্য মহৎ' পত্রিকায় বিভাগীয় কমিসনারের মন্তব্যের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন উপস্থিত করিয়া দেশের দৃষ্টি সেই বিরুদ্ধ মন্তব্যের দিকে আকর্ষণ করিতেছিলেন।

দেশে দুর্ভিক্ষের ঘোর আহাকার উঠিয়াছে; সহৃদয় জেলা মাজিষ্ট্রেট বলিতেছেন—"উপায় নাই, সরকার হইতে লক্ষ লক্ষ টাকা রিলিফ দেওয়া উচিত।" আর কঠোর হৃদয় কমিসনার তাঁহার দ্বিতলোপরি আরাম কক্ষে বসিয়া চসমার সাহায্যে কাগজ পড়িয়া বলিতেছেন—"দেশের পথ-ঘাট এখনও কচু শূন্য হয় নাই, কেমন করিয়া বলিব, দেশে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে?

রাজেন্দ্র বাবু গৃহে গৃহে যাইয়া কমিসনারের মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করিতে সহরবাসীদিগকে উদ্বোধিত করিতেছিলেন।

রাজেন্দ্র বাবুকে আগত দেখিয়া কুঞ্জ বাবু বলিলেন—"আসুন, রাজেন্দ্র বাবু, আসুন! আপনার "উদ্দেশ্য মহৎ" কিন্তু বেশ সুখ-পাঠ্য হইতেছে .."

"দেখুন দেখি, মহাশয়—দেশ কচু শূন্য হইল না—ইহাই হইল কি না দুর্ভিক্ষ হয় নাই বলিবার অজুহাত! আজ কিন্তু সভাতে নিশ্চয় যাইতে হইবে। আর এক দিন আপনার নিকট আসিয়াছিলাম—ভিতরে ছিলেন। আপনারা এরূপ ভিতরে থাকিলে কি চলে? একটু বাহিরে থাকিতে হয়।"

মৈনপুরের যে মোকদ্দমায় নিম্ন আদালতে জমিদার পক্ষে স্থানীয় কোন উকীল পাওয়া যায় নাই, যাহার জন্য আমাকে ফয়জাবাদ হইতে নেওয়া হইয়াছিল, সে মোকদ্দমা গবর্ণমেণ্ট পক্ষে নিম্ন আদালতে জয় হইয়াছিল। সুতরাং তাহা এখন হাইকোর্টে আছে।

আমাকে তদ্বিরের জন্য হাইকোর্টেও যাইতে হইবে কি না, তাহা জানিতে পারি নাই। সেই একমাত্র মোকদ্দমা ব্যতীত ফৈজাবাদ কোর্টে এ পর্য্যন্ত কোন মোকদ্দমা পাই নাই। মাঝে মাঝে কমিশন পাইতেছি মাত্র।

বার লাইব্রেরীর একটা গোপন কক্ষে বসিয়া কমিশনের কাজই করিতেছিলাম, এমন সময় উকীল রঘুবীর বাবু একটী মাড়োয়ারী ভদ্রলোককে আনিয়া আমার সহিত পরিচয় করিয়া দিলেন—"ইনিই বাবু সুশীলকুমার বানার্জ্জি এম, এ বি, এল—গৌণী ষ্টেটের উকীল।"

গৌণী ষ্টেটের উকীল বলিতেই আমি বুঝিলাম, ইনি গৌণী ষ্টেটের কোন কর্ম্মচারী, সেই মোকদ্দমা সম্বন্ধেই পুনরায় যাইবার জন্য বন্দোবস্ত করিতে আসিয়াছেন। আমি তাঁহাকে অত্যধিক আদর অভ্যর্থনা করিয়া লইলাম। তারপর পূর্ব্ব পরিচিতের ন্যায় হিন্দিতে জিজ্ঞাসা করিলাম—"তারপর কি মনে করিয়া, আপনাদের মামলা কত দূর?"...

মাড়োয়ারী ভদ্রলোকটী—"বলিলেন আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতেই আসিয়াছি, আপনি আমাকে চিনিতে পারেন নাই, কেননা আমি আর কখন এই ফৈজাবাদে আসি নাই—"

আমি লজ্জিত হইয়া বলিলাম—'আপনি গৌণী ষ্টেটের কেহ নহেন?'

"আজ্ঞে না।"

"ও, আমি তই মনে করিয়াছিলাম .. ..

আমি লজ্জিত হইয়াছি বুঝিয়া ভদ্রলোকটী আমাকে বলিলেন "আমি কেবল আপনার নিকট আসিয়াছি আমার প্রয়োজনও গুরুতর।"

প্রয়োজনের কথা শুনিয়া লজ্জার ভিতরও আমি যেন মহা আনন্দ লাভ করিলাম। আমি ভাব পরিবর্ত্তন করিয়া বলিলাম—"আপনি কোথা হইতে আসিয়াছেন?"

"কানপুর হইতে।"

অতঃপর আমি কি প্রশ্ন করিব, একটু চিন্তা করিয়া লইবার জন্য ছকু লালের মোকদ্দমার কথাই জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলাম "ছকু লালকে তো হাইকোর্ট ও জামিন দিলে না।"

তিনি অন্য মনস্কভাবে যেন, বলিলেন - 'না' ?

তিনি উকীল রঘু বাবুর দিকে চাহিয়া সঙ্কোচভাবে ইতঃস্তত করিতেছিলেন বুঝিয় রঘু বাবু চলিয়া গেলেন। গৃহ নীরব হইলে ভদ্রলোকটী আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"আপনি গত ভাদ্রে মৈনপুরে যাওয়া আসা করিতেন?"

"হাঁ; গৌণী ষ্টেটের দিয়াড়া মোকদ্দমায় আমি গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে, জমিদারের পক্ষে উকীল ছিলাম; সুতরাং কেবল ভাদ্র মাসে নয়—বৎসরের প্রায় অধিকাংশ কালই মৈনপুরে ও ফয়জাবাদে যাতায়াত করিয়াছি—"

"রেলে গত ভাদ্র মাসের কোন বিশেষ ঘটনা আপনার মনে পড়ে কি?"

"কি ঘটনা? আমি আপনার কথা বুঝিতে পারিতেছি না। আপনি আমার নিকট কি জন্য আসিয়াছেন, শুনিতে পারি কি?"

ভদ্রলোকটী আমার মনের অবস্থা বুঝিয়া বলিলেন—"আপনার সময় নষ্ট করিতেছি, সেজন্য কোন চিন্তা নাই। আমি তাহার ক্ষতি পূরণ করিতেছি।"

এই বলিয়া ভদ্রলোকটী তাহার ক্ষুদ্র হাত ব্যাগটী হইতে খুলিয়া একশত টাকার একখানা নোট আমার হাতে গুজিয়া দিয়া বলিলেন "অনুগ্রহ করিয়া আমার প্রশ্নের উত্তর দিন। মিস এমিলি নামে কোন বিবির সহিত আপনি মৈনপুরী হইতে আসিতে রেলে সাক্ষাৎ হইয়াছিল কি?"

আমি পূর্ব্ব ঘটনা স্মরণ করিয়া বলিলাম—"একটা যুবতী মেমের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল—তার নাম এমিলি কি না এবং সে কুমারী কিনা, তাহা আমি জানি না।"

"আপনি তাহাকে দেখিলে চিনিতে পারেন কি?"

"নিশ্চয় পারি। সেটা একটা মেয়ে বোম্বেটে......

আমাকে কথা বলিতে না দিয়া ভদ্রলোকটী প্রশ্ন করিলেন—"আপনার সহিত তাহার কিরূপ ব্যবহার চলিয়াছিল?"

আমি সংক্ষেপে আমার বিপদের কথা খুলিয়া বলিলাম—"আমি আমার মক্কেলি পাওনা ৭৫০৲ টাকা লইয়া আসিতে

"সাহেবকে সেলাম জানাইও; আমার একটা আপিল আছে, ডিষ্ট্রিক্ট জজের এজলাসে—যাক্, সেটা কোনরূপে করিয়া অথবা সময় লইয়া আমি তোমাদের সাহেবের অনুরোধ রক্ষা করিব।"

আরদালী সেলামের উপর সেলাম দিয়া বিদায় হইল। আমি মাজিষ্ট্রেটের চিঠির উদ্দেশ্য চিন্তা করিতে লাগিলাম। আমার কোন মোকদ্দমাই জজের এজলাসে ছিলনা, তথাপি মিথ্যা কথা বলিলাম। কেন বলিলাম, তাহা দ্বারা আমার কি উপকার হইবে? সে সম্বন্ধে একটুও চিন্তা করিলাম না। এই আরদালীর নিকট একটা মোকদ্দমা আছে, বলিলে এমন যে কি সম্মান বৃদ্ধি হইবে, মোটেই সে দিকে লক্ষ্য করিলাম না। শিক্ষার শেষ কি শোচনীয় পরিণাম!

ম্যাজিষ্ট্রেট কেন সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন, কিছু বুঝিতে পারিলাম না। তবে কি দেড় বৎসর পরে আমার একাজকিউটিব সার্ভিস গ্রহণের এপ্লিকেসন কনসিডার্ড হইল? না দিয়ারী মোকদ্দমায় গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যাওয়ায়...কোন অনুমানই মনে সান্ত্বনা দান করিতে পারিল না। দুই একজন বন্ধুকে ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুরোধ চিঠি দেখাইবার লোভও সম্বরণ করিতে পারিলাম না। তাহাদিগের নিকট বিষয়টীকে একটী "কনফিডেনসিয়াল মেটার" বলিয়াই উল্লেখ করিলাম জানিনা একথা বলিতে ইচ্ছা হইল না।

(৪)

মাজিষ্ট্রেটের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। মাজিষ্ট্রেট উঠিয়া জোড়ে কর মর্দ্দন করিয়া আসন দিলেন।

আমি বসিলে তিনি বসিলেন। সম্মানের বহর দেখিয়া আমি একে বারে আত্মহারা হইলাম।

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন "আপনি সার্ব্বিসে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক।"

আমি বলিলাম "হাঁ মহাশয়, ইচ্ছুক ছিলাম "বৈ কি?"

"এখনও ইচ্ছুক আছেন কি?"

"পাইলে আপত্তি নাই, আমার বয়স এখনও আছে।"

"আপনি প্রস্তুত থাকিলে, আমি রিকমেণ্ড করিতে পারি।"

"আপনাকে ধন্যবাদ"।

ইহার পর ম্যাজিষ্ট্রেট এমন একটী কথা বলিলেন, যাহা শুনিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়া রহিলাম। আমার মুখ হইতে কোন উত্তর বাহির হইল না। মাজিষ্ট্রেট সে সম্বন্ধে আরো অনেক কথা বলিলেন। আমিও বাধ্য হইয়া তাঁহার উত্তর দিলাম। কিন্তু আমার মুখ হইতে তাঁহার অনুরোধ উপেক্ষা করিবার মত কোন ইঙ্গিত বাহির হইল না।

মাজিষ্ট্রেট আমাকে মনে মনে বিবেচনা করিতে বলিয়া দশ মিনিট সময় দিলেন। তিনি উঠিয়া ভিতরে গেলেন। তারপর আসিয়া অন্য কথা ধরিলেন।

প্রায় এক ঘণ্টা ম্যাজিষ্ট্রেটের কুঠিতে কাটাইয়া বাসায় আসিয়া যে দৃশ্য দেখিলাম, তাহাতে আমার বুদ্ধি লোপ পাইল।

আসিয়া দেখি আমার বৈঠকখানার এক খানা চেয়ারে বসিয়া আছেন—সেই বোম্বেটে মেয়ে যে দেড়বৎসর পূর্ব্বে চলন্ত গাড়ীতে আমার টাকার তোড়াটী লইবার জন্য মিথ্যা ভান করিয়া আমাকে বিপন্ন করিতে চাহিয়াছিল। আর তার কাছে দাঁড়াইয়া আছেন—আমার কিশোরী পত্নী 'সুধা"।

আমি সুধাকে চক্ষে ইঙ্গিত করিলে সে চলিয়া গেল। সুধাকে চলিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিবার কারণ, এ মেয়ে না করিতে পারে, এমন কাজ নাই; কি জানি পুনরায় কোন ফেসাদে ফেলিয়া গৃহস্থ হিন্দু ঘরের কুল বধুকে পর্য্যন্ত নিয়া প্রকাশ্য আদালতে সাক্ষীর বাক্সে না দাঁড়া করে।

আমি গৃহে আসিতেই মেয়েটা (মিস এমিলি) আমার হাত ধরিয়া ফেলিল। আমি হাত টানিয়া লইয়া ঘৃণার সহত বলিলাম—"তুমি এখানে কেন? এখনও তোমার শিক্ষা হয় নাই, এবার যথেষ্ট শিক্ষা পাইবে। মেয়েটা কোমল হাসি হাসিয়া বলিল—"তুমি শিক্ষা দিবে নাকি? বল ভাই, বল।"

তাহার কথার মাধুর্য্যে ও হাসির সৌন্দর্য্যে আমি একটু নরম হইয়া পড়িলাম। আমি বলিলাম—"দেখ, আমি তোমাকে পরিস্কার বলিতেছি, আমি যাহা জানি, তাহা না বলিয়া আমার উপায় নাই। আমি শত শত লোকের নিকট একথা গল্প করিয়াছি। শত শত লোক তোমার নাম না জানিলেও আমার এই "এক দিনের কথা" জানে। আমি মাসিক পত্রে গল্প লিখিয়া পর্য্যন্ত তাহা প্রকাশ করিয়াছি। এখন কেমন করিয়া বলিব

ন্যাংটা গারো ছেলে মেয়ে তাকায় কুতুহলে !
বাপ মা তাদের মুখোমুখি গল্প গুজব করে ;
বল্‌ছে ধীরে খুব স্বাভাবিক প্রাণের পুলক ভরে !
কোথাও আবার উপত্যকায় টংয়ের ঘরের মাঝে,
জে য়ান গারো পুরুষ নারী ব্যস্ত কি সব কাজে ;
কত কি সব দেখে' এলাম চোঁকি কপালে তুলে' !
পারবো নারে পঞ্চ মুখে বল্‌তে সে সব খুলে' ! ১৫০
রূপ-কানা সব দেখে আসুক্ এমন শোভা রাশি !
সুসং পাহাড় ! আমি তোমায় বড্ড ভালবাসি ! ১৫২

শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

সাহিত্য সংবাদ।

সৌরভ সাহিত্য সঙ্ঘ।

গত ৩০ শে অগ্রহায়ণ রবিবার স্থানীয় দুর্গা বাড়ীতে উক্ত সাহিত্য সভার এক বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। সভায় এই নগরের বহু সাহিত্যসেবী ও শিক্ষিত ভদ্রলোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। সরকারী উকিল রায় শ্রীযুক্ত সারদা চরণ ঘোষ এম, এ, বি, এল, বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে সৌরভ সম্পাদক শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার জগতের প্রাচীনতম সভ্য সমাজ ও রামায়ণের সমাজ" সম্বন্ধে একটী তুলনা মূলক প্রবন্ধ পাঠ করেন। লেখক এই প্রবন্ধে রামায়ণের যুগ বা রামায়ণ রচনার কাল নির্দ্ধারিত করিতে যাইয়া মিসরীয় এসিরীয়, বাবিলনীয় ইব্রীয়, ও গ্রীক সমাজের প্রাচীন অবস্থা, সভ্যতার প্রকৃতি, আদান প্রদানের ধারা ইত্যাদি আলোচনা করিয়া কোন সমাজ কত প্রাচীন ও সেই প্রাচীনতা নির্ণয়ের কতগুলি উপায় আলোচনা করেন। অতপর বেদ, ব্রাহ্মণ, রামায়ণ, উপনিষদ, মহাভারত প্রভৃতির রচনা কাল নির্দ্দেশ করেন।

চারুমিহির সম্পাদক শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস রায় বি, এল, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী-বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন কাব্য ব্যাকরণ-সাংখ্য-পুরাণতীর্থ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বিএ. বি টি ও সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধের বিভিন্ন অংশের আলোচনা করেন। রাত্রি ৮½টায় সভা ভঙ্গ হয়।

এবার প্রয়াগধামে ১০ ই ও ১১ ই পৌষ উত্তর ভারতীয় বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশন হইবে। প্রবাসী সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণকে চাঁদা দিতে হইবে নূনপক্ষে পাঁচ টাকা।

এবার ভারতের জাতীয় মহা সমিতির অধিবেশন মাদ্রাজের অন্তর্গত কোকনদে হইবে। ঐ সময় ২৩ শে, ২৪ শে, ও ২৫ শে ডিসেম্বর কোকনদে নিখিল ভারতীয় সাধারণ লাইব্রেরী সম্মিলন ও সাময়িক পত্র প্রদর্শনী হইবে ২৩ শে ডিসেম্বর সাময়িক পত্রাদির প্রদর্শনী দ্বারা উদ্‌ঘাটিত হইবে। বোম্বাইর ব্যারিষ্টার মি এম, আর, জয়াকর সম্মিলনের ও প্রদর্শনীর সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়াছেন।

সুকবি যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ব্যঙ্গ কবিতাগুলি "হাসি ও হল্লা" নামে পুস্তকাকারে বাহির হইয়াছে। মূল্য বার আনা।

শোক সংবাদ।

বঙ্গসাহিত্যের শক্তিশালী লেখক স্বর্গীয় পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ও বরিশালের জন নেতা স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার দত্তের মৃত্যু বাঙ্গালা দেশে ইন্দ্র-চন্দ্র পাত ঘটাইয়াছে। ইঁহাদের অভাব শীঘ্র পুরণ হইবার নহে।

আগামী সংখ্যায় "সৌরভ" দ্বাদশবর্ষে পদার্পণ করিবে। এই এগার বৎসর আমরা সৌরভ নিয়মিত রূপে চালাইয়াছি। মফস্বল হইতে যেরূপ ভাবে ছবি চিত্র দিয়া বাহির করা সম্ভব, তাহা করিতে ত্রুটী করি নাই। দ্বাদশ বর্ষে যাহাতে সৌরভ আরও উৎকৃষ্ট হয়, তাহার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

ঢাকা, ৭৫নং পাটুয়াটুলী, বীণা প্রেসে—শ্রীফণীভূষণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।